হে মহাজীবন

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
২৩ জানুআরি ১৯৬২

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা — ৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিণ্টার্স
১৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা — ৪

প্রচ্ছদ
দেবাশীষ রায়

এক শীতের সন্ধ্যায় হেমকান্তি বাড়ি ফিরলেন। মাত্র সাত দিন, তবু যেন অনেক দিন পর। সামান্য দূরত্ব, তবু যেন বহু দূর থেকে। প্রায় মাধ্যাকর্ষণের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে আবার ফিরে আসা।

অ্যাম্বুলেন্সটা থামার পরই হেমকান্তির তন্দ্রা কেটে গেল। এখনও তিনি বেশিক্ষণ পুরোপুরি জেগে থাকতে পারেন না। দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখেন, অনেকটা নেশার মতন, ইচ্ছেই করে না চোখ খুলতে। ঘোর কাটলেই মনে হয়, এখন সকাল না বিকেল, দিন না রাত্রি? অ্যাম্বুলেন্সটার ভেতরে আবছা অন্ধকার।

একজন কেউ পেছনের দরজাটা খুলে দিল। হেমকান্তি নামবার চেষ্টা করতেই সেই ব্যক্তিটি হাত তুলে কী যেন বলল। কথাটা ঠিক শুনতে পেলেন না তিনি, কিন্তু লোকটির হাতের ভঙ্গি দেখে বুঝলেন, তাঁকে নিষেধ করা হচ্ছে।

ড্রাইভারের পাশ থেকে তাড়াতাড়ি নেমে এল রত্নেশ। অন্য লোকটিকে বলল, স্ট্রেচার সুদ্ধু নিয়ে যাবার দরকার নেই। আমি একটা চেয়ার আনতে বলছি।

তারপর সে হেমকান্তিকে বলল, ফুলদা, তুমি আর একটু শুয়ে থাকো।

হেমকান্তি বললেন, আমি...

তারপরই থেমে গেলেন। রত্নেশকে তিনি যা বলতে চান, তার বাকি কথাটা মনে এল না।

কেন মনে আসছে না! হেমকান্তি ভাবলেন, তিনি কি বাংলা ভাষা এর মধ্যে ভুলে গেছেন? আর বাংলা বলতে পারবেন না?

কিন্তু এই কথাটা যে ভাবলেন, তা তো বাংলাতেই। সব চিন্তারই একটা ভাষা থাকে। বোবা-কালারা তা হলে কীভাবে চিন্তা করে? তিনি রত্নেশের কথাও বুঝতে পেরেছেন। তা হলে তাঁর জিভ কি আড়ষ্ট হয়ে গেছে?

বিদেশিরা নতুন বাংলা শেখার পর যেভাবে উচ্চারণ করে, হেমকান্তি

সেইভাবে থেমে থেমে, জোর দিয়ে বললেন, আমি-নিজে-নিজে-যেতে পারব।

সঠিক বলতে পেরেছেন বলে তিনি প্রীত হলেন।

রত্নেশ বলল, না, না, ডাক্তার তোমাকে সিঁড়ি ভাঙার পারমিশন দেননি। অ্যাট লিস্ট ফিফটিন ডেজ...একটা চেয়ারে বসিয়ে তুলে দিচ্ছি, কোনও অসুবিধে হবে না।

কারও সাহায্য ছাড়াই হেমকান্তি নেমে দাঁড়ালেন রাস্তায়।

মাথার মধ্য থেকে একটু একটু কুয়াশা সরে যাচ্ছে, রোদ উঠছে। প্রথমে তাঁর মনে হল, ধুধু করা মাঠের মধ্যে একটি মাত্র তিনতলা হলুদ রঙের বাড়ি। সে মাঠে গাছপালাও কিছু নেই, একেবারে দিগন্ত পর্যন্ত ফাঁকা। বাড়িটিকে যেন কেউ আলগা করে সেখানে বসিয়ে দিয়েছে।

হেমকান্তি এদিক ওদিক মুখ ফেরাতেই কম্পিউটারের ছবির মতন পটপট করে গজিয়ে উঠতে লাগল অন্য বাড়ি। এটা ভবানীপুর অঞ্চলের বেশ পুরনো পাড়া। শুধু নম্বর দিয়েই বাড়িগুলির পরিচয় নয়, এখনও অনেকে বলে, মিত্রবাড়ি, ভটচার্যিবাড়ি, উকিলবাড়ি, নাম-করলে-হাঁড়ি-ফাটে বাড়ি ইত্যাদি।

হেমকান্তি আপন মনে বললেন, কুল-দ্য-সাক!

এই তো মনে পড়ে যাচ্ছে। রাস্তাটা খুব সরু নয়, পাশাপাশি দুটো গাড়ি যেতে পারে, কিন্তু হঠাৎ এক জায়গায় শেষ হয়ে গেছে। শেষ বাড়িটিই হেমকান্তিদের। সবাই রাস্তাটাকে বলত ব্লাইন্ড লেন। হেমকান্তির বাবা-কাকারা অন্যদের এ-বাড়ির অবস্থান বোঝাবার জন্য বলতেন, ওল্ড ট্যাঙ্ক রোডে ঢুকে চোখ বুজে সোজা চলে আসবে, ব্লাইন্ড লেন তো, একেবারে হিট করবে এসে আমাদের বাড়িতে, মিস করার কোনও উপায় নেই।

এই ব্লাইন্ড লেন পরিচিতিটা হেমকান্তির পছন্দ ছিল না। এটা রোড, লেন তো নয়। তাছাড়া অন্ধ গলি, কানা গলি, ব্লাইন্ড লেন এসবের মধ্যে কেমন যেন রূপকের গন্ধ আছে। তাও বহু ব্যবহারে আঁশটে গন্ধ। তিনি বাবাকে কিছু বলার সাহস না পেলেও ছোট কাকাকে বলতেন, ব্লাইন্ড লেন বলব কেন, বলব কুল-দ্য-সাক।

ছোটকাকা ফরাসিদের মতন কাঁধ শ্রাগ করে বলতেন, হুঃ!

কিন্তু এসব তো কলেজ জীবনের কথা, হঠাৎ এখন মনে পড়ল কেন। অনেকেই বোঝে না বলে হেমকান্তি এখন নিজেও বলেন, ব্লাইন্ড লেন। অল্প

বয়সে নিজের মতামত অন্যদের ওপর জোর করে চাপাবার চেষ্টা থাকে। একটা বয়েসের পর অন্যদের মতামতের কাছেই নত হতে হয়।

হেমকান্তি ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তিনতলার ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক বৃদ্ধ আর এক কিশোরী। আবার মাথার মধ্যে কুয়াশা ফিরে এসেছে। হেমকান্তি ওদের চিনতে পারলেন না।

অ্যাম্বুলেন্স দেখলে এমনিতেই দু'-চারজন কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে। উকিলবাড়ির দোতলার সব কটি জানলায় পরদা, শুধু একটা পরদা সরে গেছে। খুব কাছেই একটি যুবা সাইকেল থেকে এক পা মাটিতে ছুঁইয়ে তাকিয়ে আছে হাসিমুখে। যথারীতি একটা পথ-কুকুরও ল্যাজ নাড়ছে কাছে এসে।

হাতলওয়ালা একটি বড় চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হল হেমকান্তিকে, রত্নেশ সমেত তিনজন সেটাকে উঁচু করে তুলল। হেমকান্তি যেন এক রাজা। তাঁকে দেখে অশক্ত বা অসুস্থ বলে বোঝবার কোনও উপায় নেই। এই মধ্যবয়সেও হেমকান্তি বেশ সুপুরুষ, প্রায় ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা ও গৌরবর্ণ শরীর, পেটে অতিরিক্ত মেদ জমেনি, এককালের অভিনেতা বসন্ত চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর অনেকটা মিল আছে। ইস্ত্রি করা ধপধপে সাদা পাঞ্জাবি ও ধুতি পরা, পায়ে ক্রিম রঙের চটি। ধুতি তিনি নিজে পরেছেন, না কেউ পরিয়ে দিয়েছে? হেমকান্তি মনে করতে পারলেন না।

রত্নেশ ছাড়া যে আর দু'জন তাঁকে বহন করছে, তাদেরও চিনতে পারলেন না তিনি। নিজের বাড়ির লোকই তো হবে। মাথার মধ্যে স্মৃতি-বিস্মৃতি প্রবাহিত হচ্ছে এলোমেলোভাবে। চেয়ারটা একটু টলমল করছে, পড়ে যাবার আশঙ্কায় তিনি হাতল চেপে ধরলেন। এভাবে তিনি মানুষের দ্বারা কখনও বাহিত হননি, কলকাতা শহরে কখনও রিকশাতেও চাপেননি। তিনি রত্নেশকে কিছু বলতে গেলেন, কিন্তু আবার তাঁর জিভ আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

উকিলবাড়ির পরদা-সরানো জানলায় দেখা গেল একটি রমণীর মুখ। পাশের বাড়িটার ছাদেও যে দাঁড়িয়ে আছে এক জোড়া নারী-পুরুষ, তা হেমকান্তি আগে লক্ষ করেননি। এরা সবাই যেন তাঁর কাছে নতুন মানুষ। সিঁড়ির কয়েক ধাপে, দোতলার কাছে হেমকান্তি একটা কিছু বাজনা শুনতে পেলেন, দেখতে পেলেন কয়েকটি মুখ।

তিনতলার ভেতর ধাপের বারান্দায় উঠে নামিয়ে দেওয়া হল চেয়ার। রত্নেশ বেশ হাঁপিয়ে গেছে, তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সে প্যান্টের পকেট

থেকে রুমাল বার করল। অন্য একজন, পাজামা ও মেরুন রঙের পাঞ্জাবি পরা, সে ঘর্মাক্ত হয়নি। সামনাসামনি এসে প্রশ্ন করল, ছোটমামা এখন ভাল আছ?

হেমকান্তি তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, ঠোঁটে পাতলা হাসি। কেউ প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে হয়। তিনি মনে মনে বাক্যটা আগে সাজিয়ে নিলেন। হ্যাঁ, এখন আমি বেশ ভাল আছি। মুখের মধ্যে জিভটা নাড়লেন কয়েকবার। ঠিক করে বলতে হবে। এ ছেলেটি কে? ছোটমামা...তিনি যদি কারও মামা হন, মামা কাকে বলে? তাঁর জানা উচিত। আমারও এক মামা ছিল। রাঙা মামা। মায়ের ভাই। তা হলে তাঁর নিশ্চয়ই কোনও বোন বা দিদি থাকবে। মনে পড়ছে না।

ঝুলবারান্দায় দাঁড়ানো বৃদ্ধ ও কিশোরীটি এখানে চলে এসেছে, আরও কয়েকজন, হেমকান্তি এক ঝলক সবাইকে দেখে নিলেন। এদের মধ্যে কেউ কি তাঁর বোন কিংবা দিদি? মনে না পড়লেও ভয়ের কিছু নেই, বারবার মনে মনে বলতে হয়, রি-কল, রি-কল, ফিরে এসো, স্মৃতি, ফিরে এসো। গত কয়েকদিনে তিনি এরকম কিছু কিছু ভুলে যাওয়া জিনিস ফেরত পেয়েছেন।

তিনি বেশ অনায়াসেই বলতে পারলেন, হ্যাঁ, আমি এখন বেশ ভাল আছি। তুমি কেমন আছ? তুমি কে? টু টেল ইউ দা ট্রুথ, আমি তোমাকে চিনতে পারছি না।

যুবকটি বলল, আমি টিটো।

এবার হেমকান্তি বিব্রত বোধ করলেন। শুধু নাম বললেই চেনার মতন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, অথচ এই নামটিতে তাঁর চোখের সামনে কোনও ছবি ফুটল না।

টিটো? এককালে যুগোশ্লাভিয়া নামে একটি দেশ ছিল, তার রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন মার্শাল টিটো, তা মনে আছে, কিন্তু এ-বাড়িতে ওই নামে কেউ...

হেমকান্তি বললেন, একটা সিগারেট, তুমি আমাকে একটা সিগারেট দিতে পারো?

টিটো নামের যুবকটি একটু অবাক হয়ে বলল, আমি তো সিগারেট খাই না!

হেমকান্তি অন্যদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, কারও কাছে সিগারেট আছে? আমি একটা সিগারেট খাব।

তিনি রত্নেশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। রত্নেশও বলল, আমি তো কখনও সিগারেট খাইনি।

বৃদ্ধটি এগিয়ে এলেন সামনে। ইনিও প্রায় হেমকান্তিরই মতন লম্বা, মাথার

সব চুল সাদা, চোখে পুরু লেন্সের চশমা, গেঞ্জি ও পাজামা পরা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। ওই মালাটির জন্য তাঁর চেহারা খানিকটা অবাস্তব মনে হয়।

তিনি কিছু বলার আগেই হেমকান্তি বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠলেন, আমাকে কেউ একটা সিগারেট দিতে পারছে না?

বৃদ্ধটি ধমক দিয়ে বললেন, হেম! তুই কী বলছিস? তুই তো ছ'বছর আগে সিগারেট ছেড়ে দিয়েছিলি, এর মধ্যে আর এক দিনও তোকে খেতে দেখিনি। এ-বাড়িতে কেউ সিগারেট খায় না।

ধমকটা অগ্রাহ্য করলেন হেমকান্তি। শুধু 'এ-বাড়িতে' তাঁর কানে খট করে লাগল। এ-বাড়ি বলতে ঠিক কী বোঝায়? কারা থাকে এখানে? একতলা থেকে তিনতলার সিঁড়ি তাঁর চেনা লাগেনি। যদিও বারান্দা থেকে যে-আকাশ দেখা যাচ্ছে, তা অচেনা নয়। বারান্দা থেকে চৌকো আকাশ।

বৃদ্ধটি বললেন, তুই টিটোকে চিনতে পারলি না, আমাকে চিনতে পেরেছিস তো?

সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা ম্যাজিকের মতন ব্যাপার ঘটল। যেন ফট করে খুলে গেল একটা দরজা, সব দিক আলোয় আলোকময় হয়ে গেল। এ বৃদ্ধকে সত্যি চিনতে পারছিলেন না হেমকান্তি, যেন কখনও জীবনে দেখেননি, কিন্তু তাঁর মুখে এই প্রশ্নটা শুনেই স্মৃতি ফিরে এল, তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারলেন। তুমি কী যে বলো, মেজদা, তোমায় চিনব না কেন, আমি কি পাগল-টাগল হয়ে গেছি নাকি।

এ উত্তর শুনেও বৃদ্ধ খুব প্রসন্ন হলেন না। নীরস গলায় বললেন, না, তুই পাগল হবি কেন? তুই বরাবরই আধ-পাগল। আধ-পাগলরা কখনও পুরোপুরি পাগল হয় না। পুরো পাগল হলে তো চুকেই গেল। তা কেমন আছিস এখন?

হেমকান্তি বললেন, বেশ ভালোই আছি। মানে...

তিনি থেমে গেলেন। বেশ ভালোই আছির পর আর কিছু যোগ করার নেই। মানে বলাটা ভুল হয়েছে।

তুই এখন চা খাবি?

সেই যে সাহেবদের কাছ থেকে শেখা হয়েছে, বিকেলবেলা একবার চা না খেলে বাঙালিদের চলে না। গলার কাছে চা-তৃষ্ণা জমে। হেমকান্তি সেই তৃষ্ণাটা অনুভব করতে পারলেন না।

তিনি রত্নেশের দিকে তাকালেন।

রত্নেশ বলল, নার্সিংহোম থেকে বেরুবার আগেই দু'কাপ চা খেয়েছেন।

মেজদা বললেন, তা হলে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দে। একটু বিশ্রাম করুক।

হেমকান্তি নিজেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

সঙ্গে সঙ্গে রত্নেশ আর কিশোরী মেয়েটি দু'দিক থেকে তাঁর দু'বাহু ধরল। তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, ধরতে হবে না, আমি নিজেই যেতে পারব। কিন্তু কোন দিকে যাবেন, কোন ঘর?

হাঁটতে গিয়ে টের পেলেন, তাঁর মাথা সামান্য টলমল করছে। সেটা বেশ আরামেরই। এই কিশোরী মেয়েটি কে? অবশ্য প্রথমে যত ছোট মনে হয়েছিল, ততটা ছোট নয়, একুশ-বাইশ হবে। শ্যামলা রং, মুখখানি চোখসর্বস্ব, একটা হলুদ-সবুজ ডোরাকাটা ম্যাক্সি পরা, এর সর্বাঙ্গ থেকে একটা মৃদু ফুলের গন্ধ আসছে। হেমকান্তি মনে মনে তীব্রভাবে বলতে লাগলেন, রি-কল! রি-কল! হে স্মৃতি, এই মেয়েটির মুখের সঙ্গে একটা নাম আর পরিচয় জড়িয়ে আছে, ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও।

কিছুই ফিরে এল না।

যদি রক্তের সম্পর্ক থাকে, যদি খুবই নিকট আত্মীয় হয়, তা হলে এ বয়েসি একটি মেয়ের স্পর্শ একরকম, আর অনাত্মীয়, অনূঢ়া কিশোরীর স্পর্শ অন্য রকম হতে বাধ্য, সেটাই প্রকৃতির নিয়ম। হেমকান্তি মেয়েটিকে চিনতে পারলেন না, তাই ওর স্পর্শে একটু একটু উত্তাপ বোধ করছেন, যদি এই মুহূর্তে কেউ বলে যে ও দাদার মেয়ে কিংবা খুড়তুতো বোন, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে ওই উত্তাপ অন্তর্হিত হয়ে যাবে। সেটা প্রকৃতির নিয়ম না হলেও সভ্যতার অভ্যেস।

মাত্র দশ-বারো পা হেঁটে ওরা একটা দরজার সামনে দাঁড় করাল হেমকান্তিকে। সে দরজার বাইরে থেকে তালা বন্ধ। একজন কেউ নিয়ে এল চাবি, ভেতরে এসে রত্নেশ জ্বেলে দিল আলো, দ্রুত হাতে খুলে দিল তিনটি জানলা।

ঘরখানি লম্বাটে ধরনের। এক পাশে একটি পুরনো আমলের বড় পালঙ্ক। অন্য পাশে বেতের সোফাসেট ও নিচু টেবিল। মাঝখানে একটা লেখার টেবিল, তার ওপরে একটা টাইপ রাইটার, রিভলভিং চেয়ার। পাশে একটি বইয়ের আলমারি। দেওয়ালের গায়ে আর একটা আলমারিতে টুকিটাকি

জিনিসপত্র, পালঙ্কের পায়ের দিকে বাথরুমের দরজা। দেওয়ালে একটিই বাঁধানো ছবি, কোনও বিদেশি চিত্রকরের অ্যাবস্ট্রাক্ট পেন্টিংয়ের প্রিন্ট।

রত্নেশ কিশোরীটিকে জিজ্ঞেস করল, ঘরটা পরিষ্কার করা হয়েছে তো?

এতক্ষণ বাদে মেয়েটির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, হ্যাঁ, আজ দুপুরেই ধুয়ে-মুছে রাখা হয়েছে।

হেমকান্তি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন, তোমার নাম কী? শেষ মুহূর্তে সামলে নিলেন। কিশোরীটি যদি তাঁর ভাইঝি হয়, তা হলে তার নাম-না-জানা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এটা তিনি ঠিকই বুঝলেন।

রত্নেশ বলল, ফুলদা, তা হলে তুমি বিশ্রাম নাও। কিছু লাগলে বোলো, আমি পাশের ঘরেই আছি।

ওরা দু'জনে বেরিয়ে যাবার কয়েক মুহূর্ত পরেই রত্নেশ আবার ফিরে এল বৃদ্ধ মেজদাকে সঙ্গে নিয়ে। মেজদার মুখে এখনও রাগ রাগ ভাব।

তিনি হেমকান্তিকে অগ্রাহ্য করে রত্নেশকে বললেন, যা আলমারিটা খুলে দেখ তো ওর মধ্যে কী আছে।

নানারকম পুতুল, ছবি, বিভিন্ন আকারের টেবিলঘড়ি, কয়েকটা ট্রফি, মেডেল, হরেক রকমের কলম। একটা চৌকো টিনের বিস্কুটের বাক্স, তার মধ্যে প্রচুর ওষুধ।

মেজদা বললেন, ও বাক্সটা নিয়ে নে। এখন তো ও অন্য ওষুধ খাবে, সেগুলো আনিয়ে দিস।

নিজেই ড্রয়ার টেনে টেনে খুলে তুলে নিলেন দু'-একটা জিনিস। দরজা খুলে দেখে এলেন বাথরুম।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন, হেম, রাত্তিরে কী খাবি?

হেমকান্তির বলার ইচ্ছে হল, আমার এক্ষুনি একটা সিগারেট খেতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে!

বকুনির ভয়ে সে কথা বললেন না।

রত্নেশ বলল, বেশ পাতলা করে মাছের ঝোল আর ভাত।

হেমকান্তি এবার প্রতিবাদ করলেন। বেশ জোর দিয়ে বললেন, না। পাঞ্জাবির দোকান থেকে কষা মাংস আর রুমালি রুটি আনিয়ে দেবে। সঙ্গে পেঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কা।

এই কথাগুলি তিনি সহজে গরগর করে বলতে পারলেন।

মেজদা রত্নেশকে জিজ্ঞেস করলেন, ডাক্তাররা খাওয়াদাওয়ার কোনও রেসট্রিকশনের কথা বলেছে?

রত্নেশ বলল, সে রকম কোনও কথা হয়নি। মানে, আমাকে কিছু বলেননি।

হেমকান্তি বললেন, আমার টাকাপয়সা কোথায়? পকেটে কিছু নেই দেখছি।

মেজদা বললেন, এখন টাকাপয়সা লাগবে কীসের জন্য? কাল সকালে তোকে সব বুঝিয়ে দেব।

হেমকান্তি রত্নেশকে জিজ্ঞেস করলেন, এ-বাড়িতে কি কফি পাওয়া যায়? আমি এখন কফি খেতে পারি।

রত্নেশ বলল, কফি পাঠিয়ে দিচ্ছি। দুধ-চিনি দিয়ে?

হেমকান্তি একটু চিন্তা করে বললেন, তা জানি না।

মেজদা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, রত্নেশ তার আগেই বলল, ঠিক আছে, দুধ আর চিনি আলাদা থাকবে।

এবার বেরিয়ে যাবার সময় রত্নেশ দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে গেল।

হেমকান্তি দাঁড়ালেন একটা জানালার সামনে। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে একটা পুকুর। তার ধারে ধারে এলোমেলো গাছপালা। পুকুরটায় ডুব দিচ্ছে আর উঠছে দুটো কালো রঙের হাঁস। কুচকুচে কালো।

এই ঘরটা কার? বাইরে থেকে নিজের ঘরে ফিরে এলে জলের মাছের মতন যে একটা সাবলীল ভাব হয়, সে রকম কোনও অনুভূতি তাঁর হল না।

এই বৃদ্ধটি তাঁর মেজদা। তা ঠিক। কিন্তু মেজদার তো একটা নাম থাকবে, সেটা মনে নেই। মেজদা থাকলে একজন বড়দাও থাকা উচিত, কী তাঁর নাম, কেমন তাঁর চেহারা? মনে নেই। রি-কল, রি-কল! আসছে না।

একটি ছেলে তাঁকে ছোটমামা বলল। মায়ের ভাইকে যে মামা বলে, এটা হেমকান্তির মনে আছে। তা হলে তাঁর সেই বোনকে দেখতে কেমন, কী তার নাম? মনে পড়ছে না। আর কে কে আছে তাঁর পরিবারে?

এত বিস্মৃতি কেন! মাঝে মাঝে কথা বলতেও ভুল হচ্ছে। এই যে একটু আগে রত্নেশ যখন জিজ্ঞেস করল, কফি দুধ-চিনি দিয়ে কি না, তার উত্তর কি জানি না হয়? তিনি মনশ্চক্ষে দেখতে পেলেন কফির রং কালো, কিন্তু তার মধ্যে চিনি থাকে কি না মনে করতে পারলেন না। চিনি-বিহীন কিংবা চিনি-সমেত কফির স্বাদের তফাতও তাঁর স্মরণে নেই।

ভুলে যাওয়ার একটা অসুখ আছে। আস্তে আস্তে অনেক কিছু স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায়। কী যেন রোগটার নাম? অনেক কিছু ভুলে গেলে রোগের নামটাই বা মনে থাকবে কেন? কী কী জিনিস ভুলে যাবে, তার কি কোনও পদ্ধতি আছে? তাঁদের বাড়িটা একটা অন্ধ গলির শেষ প্রান্তে, এটা হেমকান্তির মনে আছে। অথচ এ-বাড়িটা তাঁর চেনা মনে হচ্ছে না। সিঁড়ির বাঁকটা বুঝতে পারেননি। এই ঘরখানা...ওই বিছানার বালিশে তিনি কোনওদিন মাথা রেখে শুয়েছেন? বালিশটাকে চেনা মনে হয় না।

অ্যালঝাইমারস ডিজিজ! এই তো মনে পড়েছে! তা হলে ফিরে আসতে পারে। রোগের নাম মনে পড়লে তার উপসর্গগুলোও মনে আসবে না কেন? পাগলরাও আত্মপরিচয় ভুলে যায়। কিন্তু পাগলামি আর এই রোগ এক নয়। অ্যালঝাইমারস হলে তো কেউ নার্সিংহোমে যায় না। হ্যাঁ, এটা ঠিক মনে আছে, নার্সিংহোমে পাঠাবার মতন এমার্জেন্সি কিংবা ছোঁয়াচে রোগ নয়।

দুই ভুরুর মাঝখানে সমস্ত মনঃসংযোগ এনে হেমকান্তি মনে করতে চাইলেন, তিনি কেন নার্সিংহোমে গিয়েছিলেন? এটা জানা তাঁর বিশেষ দরকার। শরীরে কোথাও কাটা-ছেঁড়া নেই, সে রকম ব্যথা বেদনাও নেই, তা হলে? রি-কল! রি-কল! কতদিন ছিলেন নার্সিংহোমে? দু'জন ডাক্তারের মুখ বেশ মনে আছে, এক জন অল্পবয়েসি, হাস্যময় ও চঞ্চল, কথায় কথায় সে একজ্যাক্টলি বলত। মাত্র দু'-এক দিনে তো কেউ মনে এরকম ছাপ ফেলে না। জানতেই হবে, কী রোগ আর কত দিন।

হেমকান্তি বইয়ের আলমারিটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। বেশ যত্ন করে বইগুলি সাজানো রয়েছে। তালা বন্ধ নয়। খুললেন। এত সব বই কার? প্রথম যে বইটি তিনি টেনে বার করলেন, সেটি হুইটম্যানের 'লিভস অফ গ্রাস।'

পাতা না উলটেই হেমকান্তি আপন মনে বলতে লাগলেন : আই অ্যাম দা পোয়েট অফ দা বডি অ্যান্ড আই অ্যাম দা পোয়েট অফ দা সোল, দা প্লেজারস অফ হেভেন আর উইথ মি অ্যান্ড দা পেনস অফ হেল আর উইথ মি ...। বেশ মুখস্থ আছে।

এরপর দেখলেন, প্রথম পৃষ্ঠাতেই লেখা হেমকান্তি লাহিড়ী, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রেসিডেন্সি কলেজ। হেমকান্তি ভুলে যাননি যে তাঁর নাম হেমকান্তি। এটা তা হলে তাঁরই বই, কলেজজীবনে কিনেছিলেন। নিজের বইটা চিনতে পারছেন না, অথচ কবিতার অংশ মুখস্থ আছে। এ কী রকম বিস্মৃতি! পাশের বইটি

'সঞ্চয়িতা।' তার প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা, 'হেমকে তার জন্মদিনে অনেক ভালোবাসা।' সুধামাসি। কোনও তারিখ নেই। কত তম জন্মদিন তার উল্লেখও নেই। কে এই সুধামাসি?

এই বইগুলি সাক্ষ্য দিচ্ছে, এই ঘরটা তাঁরই। নিজের ঘরও চিনতে না পারায় হেমকান্তি খুবই বিরক্ত বোধ করলেন। অথচ তাঁর অনুভূতি হচ্ছে, আস্তে আস্তে সবই মনে পড়বে। কোথায় যেন একটা দরজা আটকে আছে। খুব জোরে একটা ঝাঁকুনি দেওয়া দরকার।

একটা শব্দ পেয়ে হেমকান্তি মুখ ফেরালেন।

একটা ট্রেতে কফি আর আলাদা পাত্রে দুধ আর চিনি নিয়ে এসেছে ডুরে ম্যাক্সি পরা তরুণীটি। সে কি তবে এ বাড়ির পরিচারিকা? সে-কাজের তুলনায় তার পোশাকটা কি সঠিক?

হেমকান্তি প্রথমে কালো কফিতে এক চুমুক দিয়ে বুঝলেন, এই স্বাদটাই তাঁর পছন্দ, দুধ ও চিনি অবান্তর।

মেয়েটি বলল, বিস্কুট নিন!

হেমকান্তি ভুরু কুঁচকে বললেন, বিস্কিট? না, দরকার নেই, তুমি আমাকে একটা সিগারেট এনে দিতে পারো?

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে যেন অনেক দূরে সরে গেল, ধোঁয়ায় আবছা হয়ে গেল তার শরীর।

হেমকান্তি এতে খুব বিস্মিত হলেন না। এরকম তাঁর হচ্ছে মাঝে মাঝে। খুব কাছের জিনিস সরে যাচ্ছে দূরে। এটা চোখের কোনওরকম রোগ? অথচ তিনি এখনও চশমা ছাড়া বই পড়তে পারেন।

সেই দূরত্ব থেকে মেয়েটির স্বর ভেসে এল, হ্যাঁ, পারি।

হেমকান্তি বললেন, তুমি অত দূরে চলে গেলে কেন? কাছে এসো, কাছে এসো!

চোখ বন্ধ করলেন। দু'হাতের তালু দিয়ে চোখ ঘষে আবার খুলতেই দেখলেন, মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে আগের জায়গায়, তার মুখে ঝলমলে হাসি।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমার কাছে তো এখন পয়সা নেই, তুমি ... ইয়ে ... কী যেন আনতে বললাম, ও হ্যাঁ, সিগারেট, কোথা থেকে আনবে?

মেয়েটি বলল, চুরি করে আনব!

সঙ্গে সঙ্গে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

এতে কোনও সন্দেহ নেই যে মেয়েটির গায়ে মৃদু কোনও ফুলের গন্ধ আছে। সেই গন্ধ-মিশ্রিত বাতাসও চলে গেল দরজা দিয়ে। ও কি কোনও পারফিউম ব্যবহার করে? মেয়েরা কি বাড়ির মধ্যেও সুগন্ধ মেখে থাকে?

ছোট ছোট চুমুক দিয়ে কফিটা শেষ করলেন হেমকান্তি।

মাথার মধ্যে অনেকগুলো ধাঁধা ঘুরছে, তিনি উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না। গুরুতর অসুস্থ হলেই লোকে নার্সিংহোমে যায়। তাঁর শরীরে ব্যথা-বেদনা কিছু নেই। ডাক্তাররা কেন বলে দিয়েছে যে এখনও বেশ কিছুদিন তিনি সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করতে পারবেন না? তাঁকে এই বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে, এখান থেকেই কি তিনি অসুস্থ হয়ে নার্সিংহোমে গিয়েছিলেন? ঠিক কতদিন আগে? ওখানে যে ডাক্তারটি কথায় কথায় একজ্যাক্টলি বলত, সে একদিন বলেছিল, মানুষের জীবনে সবচেয়ে ইমপর্টান্ট ব্যাপার কী বলুন তো? স্রেফ বেঁচে থাকা। এই প্রি-কন্ডিশন না থাকলে সব কিছুই বোগাস! প্রেম, অ্যামবিশন, সাকসেস, এ সব কিছুই ওয়ার্থলেস।

কথাটা শুনে হেমকান্তি একটু বিরক্ত বোধ করেছিলেন। এটা এমন কিছুই উচ্চাঙ্গের দর্শন নয়। অনেকে অতি সাধারণ কথা এমন জোর দিয়ে বলে যেন নতুন কিছু শোনাচ্ছে। যাকে বলা হচ্ছে, তার বুদ্ধিবৃত্তি, পড়াশুনোর কথা বিবেচনা করে নয়। ডাক্তারের কাছে সব রোগীরাই কি নিম্নস্তরের মানুষ?

হেমকান্তি ডাক্তারটির ওই উক্তি সম্পর্কে কোনও মন্তব্য না করে শুধু বলেছিলেন, প্রি-কন্ডিশন?

ডাক্তারটি বলেছিল, একজ্যাক্টলি। মনে করুন, আমি আজ এখান থেকে বেরিয়ে ... একটা কার অ্যাকসিডেন্টে খতম হয়ে গেলুম, সঙ্গে সঙ্গে আমার যে এত কষ্ট করে লেখাপড়া, এফ আর সি এস, সল্ট লেকে নতুন বাড়ি, সব ফুস হয়ে যাবে না?

এইসব এলেবেলে কথা স্পষ্ট মনে আছে, অথচ অনেক কিছুই তলিয়ে গেছে বিস্মৃতিতে। ভালোবেসে জন্মদিনে বই উপহার দিতেন যে সুধামাসি, কেন হারিয়ে গেছে তাঁর মুখের ছবি? মা? হ্যাঁ, মনে আছে। বাবা? হ্যাঁ, মনে আছে। ওঁরা দু'জনেই পৃথিবীতে নেই, তা মনে আছে। মা চলে গেছেন অনেক আগে। সেদিন খুব ঝড়বৃষ্টি ছিল, না না, ঝড়বৃষ্টি তো বাবা যেদিন সিঁড়ি থেকে পড়ে গেলেন। মায়ের দিনটা, শীতকাল ছিল, ইন্দিরা গাঁধী যুদ্ধ ঘোষণা করলেন রেডিয়োতে। আজ কত তারিখ?

নার্সিংহোম থেকে ছেড়ে দেবার সময় ডাক্তাররা নিশ্চয়ই এক প্রেসক্রিপশন দেয়। তাতে কি রোগের নাম লেখা থাকে? রত্নেশের কাছ থেকে সেটা চেয়ে নিয়ে দেখতে হবে।

মেয়েটি তো এখনও সিগারেট নিয়ে এল না? কার কাছ থেকে চুরি করে আনবে?

হেমকান্তি ঘরের মধ্যে পায়চারি করলেন কয়েকবার। মাথার টলটলে ভাবটা চলে গেছে। দু'হাত দিয়ে চেয়ারটা উঁচু করে তুললেন, কোনও কষ্ট হল না। কোনও কঠিন রোগ হলে তো মানুষ দুর্বল হয়ে যায়।

সেই চেয়ারটাতেই বসে পড়ে তিনি দু'হাতে মাথা চেপে ধরে চোখ বুজলেন। ফিসফিস করে বলতে লাগলেন, রি-কল! রি-কল! ফিরে এসো, স্মৃতি! আমি যখন নার্সিংহোমে ভরতি হলাম, তখন আমি কি অজ্ঞান, না জ্ঞান ছিল? ফিরে এসো, ফিরে এসো! নাঃ, সে দৃশ্যটা কিছুতেই চোখের সামনে ভাসছে না, তা হলে ধরে নেওয়া যেতে পারে অজ্ঞান। রুক্ষ স্বভাবের মেজদা কেন বলল, তুই তো বরাবরই আধপাগলা। যাক, তাতে বোঝা গেল, পাগলামির চিকিৎসার জন্য নয়! হেমকান্তি দৃঢ়ভাবে নিজেকে বোঝালেন, না, তিনি মোটেই পাগল হননি, তাঁর স্মৃতির অনেকখানি নষ্ট হয়ে গেছে বটে, কিন্তু তা পাগলামিজনিত নয়। মানুষের মস্তিষ্কে দশ বিলিয়ন স্মৃতিকোষ থাকে, তার অর্ধেকও সারাজীবনে ব্যবহার হয় না। তবু কেন কিছু কিছু হারিয়ে যায়? আবার ফিরে আসতেও পারে, যেমন বাংলা কথা বলতেও আটকে যাচ্ছিল, এখন সে অসুবিধে নেই। মেজদাকে ভুলে গিয়েও চিনতে পারলেন ঠিক মুহূর্তে। খুব ছোট বয়েসে মা ঘুম পাড়াবার সময় একটা ছড়া বলতেন, আয় ঘুম যায় ঘুম দত্ত পাড়া দিয়ে, দত্তদের বউ পান সেজেছে এলাচদানা দিয়ে... পাগলদের কি এসব মনে থাকতে পারে?

দুটি জিনিস, না কয়েকটি জিনিস জানা আগে বিশেষ দরকার। আমি কে? এই বাড়িটাই কি আমাদের নিজের বাড়ি, তবু অচেনা মনে হচ্ছে কেন? কোন রোগের চিকিৎসার জন্য আমি নার্সিংহোমে গিয়েছিলাম?

ফিরে এসো, ফিরে এসো। নার্সিংহোমে যাবার আগে তুমি কোথায় ছিলে, কী করতে হেমকান্তি?

মনে পড়ে না।

নার্সিংহোমে আরও তো ডাক্তার ছিল, নার্স ছিল, তাদের মুখ অস্পষ্ট হয়ে

গেছে। শুধু ওই একজনই তরুণ ডাক্তার, তার নাম, উৎপল, ডক্টর ইউ চ্যাটার্জি তার মুখ মনে আছে। আর তার ওই অকিঞ্চিৎকর বাক্য, মানুষের জীবনের সবচেয়ে ইমপর্টান্ট ব্যাপার ... স্রেফ বেঁচে থাকা ... অন্য সব বাদ দিয়ে শুধু এটা মনে রাখার কারণ কী? এখনকার অনেক অল্পবয়েসিদেরই মতন, ডাক্তারটি খুব ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে। অ্যামবিশন, শাকসেস এর সঙ্গে সে বলেছিল, প্রেম, তার বদলে লাভ তো বলেনি। প্রেম, এই শব্দটি বাঙালিদের এখনও প্রিয়!

যদি কিছুই না মনে পড়ে, তা হলে এখান থেকেই আবার নতুনভাবে শুরু করতে হবে জীবন?

দুই

একতলায় একটি রেশনের দোকান, একটি ওষুধের দোকান, আর একটি বড় ঘর এককালে বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহার হত, এখন বাড়ির কর্তাব্যক্তিরা কেউ সে ঘরে বসেন না। মাঝে মাঝে পাড়ার ছেলেরা সেইখানটা ক্যারাম প্রতিযোগিতার জন্য ব্যবহার করে। দুটি রাজনৈতিক দল সেটি ভাড়া নেবার নামে দখল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

তিনতলা বাড়িটির সম্মুখভাগ একেবারে রাস্তার ওপর, যদিও পেছন দিকে বেশ খানিকটা জমি আছে। তার কিছুটা অংশ সিমেন্ট-বাঁধানো, বাকি অংশে করুণ বাগান। গাছগুলি থেকে শুধু পাতা ঝরে যায়, ফুল ফোটে না। শুধু একটা কামিনী ফুলের গাছ এক কোণে, বিনা যত্নে ঝাড় বিস্তার করে আছে, রাত্তিরে মৃদু সুগন্ধও ছড়িয়ে দেয়, এ-বাড়ির অনেকেই এখন এ গাছের নাম জানে না। পুরো জমিটা বেশ উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, তার ওপরে ভাঙা বোতলের কাচ গাঁথা। পাঁচিলের ওপাশে, বাইরের একটা পেয়ারা গাছ অনেক বড় হয়ে গেছে, তার দুটো ডাল ঝুঁকে পড়েছে এদিকে, যেন উঁকি মেরে দেখছে। ওই ডাল বেয়ে উঠে এসে, পাঁচিল ডিঙিয়ে এদিকে চোরও ঢুকে পড়তে পারে। ভাঙা কাচের টুকরো কোনও বাধাই নয়, একটা চটের বস্তা পেতে দিলেই ওই দেওয়ালের ওপর অনায়াসে পা রাখা যায়। সেইভাবে গত এক বছরের মধ্যেই দু'বার ছিঁচকে চোরেরা এসেছিল। তবু পেয়ারার ডাল দুটো কেটে ফেলার কথা কেউ ভাবেনি।

সিমেন্টের উঠোনের দু'পাশে গোটা চারেক টালি-চালের ঘর, সেগুলি বাড়ির কাজের লোকদের জন্য নির্ধারিত। একটা বড় রান্নাঘরও রয়েছে, সেটিও বৈঠকখানার মতনই এখন অব্যবহৃত, দোতলায়-তিনতলায় আলাদা রান্নাঘর হয়েছে। ওপরে যাবার সিঁড়ির মুখের দেওয়ালে একটি দেওয়ালঘড়ি স্তব্ধ হয়ে আছে বহুদিন। পেন্ডুলাম দোলানো ওইসব ঘড়ি এখন অচল, দোকানদাররাও সারাতে জানে না। এরকম বেশ কিছু জিনিস বাতিল হবার যোগ্য, সরিয়ে ফেলা উচিত, তবু রয়ে গেছে। যেমন নীচের রান্নাঘরে ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানির পাইপ ও উনুন। কলকাতার কিছু এলাকায় যে বিদ্যুতের মতন রান্নার গ্যাসও পাইপ-বাহিত হয়ে আসত, তা আর ক'জন মনে রেখেছে এখন?

দোতলা ও তিনতলার আঙ্গিকে অনেক তফাত। দোতলায় ভেতর দিকের ঢাকা বারান্দাটিকেই বসবার ঘর হিসেবে সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে। আসবাবগুলি আধুনিক রীতির এবং ঝকঝকে। মেঝেতে আঙুর রঙের কার্পেট, দেওয়ালে যামিনী রায় ও মকবুল ফিদা হুসেনের আঁকা ছবি, প্রিন্টও হতে পারে, শুধু এক কোণে একটি ঢাউস আকারের আরামকেদারা, যার দু'দিকের ডানা খুলে দিলে পা তুলে রাখা যায়। এটি বেমানান হলেও বোঝা যায় অ্যান্টিক, সযত্নে পালিশ করা। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডান দিকে জুতো খুলে রাখার জায়গায় একটি র‍্যাকের ওপর সাজানো রয়েছে দশ-বারো জোড়া রবারের চটি, একই রকম, বাইরের অতিথিরা এখানে নিজেদের জুতো খুলে রেখে চটি পরে নেবেন। এটা জাপানি প্রথা।

অন্য দেশের প্রথা আয়ত্ত করে নিতে মাঝে মাঝে ভুলভ্রান্তি হতেই পারে, কোনও কোনও অতিথি ফেরার সময় নিজস্ব জুতোর কথা ভুলে গিয়ে চটি পরেই চলে যান। গত বছরই তো জয়ীর বন্ধু রুস্তম মাঝরাতে তাড়াহুড়ো করে সবার নজর এড়িয়ে চটি পরেই ফিরে গেল হোটেলে, ভোরবেলা তার দিল্লির ফ্লাইট, দিল্লিতে পৌঁছে সে টেলিফোনে জানাল, কমার্স সেক্রেটারির সঙ্গে মিটিংয়ের অ্যাপয়েন্টমেন্ট সাড়ে দশটায়, সুটের সঙ্গে চটি পরে সেখানে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। জুতো কিনতে হবে, কিন্তু এখনও দিল্লিতে কোনও জুতোর দোকান খোলেনি, কী মুশকিল! এই নিয়ে খুব হাসাহাসি হয়েছিল।

পাশাপাশি সব কটি ঘরের দরজায় পরদা ফেলা। একটি ঘর থেকে প্রায়

সর্বক্ষণই গান-বাজনার রেকর্ড শোনা যায়, তবে মৃদুভাবে, কান পাতলে বাইরে থেকে বোঝা যায়, অথবা না শুনলেও চলে।

দোতলার এই অংশটি পিনাকেশ লাহিড়ীর রাজত্ব। তিনি যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন, ততক্ষণ তাঁর পরিবারের সকলকে দুর্বল প্রজাসমষ্টির মতনই তটস্থ হয়ে থাকতে হয়। পিনাকেশ নিজেও জানেন যে তিনি বদমেজাজি, কটুবাক, যুক্তিবিরোধী, অসহিষ্ণু, তবু নিজেকে সংযত করতে পারেন না। পরিবারের কারও কাজে বা ব্যবহারে সামান্য বিচ্যুতি দেখলেই রাগে জ্বলে ওঠেন, এমনকী কেউ একটা কাচের গেলাস হাত থেকে ফেলে দিলেও বিশ্রী, তিক্ত ভাষায় বকাবকি করেন। কোনওরকম প্রতিবাদই তাঁর অসহ্য। এরকম এক-একবার ক্রুদ্ধ দাপাদাপির পরেই তিনি বাথরুমে গিয়ে দরজা আটকে দেন। সেখানে নিঃশব্দে তিনি কয়েকক্ষণ কীভাবে সময় কাটান তা অন্য কেউ দেখেনি। পিনাকেশ সেই সময় আয়নার সামনে খুব জোরে জোরে নিজের কান মুলতে থাকেন। সেইজন্যই তাঁর কান দুটির রং লালচে।

আগের দিন সন্ধ্যায় হেমকান্তিকে যখন একটা চেয়ারে বসিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় তোলা হয়, তখন অনেকেই তাঁকে দেখার জন্য ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু পিনাকেশ যাননি, কোনওরকম কৌতূহলও দেখাননি। তিনি তখন সি ডি প্লেয়ারে যন্ত্রসংগীত জোর করে দিয়েছিলেন।

এই দোতলার রাজত্বে ভোরবেলা সবচেয়ে প্রথমে জেগে ওঠে জয়ী। তাকে দেখলে যে-কোনও অচেনা ব্যক্তিই কয়েক মুহূর্ত অপলকভাবে চেয়ে থাকবে। তার রূপের জন্য নয়, জয়ীকে ব্রবডিংনাগ প্রজাতির অন্তর্গত বললে অতিশয়োক্তি হয় না। সে অনন্যসাধারণ। তাকে বেঢপ বা স্থূলকায় মনে হবে না কিছুতেই। শুধু তার সব কিছুই বড়, দৈর্ঘ্যে, খানিকটা প্রস্থেও, যেমন তার চোখ দুটি আকর্ণ, তেমনই তার চুল ছিল নিতম্বস্পর্শী। এখন অবশ্য সে চুল কেটে ফেলে পুরুষ ছাঁট দিয়েছে।

এ-বাড়ির পুরুষরাও সাধারণ বাঙালিদের তুলনায় দীর্ঘকায়, কেউই পাঁচ দশের কম নয়। কিন্তু মেয়েরা পেলব, মধ্যাঙ্গিনী, জয়ীর দুই দিদিও সেরকম, শুধু জয়ীই যেন পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিতে চেয়েছে। সে পাঁচ আট। সে নিয়মিত যোগাসন করে আর নাচে, তাই তার শরীরে এক ছিটে মেদ নেই। গায়ের রং কোনও ফলের সঙ্গে উপমা দিলে বলতে হয় সবেদা বা চিকুর মতন, অর্থাৎ বাংলা মতে কালোর দিকেই। শ্যামাও বলা যেতে পারে। তার মুখে

একটাই খুঁত, চিবুকের ঠিক মাঝখানে একটা গভীর কাটা দাগ, বালিকা বয়েসের দুরন্তপনার চিহ্ন। হাজারিবাগে একবার চালতা গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল, তলায় টুকরো টুকরো পাথর, একটা পাথর একেবারে গেঁথে গিয়েছিল ছুরির মতন, সেটাকে বার করে পাঁচটা সেলাই দিতে হয় আনাড়ি এক ডাক্তারের হাতে, তাই সে দাগ আর মিলিয়ে যায়নি। জয়ীর যখন মন খারাপ হয়, তখন ওই জায়গাটা টিপে ধরে থাকে এক আঙুলে। হ্যাঁ, অত বড় শরীর বলেই হয়তো তার মন খারাপও অন্যদের তুলনায় বেশি বেশি।

জয়ী রোজই ভোরভোর উঠে পড়ে, তার কারণ সে সকলের আগে বাথরুম ব্যবহার করতে চায়। ভিজে বাথরুম সে একেবারে সহ্য করতে পারে না। দোতলাতেই যদিও দুটো বাথরুম আছে, ঠিক পুরুষ ও মেয়েদের জন্য আলাদা আলাদাভাবে সংরক্ষিত না হলেও বাইরের অতিথি-বন্ধুরা যখন আসে, তাদের কখনও কখনও বাথরুম ব্যবহার করতে দিতেই হয়। বিশেষত শীতকালে। সেই বাথরুমটিতে জয়ী কখনও ঢোকে না। এটা তার বাতিক।

একবার এ-পরিবারের সবাই মিলে যাওয়া হয়েছিল শিমুলতলা, একটা বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল আগে থেকে, সে বাড়ির সবই ভাল, কিন্তু পুরনো আমলের, একটিই মাত্র বাথরুম, তাও একতলায়। সে-বাথরুম বেশ প্রশস্ত ও আলো-হাওয়া যুক্ত, অপছন্দের কিছু নেই, কিন্তু প্রথম সকালেই জয়ী আবিষ্কার করল, টয়লেটের স্কাইলাইটের তাকে কয়েকটা পোড়া বিড়ির টুকরো। এ পোড়া বিড়ির রহস্য সমাধানের জন্য শার্লক হোমসকে ডাকার দরকার হয় না। অর্থাৎ যখন মালিকরা আসে না কিংবা কেউ ভাড়া নেয় না, তখন, সেই খালি সময়ে, কেয়ারটেকারের যদিও নিজস্ব কোয়ার্টার আছে, তবু সে বাবুদের বড় বাথরুম আরামসে ব্যবহার করে।

তা বোঝামাত্র ঘেন্নায় জয়ীর সব অঙ্গ কিলবিল করে উঠেছিল। দৌড়ে সে বেরিয়ে গেল, চেঁচামেচি করে বাড়ির সবাইকে এই নিদারুণ সংবাদটি জানালেও অন্য কেউ বিশেষ পাত্তা দিল না। চৌকিদার বা কেয়ারটেকারকে ডাকা হতে সে অভিযোগটি জোর দিয়ে অস্বীকার করল তো বটেই, শপথ করে জানাল যে আগের দিন সে ফিনাইল দিয়ে বাথরুম পরিষ্কার করে রেখেছে, (শুধু বিড়ির টুকরোগুলো সরাতে ভুলে গেছে), দরকার হলে সে আবার ধুয়ে দিতে পারে, ওই বিড়ির টুকরোগুলো নিশ্চয়ই রং-মিস্ত্রিদের।

কিন্তু জয়ী আর সে বাথরুমে ঢুকতে রাজি নয়। আর এমনই তার সংযম ও

জেদ যে বিকেল পর্যন্ত টয়লেটেও গেল না। টয়লেটের সিটে কেয়ারটেকারটি নগ্ন হয়ে বসে আছে, এই দৃশ্য সে কল্পনা থেকে তাড়াতে পারছে না কিছুতেই। সন্ধেবেলা সে পিনাকেশের দাবড়ানি অগ্রাহ্য করে একা ট্রেনে চেপে ফিরে এল কলকাতায়।

বাথরুম সম্পর্কে এত পিটপিটানি জয়ীর, অথচ সে ঘামের গন্ধ খুব ভালবাসে। পুরুষমানুষের পিঠের ঘাম। তেমন ঘামের গন্ধে সে মোহিত হয়ে যায়।

বসবার জায়গাটিতে সারারাত একটা নরম নীল আলো জ্বলে। সে-আলো নিভিয়ে দিল জয়ী। খুলে দিল একদিকের জানলা। এ জানলা দিয়ে দুটি নারকোল গাছ দেখা যায়। ভোরের বাতাসে একটা পবিত্রতার গন্ধ আছে। জানলা দিয়ে তাকিয়ে জয়ীর মনে পড়ল, অনেকদিন ছাদে ওঠা হয়নি। ভোরবেলা কিংবা বেশি রাত্রেই ছাদে যাওয়া সুবিধেজনক, কারণ এ-বাড়িতে দোতলা ও তিনতলার বাসিন্দাদের মধ্যে মনোমালিন্য চলছে বেশ কিছুদিন, দেখা বা সাক্ষাতের অনুচ্চারিত বিধিনিষেধ আছে। একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেলে মুখ ফিরিয়ে নেবার মতন নয় অবশ্য। জয়ী সব বিধিনিষেধ মানে না, সে মাঝে মাঝে তিনতলায় যায়, যদিও অন্যদের অস্বস্তির আঁচ তার গায়ে লাগে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়ে জয়ী মুখ ফেরাল।

ওপর থেকে নেমে আসছেন হেমকান্তি। পাজামা ও গেঞ্জি পরা। তিনি সুপুরুষ হলেও এখন তাঁকে দেখাচ্ছে বিধ্বস্ত মানুষের মতন, অবিন্যস্ত চুল, চোখের নীচে কালির পোঁচ, জোড়া ওষ্ঠে বেদনার রেখা। সারারাত তিনি এক বিন্দু ঘুমোতে পারেননি, বিস্মৃতি তাঁকে দারুণ কষ্ট দিচ্ছে এখন, ডুবন্ত মানুষের মতন অসহায় বোধ করছেন। ঘুম না হলে মস্তিষ্কও জেগে থাকে। তখন অনবরত চিন্তার স্রোত চলতে থাকে। কিন্তু সব চিন্তাই তো মানুষের জীবনস্মৃতি। যার জীবনের অনেকখানি মুছে গেছে, সে কী করে অতীত রোমন্থন করবে কিংবা ভবিষ্যৎ গড়তে চাইবে? সারারাত ধরে শুধু চোখের সামনে ভেসেছে অনেক অস্পষ্ট মুখ, কিছু মুখ স্পষ্ট হলেও তিনি চিনতে পারেননি, আর কিছু ঘটনা বারবার, তাও প্রায় অর্থহীন, যেমন ওই ছোকরা ডাক্তারটির উক্তি, কিংবা মেজদার ভর্ৎসনা, 'তুই তো বরাবরই আধপাগল' ... আর নির্জন সমুদ্রকিনারে একটা লাইট হাউস, দৃশ্যটি সুন্দর, কিন্তু কেন, তিনি কবে, কোথায় ওরকম লাইট হাউস দেখলেন?

সারারাত বিছানায় ছটফট করে জানলা দিয়ে ভোরের আলো দেখামাত্র উঠে পড়েছিলেন হেমকান্তি। বাথরুমে গিয়ে ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে তিনি যে দাঁত মাজলেন, তা তো তাঁকে বলে দিতে হল না। এটা অভ্যেসবশতই হয়। কিন্তু ঘর থেকে বেরোবার সময় চুলে চিরুনি দেবার কথা মনে পড়েনি। দাঁত মাজার মতন চুলও তো আঁচড়াচ্ছেন বহু বছর ধরে, তবে সব অভ্যেসের গভীরতা এক রকম নয়?

হেমকান্তি জয়ীকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। প্রথম কয়েক মুহূর্ত যেন জলের মধ্যে ওলোটপালট খেল একটা মুখের ছবি, তারপর মিলিয়ে গেল। শুধু জল। হেমকান্তি হতাশভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

দুঃখীর মতন ভাঙাভাঙা গলায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে?

জয়ী এ-প্রশ্ন শুনে অবাক হল না। সে আগেই শুনেছে যে ইনি টিটোকে চিনতে পারেননি। টিটো এ-বাড়ির হিরো।

সে বলল, আমি? আমি অনন্তপুরের মেয়ে, খুব ছোটবেলায় আমাকে অন্য গ্রহের প্রাণীরা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানকার অমৃতফল খেয়ে আমার চেহারাটা এরকম বড় হয়ে গেছে। বদলে গেছে মুখটাও। মাত্র কয়েক মাস আগে স্টার ট্রেক-এর অভিযাত্রীরা উদ্ধার করে এনেছে আমাকে, তাই চিনতে পারছেন না। কিন্তু অনন্তপুরের কথা আপনার মনে আছে তো?

হেমকান্তি এই রূপকথাটি ধরতে পারলেন না। অঙ্ক ভুল করা ছাত্রের মতন বললেন, অনন্তপুর? না, মনে নেই।

জয়ী জিজ্ঞেস করল, আপনি খালি পায়ে কোথায় যাচ্ছেন?

নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে হেমকান্তি বললেন, ডাইনিংরুমে কফি খেতে যাচ্ছি। সেখানে যেতে গেলে কি জুতো পরে যেতে হয়?

এবার জয়ীর ভুরুতে অবাক ভাব ফুটে উঠল। সে বলল, ডাইনিংরুমে? সেটা কোথায়?

হেমকান্তি বললেন, একতলায়?

জয়ী কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল, আমি এখানে কফি করে দিতে পারি।

হেমকান্তি বললেন, না, আমি নীচেই যাচ্ছি।

জয়ী রেলিং ধরে উঁকি মেরে হেমকান্তিকে নামতে দেখে, ঢুকে গেল রান্নাঘরে।

একটু পরেই হেমকান্তি আস্তে আস্তে উঠে আসতে লাগলেন, জয়ী আগের জায়গাটায় এসে দাঁড়াল।

হেমকান্তি বিভ্রান্তের মতন বললেন, নীচে তো ডাইনিংরুম নেই!

জয়ী বলল, কখনও ছিল বুঝি? আমি তো জানি না।

হেমকান্তি বললেন, শুধু একটা রান্নাঘর, তার ভেতরটা অপরিষ্কার, আর জাল, পাতলা পাতলা জাল, কীসের যেন, কোনও একটা পোকা—

জয়ী বলল, মাকড়সা? ও রান্নাঘরে কেউ যায় না।

হেমকান্তি বললেন, রান্নাঘরে কেন কেউ যায় না? তা হলে রান্না হয় কোথায়?

জয়ী বলল, আপনার প্রথম প্রশ্নের অনেকগুলো উত্তর, মানে কারণ থাকতে পারে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে, ওই ঘরের মধ্যেই বনমালী আত্মহত্যা করেছিল। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটা খুব সোজা। দোতলা আর তিনতলায় আরও দুটো রান্নাঘর তৈরি হয়ে গেছে। আমি জল গরম করছি। এখানে কফি খাবেন?

হেমকান্তি বললেন, খাব। তোমার নাম কী, কী বলে ডাকব?

জয়ী বলল, আমার নাম ছিল সুজয়া। সেটা আমার পছন্দ হয় না। আপনি আমায় জয়ী বলে ডাকবেন।

এদের রান্নাঘরটা খুব আধুনিক। গ্যাসের বদলে রান্না হয় বিদ্যুতে। একটা চওড়া হটপ্লেট। বিদেশ থেকে আনা হুইসলিং কেটলি, ঠিকমতন উত্তপ্ত হলেই জল তা জানিয়ে দেয়।

অচিরেই দু'কাপ কফি বানিয়ে, ট্রে-তে সাজিয়ে এনে জয়ী দেখল, হেমকান্তি এখনও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে। পাশাপাশি আসতেই বোঝা গেল, জয়ী হেমকান্তির চেয়ে উচ্চতায় একটুখানি মাত্র হ্রস্ব। মানুষের অনভ্যস্ত চোখে পুরুষ ও নারীর উচ্চতা সমান সমান হলেও নারীকে অনেক বেশি দীর্ঘকায় মনে হয়। জয়ীকেও তার সঠিক উচ্চতার চেয়ে বড় দেখায়।

জয়ী বলল, দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন!

সোফায় বসে, কফিতে এক চুমুক দিয়ে হেমকান্তি বললেন, বাঃ, বেশ ভাল হয়েছে।

জয়ী বলল, কফি খেয়ে যা বলতে হয়, আপনি ঠিক তাই বললেন।

হেমকান্তি এর মর্ম বুঝতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, কী?

পুনরুক্তি না করে জয়ী শুধু হাসল। যাদের চোখ টানাটানা, তাদের মুখের হাসি বেশ উজ্জ্বল হয়।

হেমকান্তি এবার বুঝতে পারলেন। তিনি অনেক কিছুই ভুলে গেছেন, কিন্তু অন্যের বানানো কফি খেয়ে কী বলতে হয়, তা তো ভোলেননি। স্মৃতির এ কী রকম নির্বাচন? সবই যেন রহস্যময়।

তাঁর মুখে এখনও কাতর ভাবটা লেগে আছে। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, তোমার নাম বললে, জয়ী। জয়ী, জয়ী! জয়ী, তুমি আমাকে চেনো? তুমি আমার নাম জানো?

জয়ী বলল, বাঃ, জানব না কেন? আমার তো কিছু গোলমাল হয়নি। আপনি হেমকান্তি লাহিড়ী, আপনি আমার কাকা, অবশ্য ছোটবেলায় অন্য কিছু ছিলেন।

গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে হেমকান্তি বললেন, আমি তোমার কাকা, ছোটবেলায় অন্য কিছু?

জয়ী বলল, বিস্কুট নিন। খেয়ে দেখুন, অন্য রকম লাগবে। মালয়েশিয়া থেকে আনা হয়েছে।

হেমকান্তি এ-কথা শুনতেই পেলেন না। মুখ নিচু করে নিঃশব্দে কফিতে চুমুক দিতে লাগলেন। তিনি নিজেকে খুঁজছেন, তাঁর অতীতের মধ্যে কোথায় ছিল এই মেয়েটি, তার একটাও ছবি নেই? একটা কোনও মুহূর্ত?

জয়ী বলল, আপনি এখনও দুধ-চিনি দিয়ে খান কি না জিজ্ঞেস করিনি। আগে যেমন পছন্দ করতেন।

হেমকান্তি মুখ তুলে সোজাসুজি চেয়ে রইলেন জয়ীর মুখের দিকে।

তারপর অত্যন্ত আন্তরিক মিনতির সুরে বললেন, তুমি আমার একটা উপকার করবে? আমি কেন হাসপাতালে গিয়েছিলাম, বলতে পারো? আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না। বারবার হেরে যাচ্ছি। তুমি জানো?

জয়ী বলল, জানব না কেন? আপনি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। আপনার বিছানায় শুয়ে...

অকস্মাৎ গালে একটা থাপ্পড় খাবার মতন সমস্ত ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেললেন হেমকান্তি। তাঁর ফরসা মুখখানি বিবর্ণ হয়ে গেল।

জয়ী বলল, অনেকক্ষণ কেউ টের পায়নি। টিটোই দরজা ভেঙে... আর

বেশি দেরি হলে...নার্সিংহোমেও বাহাত্তর ঘণ্টা আপনার জ্ঞান ছিল না।

হেমকান্তি বললেন, আমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম? কেন?

জয়ী তার ঠোঁটে আবার হাসির ঢেউ খেলিয়ে বলল, দ্যাট ইজ আ মিলিয়ান পাউন্ড কোয়েশ্চেন। সবাই তাই জিজ্ঞেস করছে। এর উত্তর তো আপনি ছাড়া আর কেউ জানবে না। কোনওরকম ঝগড়াঝাটি হয়নি, এটা পিয়োরলি আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। সত্যিই আপনার মনে নেই?

হেমকান্তি বললেন, মিথ্যে কথা বলার মতন শক্তিও আমার নেই। মাথাটা খুব দুর্বল।

জয়ী বলল, আপনি কোনও সুইসাইড নোটও লিখে রেখে যাননি। আপনার ওপর বাড়ির অনেকেই খুব বিরক্ত হয়ে আছে। কেন বলুন তো? আপনি অনেকদিন এখানে ছিলেন না। কোনও যোগাযোগ রাখেননি। হঠাৎ ফিরে এলেন মাস দেড়েক আগে, আপনার ঘরটা তালা বন্ধই ছিল, তারপর কয়েক সপ্তাহ যেতে না যেতেই এই কাণ্ড। এ-বাড়ির সবাইকে বিপদে ফেলে দেওয়া হল না? ক'দিন পুলিশ এসে ঘোরাঘুরি করেছে।

হেমকান্তি জিজ্ঞেস করলেন, আমি অনেকদিন এখানে ছিলাম না? তা হলে কোথায় ছিলাম?

জয়ী বলল, কী মুশকিল, তা আমরা জানব কী করে? কারওকে তো বলেননি। তপুর সঙ্গে মাস ছয়েক আগে একবার দেখা হয়েছিল, সে-ও আপনার খবর কিছু জানত না। আমিও এখানে ছিলাম না অনেকদিন।

তপু নামটিও হেমকান্তির কাছে নতুন, তবু তিনি আর কৌতূহল প্রকাশ করলেন না। আকস্মিকতার ধাক্কায় তিনি ক্লান্ত ও অবশ বোধ করছেন।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জয়ী বলল, কফি শেষ করার পর যদি আপনার সিগারেট খেতে ইচ্ছে করে, আমি একটা দিতে পারি। কিন্তু সেটা এখানে বসে খেতে পারবেন না। দাঁড়ান নিয়ে আসছি।

জয়ী একটা দরজা দিয়ে ঢুকে যাওয়ার পর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অন্য একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন পিনাকেশ। তিনি রীতিমতন স্লিপিং সুট পরা, মাথার চুল বেশ কমে গেছে, তাই আঁচড়ানো কি না বোঝা যায় না, চোখে আরশোলা রঙের ফ্রেমের চশমা। পিনাকেশও হেমকান্তির মতন দীর্ঘকায় পুরুষ, খুবই কাছাকাছি বয়েস, তবে হেমকান্তির মতন পিনাকেশের মুখমণ্ডল নির্লোম নয়, পুরুষ্টু গোঁফ আছে।

এটা যেন একটা মঞ্চ। জয়ীর প্রস্থানের পরই অন্য চরিত্রের প্রবেশ। প্রথমে দর্শকদের কাছে নিজেকে পরিচিত করাবার জন্য একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মঞ্চের অভিনেতারা যেমন পাশের চরিত্রের দিকে মুখ না ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে কথা বলে, সেইভাবে পিনাকেশ হঠাৎ তেরছাভাবে দাঁড়িয়ে জনগণকে উদ্দেশ করে ঘোষণার ভঙ্গিতে বললেন, হেম, তোকে আমি ফাইনালি বলে দিয়েছি, তোর সঙ্গে আমার কোনও চুক্তিটুক্তি হবে না। তুই মেজদার সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিবি। আমি কোর্টেও জানিয়ে দিয়েছি, তোর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। এই অবস্থায় আমার ফ্যামিলির সঙ্গে তোর মেলামেশাও আমার পছন্দ নয়। সিঁড়িটা কমন, এখান দিয়ে সবাই ওঠা-নামা করতে পারে, কিন্তু দোতলার এই বৈঠকখানাটা আমার নিজস্ব এলাকা।

হেমকান্তি মিনমিন করে বললেন, কীসের চুক্তি? আমি তো কিছু জানি না।

এবার পিনাকেশ ফিরে তাকালেন। তাঁর দৃষ্টিতে ঝকমক করছে ক্রোধ। তাঁর ব্লাডপ্রেসার বিপদ সীমা থেকে উঁচুতে বাঁধা, ডাক্তার তাঁকে অকারণে উত্তেজিত হতে বারণ করেছেন। বিশেষ করে সকালবেলা মেজাজ গরম করা খুবই অস্বাস্থ্যকর, কিন্তু তিনি তাঁর স্বভাব বদলাবেন কী করে!

তিনি ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, জানি না মানে! কতবার বলতে হবে? আমি এক কথার মানুষ।

হেমকান্তি বললেন, সত্যিই আমার মনে নেই। আপনি আর একবার বুঝিয়ে বলবেন?

পিনাকেশ এবার প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, মনে নেই? ন্যাকামি! তুই নাকি সব ভুলে গেছিস! ভান করছিস, তাই না? আমার সঙ্গে ওসব চালাকি করতে আসিস না!

হেমকান্তি দীনভাবে বললেন, ভান করব কেন? সত্যিই তো আমি অনেক কিছু ভুলে গেছি! তার জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে। আপনার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক আমি সেটাও ঠিক... মানে!

পিনাকেশ বললেন, যাক, তা হলে তো সব চুকেবুকেই গেছে। নতুন করে আর কিছু শুরু করার দরকার নেই। আমি মেজাজ খারাপ করতে চাই না। কিন্তু যাদের দেখলে আমার মেজাজ খারাপ হয়, তারা এখানে না এলেই পারে!

মঞ্চে জয়ীর পুনঃপ্রবেশ। তার পেছনে তার মা। পিনাকেশের উচ্চগ্রামের কণ্ঠস্বরে বাড়ির অন্যদের ঘুম তো ভাঙবেই। এ-পরিবারে সেটাই নিয়ম, পিনাকেশের জেগে ওঠার পরও অন্য কারও বিছানায় থাকাটা অপরাধ।

জয়ী এগিয়ে এসে বলল, বাবা, আমিই ফুলকাকাকে কফি খাবার জন্য এখানে বসতে বলেছি।

পিনাকেশ শ্লেষের সঙ্গে বললেন, বেশ করেছ! কফি খেতে কতক্ষণ লাগে? এরপর কি ব্রেকফাস্টও খাওয়াবে নাকি? তোমাদের যা খুশি করো।

তিনি দপদপিয়ে ঢুকে গেলেন বাথরুমে।

হেমকান্তি যে এখানে অবাঞ্ছিত, সেটুকু বোধ তাঁর আছে। তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

জয়ীর মা বনানী মৃদু গলায় বললেন, এখন কেমন আছ, হেম?

হেমকান্তি কিছু না বলে তাকিয়ে রইলেন। এ-মুখেরও কোনও ছবি নেই তাঁর স্মৃতিতে।

জয়ী বলল, আমার মা। আগে আপনি আমার মাকে দেখলেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন।

হেমকান্তি সঙ্গে সঙ্গে নিচু হয়ে বনানীর পায়ে হাত দিলেন। বনানী একটু পিছিয়ে গিয়ে বললেন, থাক, থাক।

তারপর বললেন, আমার কত্তাটির যখন তখন মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তুমি কিছু মনে কোরো না। আমাদের এমন লজ্জায় পড়তে হয়!

জয়ী কিংবা বনানী কিন্তু আর বসতে বললেন না হেমকান্তিকে। জয়ী একটা পুরনো ছেঁড়া খাম তুলে দিল তাঁর হাতে। খুব সূক্ষ্ম চোখের ইঙ্গিতে কিছু একটা জানাতে চাইল।

হেমকান্তি বনানীকে বললেন, আসি।

তিনি সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকে নামতে যেতেই জয়ী বললে, ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন, নীচে কিছু নেই, আপনার ঘর তো ওপরে।

হেমকান্তি দিক বদল করে ওপরের সিঁড়িতে পা দিলেন।

তিনতলাতেও একই রকম চওড়া বারান্দা, কিন্তু দোতলার মতন সুসজ্জিত নয়, এলোমেলো পড়ে আছে কয়েকটা চেয়ার। এ-বারান্দার খানিকটা অংশ কেটে একটা ঘর করা হয়েছে, তা ছাড়া তার টাঙিয়ে জামাকাপড় শুকোতে দেওয়া হয়।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হেমকান্তি জপ করতে লাগলেন, জয়ী, মেয়েটির নাম জয়ী, আমি তার কাকা, ভুললে চলবে না। জয়ী, জয়ী, বেশ মেয়েটি, তার মা, তাকে প্রণাম করতে হয়, আর যে-লোকটি রাগারাগি করল, সে কে? জয়ী তাকে বাবা বলল, আমি জয়ীর কাকা, ও জয়ীর বাবা, কাকা হচ্ছে বাবার ভাই, অফকোর্স। এটা তো আমি জানিই, তা হলে ওই লোকটি আমার ভাই, আমার থেকে ছোট না বড়, ওর স্ত্রীকে আমি প্রণাম করলাম, তা হলে ও আমার চেয়ে বড়, হ্যাঁ, আমি জানি, নিশ্চিত জানি, ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে কেউ প্রণাম করে না। গুড লেডি! ওই লোকটি, মানে আমার ভাই কেন অমন রাগ করছিল? আমি ওর কিছু ক্ষতি করেছি?

এই বারান্দায় গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছে কাল সন্ধ্যায় দেখা সেই মেয়েটি। সে ভোরের আকাশ দেখছে আর টাটকা বাতাস মুখে মাখছে। দূরে বড় পুকুরটার ধারে আন্দোলিত হচ্ছে গাছপালা।

সব বাড়িতে মেয়েরাই বুঝি আগে জাগে। মেয়েদের ঘুম কম? তারা এই পৃথিবীকে পুরুষদের তুলনায় বেশিক্ষণ দেখে।

তরুণীটি বেগুনি রঙের সালোয়ার-কামিজ পরে আছে। তার দিকে তাকিয়ে হেমকান্তি ভাবলেন, একে আমি চিনি। কিন্তু এর নাম কি আমি জানি?

সে বলল, গুড মর্নিং।

হেমকান্তি বললেন, মর্নিং।

সে আবার ইংরেজিতেই জিজ্ঞেস করল, হাউ আর ইউ টুডে?

হেমকান্তি যান্ত্রিকভাবে বললেন, ফাইন।

তিনি সেখানে আর দাঁড়ালেন না, ঢুকে গেলেন নিজের ঘরে। তাঁর মনের মধ্যে প্রবলভাবে আন্দোলিত হচ্ছে দুটি প্রশ্ন।

জয়ীর বাবা কেন তাঁকে অপমান করল, তা তাঁর মনে রইল না। কিন্তু জয়ী তাঁকে সাংঘাতিক দুটো কথা বলেছে। তিনি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন বলে তাঁকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আত্মহত্যা মানে স্বেচ্ছামৃত্যু? বাঁচতে না চাওয়া? কেন? কেন এই জীবনটা তাঁর অপছন্দ হয়েছিল? যে-জীবন মাত্র একবারই পাওয়া যায়, কী জন্য মানুষ তার সময় ফুরোবার আগেই সে জীবন শেষ করে দিতে চায়? এটা তাঁকে জানতেই হবে।

জয়ী আরও বলল, তিনি অনেকদিন এখানে ছিলেন না। কোথায় ছিলেন তা

হলে? অন্য কোথাও, অন্য দেশে, সেখানে কি সাধারণ মানুষের মতন তাঁর সংসার ছিল, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা? তাদের ছেড়ে চলে এসেছেন? কিংবা ওসব কিছুই ছিল না, তিনি আটকে ছিলেন জেলখানায়? এর উত্তর খুঁজে না পেলে কি এ জীবনের কোনও ভবিষ্যৎ থাকতে পারে?

জয়ীর দেওয়া খামটা তিনি খুলে দেখলেন। তার মধ্যে দুটো সিগারেট আর একটা ছেঁড়া কাগজে অনেকগুলি ইংরেজি সংখ্যা লেখা। সে লেখাটার তিনি মানে বুঝলেন না। টেবিলের ওপর একটা দেশলাই পড়ে আছে। তিনি একটা সিগারেট ধরালেন। সঙ্গে সঙ্গে কাশতে শুরু করলেন, কাল সন্ধেবেলাতেও এরকম হয়েছিল, অর্থাৎ তাঁর সিগারেট টানার অভ্যেস নেই, অথচ প্রবল ইচ্ছে হয়েছিল কেন?

এত কেন নিয়ে কি মাথা ঠিক রাখা যায়! জয়ী মিথ্যে কথা বলেনি তো? হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, সেই ছোকরা ডাক্তারটির বাণী। মানুষের জীবনে সবচেয়ে ইমপর্টান্ট ব্যাপার কী বলুন তো? স্রেফ বেঁচে থাকা। হ্যাঁ, ঠিক মিলে যাচ্ছে। হেমকান্তি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন বলেই ডাক্তারটি ওই উপদেশ ঝেড়েছে। যারা আত্মহত্যা করতে গিয়েও বেঁচে ওঠে, তারা যেন সকলের কৃপার পাত্র। এ যেন মৃত্যুর কাছেও ছোট হয়ে যাওয়া।

প্রথমে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় তাঁর মাথাটা টলমল করছিল। কফি পান করার পর অনেকটা ঠিক হয়েছে। এখনও যেন একটু ছলাত ছলাত শব্দ শোনা যাচ্ছে। ক্রমশ সেটা সরে যাচ্ছে দূরে।

ভেজানো দরজা ঠেলে মাথা বাড়িয়ে বেগুনি রং পরা তরুণীটি জিজ্ঞেস করল, চা, না কফি?

হেমকান্তি বিনা উত্তরে তার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, তুমি ভেতরে এসো।

ঠিক যেন গুনে গুনে সাত পা মেপে সে এসে দাঁড়াল ঘরের মাঝখানে। লেখার টেবিল সংলগ্ন চেয়ারে বসে আছেন হেমকান্তি। দরজা ও হেমকান্তির সঙ্গে মেয়েটির সম দূরত্ব।

সে বলল, আপনি আমার নাম জানেন না। আমি কে, তাও আপনি জানেন না তো?

হেমকান্তি দু'দিকে মাথা নাড়লেন।

এবার মেয়েটি নামবতী হল।

হাসি মুখে বলল, আমি ঝিল্লি। আমি কিন্তু এ-বাড়ির কেউ না। আই অ্যাম সর্ট অফ আ হাউজকিপার হিয়ার।

হেমকান্তি সঙ্গে সঙ্গে নার্সিংহোমের একজন মেট্রনকে দেখতে পেলেন। গোলগাল চেহারার মধ্যবয়সিনী, মুখখানিতে ভালমানুষি মাখা। হেমকান্তির কপালে হাত রেখেছিলেন কয়েকবার, তাতে বেশ একটা উষ্ণ স্নেহ ছিল।

সহজাত অনুভূতিতে হেমকান্তি বুঝলেন, হাউজকিপারের চেহারা ওইরকমই হয়। পিসি-মাসির মতন। এত কম বয়েসি হাউজকিপার, তাও ইংরিজি বলে?

জয়ী যেমন বলছিল, অন্য গ্রহের প্রাণীরা তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, এই ঝিল্লি কি সেরকম কিছু হেঁয়ালি তৈরি করছে?

কিন্তু তাঁর স্মৃতি চঞ্চল বলে এ নিয়ে তিনি আর কৌতূহল দেখাতে পারলেন না। বারবার বলতে লাগলেন, ঝিল্লি, ঝিল্লি, ঝিল্লি।

তার পরেই তাঁর অন্য একটা নাম মনে পড়ল। বনমালী। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁকে এই নাম কেউ বলেছে। এখন নতুন করে নাম জমাতে হবে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ঝিল্লি, তুমি বলতে পারো, বনমালী কে?

ঝিল্লি একদিকের ভুরু তুলে বলল, বনমালী! এ-নাম কখনও শুনিনি। অন্তত আমি যতদিন থেকে আছি এখানে, প্রায় দেড় বছর।

তা হলে কে বলল, নামটা?

এবারে তিনি ঝিল্লির দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে আলমারির বইগুলোর দিকে তাকিয়ে আপন মনে বললেন, এটা আমার ঘর? বাথরুমে যে টুথব্রাশ, ওটা আমার?

ঝিল্লি বলল, হ্যাঁ, আপনারই তো। কফি আনব? এ-বাড়ির অন্য সবাই সকালে চা খায়।

বাংলা কথা বলতে এখন আর অসুবিধে হচ্ছে না, শব্দগুলো ঠিকঠাক এসে যাচ্ছে জিভে। কিন্তু প্রশ্ন ও উত্তরের পারম্পর্য এখনও আসেনি।

সিগারেটটা এখনও অ্যাশট্রের ওপর জ্বলছে। ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আবার একটা টান দিতেই আবার কাশলেন বেশ কয়েকবার। সিগারেট টানার ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু সহ্য হচ্ছে না, তা হলে ইচ্ছে হচ্ছে কেন?

তিনি বললেন, সিঁড়ি দিয়ে নীচে গেলাম, কিছুই চেনা মনে হল না। অথচ আমি এ-বাড়িতেই থাকি? আমি কি একটা অন্য লোক?

ঝিল্লি বলল, দ্যাটস ভেরি ইনট্রেস্টিং। সবাই বোধহয় মাঝে মাঝে একটু একটু অন্য মানুষ হয়ে যায়। আমিও আগে একটা অন্য মেয়ে ছিলাম।

তুমি বসবে না?

হ্যাঁ, বসতে পারি। কিন্তু আর পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যেই সারাবাড়ি জেগে উঠবে। আপনি তো একবার কফি খেয়েছেন। আমি বরং খানিক বাদে আবার আপনার জন্য কফি নিয়ে আসব।

তুমি যে আগে অন্য মেয়ে ছিলে, সে-কথা তোমার মনে পড়ে?

হ্যাঁ। আপনারও মনে পড়বে। পুকুরের জলে যেমন ঢেউ ওঠে, আবার মিলিয়ে যায়, সব শান্ত হয়ে যায়।

পুকুরের জল?

আপনার এখন দরকার কয়েকটা ঢেউ। আমি এখন আসি।

ঝিল্লি বেরিয়ে যাবার পরই হেমকান্তি অনুভব করলেন, ওই মেয়েটিকে তাঁর জড়িয়ে ধরে আদর করতে ইচ্ছে করছিল। ওর ওপরের ঠোঁটটা পাতলা, তার তলার ঠোঁটটা পুরু ও রসালো। ও যদি আরও কাছে আসত, তিনি নিশ্চিত ওর হাত ধরতেন।

তাড়াতাড়ি তিনি বাইরে এসে ঝিল্লিকে খুঁজলেন। সে এর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এবার আর কিছুই না ভেবে তিনি নামতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে। প্রত্যেকটা সিঁড়ি গুনতে লাগলেন, তাঁর গোনার ক্ষমতা আছে কি না পরীক্ষা করার জন্যে। হ্যাঁ, পারছেন।

দোতলার বসবার জায়গায় এখন জয়ীর বাবা একটা সোফায় বসে লম্বা করে খবরের কাগজ মেলে আছেন চোখের সামনে।

পায়ের শব্দ শুনে তিনি একবার কাগজ সরিয়ে তাকালেও হেমকান্তি সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। হেমকান্তি তখন গুনছেন, টুয়েন্টি ফোর, টুয়েন্টি ফাইভ...।

এক তলায় পৌঁছোলেন, মোট চুয়াল্লিশটি সিঁড়ি। ধকধক করছে বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড। মাথার মধ্যে জলোচ্ছ্বাস। তাঁর শরীরে আর কোনও অসুস্থতার চিহ্ন নেই, কিন্তু সিঁড়ি ভাঙতে অসুবিধে হচ্ছে। এইজন্যই তাঁকে কাল একটা চেয়ারে বসিয়ে ওপরে তোলা হয়েছিল।

একটু আগে নীচে নেমে তিনি ভেবেছিলেন, এই জায়গাটা একেবারে

জনশূন্য। এখন দেখলেন, কাজের লোকদের কয়েকটা ঘর রয়েছে পাশাপাশি। দু'-তিনটি নারী-পুরুষ ঘোরাঘুরি করছে। সব অপরিচিত মুখ। তিনি মাথা ঘামালেন না।

যেটাকে তিনি আগে ভেবেছিলেন ডাইনিং রুম, সেটা একটা খালি ঘর, চেয়ার-টেবিল কিছু নেই, এক দেওয়ালে শুধু একটা পুরনো ক্যালেন্ডার। ঘরের শেষ প্রান্তের দেওয়ালটা খানিকটা কাটা, অর্ধবৃত্তাকার। এ ঘরটা এখন আর ব্যবহার হয় না, বোঝাই যায়।

ফুড়ুত ফুড়ুত করে দুটি চড়ুইপাখি উড়ে বেরিয়ে এল, প্রায় হেমকান্তির মাথার ওপর দিয়েই গেল।

বাঁ দিকে সদর দরজা, হেমকান্তি তাকালেন ডান দিকে। একটা ছোট উঠোন, একদিকের পাঁচিলে উঁকি মারছে একটা পেয়ারা গাছের ডাল, সেখানেই আটকে আছে একটা ছেঁড়া ঘুড়ি।

উঠোনের পরে একটা নীল রঙের কাঠের দরজা, খিল লাগানো। হেমকান্তি এগিয়ে গিয়ে খিলটা খুলে ফেললেন। বেশ জোর লাগল, খিলটা নিয়মিত খোলা হয় না, আঁট।

ওপাশে বড় বড় গাছ, তারপর একটা বড় পুকুর। এটা বাড়ির বাইরের পৃথিবী, হেমকান্তি একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। এখনও ভাল করে রোদ ওঠেনি, গাছগুলির পাতায় লেগে আছে স্নিগ্ধতা। আকাশের রং খানিকটা পাউডার মাখানো নীল।

কয়েকবার বুক ভরে নিশ্বাস নিতেই তাঁর ধকধকানি কমে গেল।

তারপর তিনি বাইরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই ছুটতে ছুটতে ঝিল্লি এসে তাঁর এক হাত চেপে ধরল। বকুনি-স্বরে বলল, ও কী করছেন? কাল থেকে দেখছি আমাকে আরও ভোরে উঠতে হবে।

বুঝতে না পেরে হেমকান্তি জিজ্ঞেস করলেন, কেন! তোমাকে ভোরে জাগতে হবে কেন?

ঝিল্লি বলল, বিকজ, ইট ইজ নাউ মাই ডিউটি, মানে, আপনাকে পাহারা দেওয়াই আমার এখন প্রধান কাজ। আপনার এ-বাড়ির বাইরে যাওয়া মানা। দোতলার ফ্যামিলিতে গিয়ে আপনার কফি খাওয়াও ঠিক নয়। ওরা আপনার কফিতে যদি বিষ মিশিয়ে দেয়?

ঝিল্লি যেন একটা বুলবুলি পাখি, তার তুলনায় হেমকান্তির শরীর একটা

বাজপাখির মতন। বুলবুলির মাথাটা বাজপাখির বুকের কাছে।

হেমকান্তি ঝিল্লির দিকে ফিরে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন। এ মেয়ের মুখখানিতে সামান্যতম দ্বিধাও নেই। চোখ দুটির সঙ্গে অনেক কিছুর উপমা দেওয়া যায়। কিন্তু ওষ্ঠাধরের মধ্যে অধরটিই যেন অনন্যা।

একটু আগেই ঝিল্লি হেমকান্তিকে বলেছে, আপনার দরকার কয়েকটি ঢেউ। হেমকান্তি এই মুহূর্তে সেরকম একটি ঢেউ টের পাচ্ছেন।

তিনি একটু কম্পিত এবং অপরাধী গলায় বললেন, ঝিল্লি, তুমি ঝিল্লি, মনে আছে নাম, তুমি কী বলেছিলে, সব মনে আছে। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব? কী যে হয়েছে, আমার এখন অনেক কিছুই মনে নেই। কোনটা রাইট, কোনটা রং তাও জানি না। আমি যদি তোমার ঠোঁটে এখন একটু আদর করতে চাই, আমার খুব ইচ্ছে করছে, তা হলে সেটা কি অন্যায় হবে?

একটুও বিচলিত হল না ঝিল্লি।

বেশ স্বাভাবিকভাবে হেসে সে আস্তে আস্তে হেমকান্তির হাত দুটি নামিয়ে দিল নিজের কাঁধ থেকে।

তারপর বলল, এটা ন্যায় কিংবা অন্যায় তা আমরা আর ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা বাদে ঠিক করব। আগে আমাদের আর একটু চেনাশুনো হোক, কেমন?

অতি বাধ্য শিশুর মতন মাথা নেড়ে হেমকান্তি বললেন, আচ্ছা।

ঝিল্লি বলল, আর আপনি কথা দিন, এর মধ্যে আপনি আর একা একা বাড়ির বাইরে যাবার চেষ্টা করবেন না।

যাব না। কিন্তু যদি ভুলে যাই?

নীচের সিঁড়িতে পা দেবেন না। ওপরে যেতে পারেন। ছাদে। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। এই পুকুরটায় কত বক আসে, মাছরাঙা আসে। এতখানি জমি, বড় পুকুর, এখানে এখনও মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিং হয়নি কেন জানেন? লিটিগেশন আছে, কোর্টের অর্ডারে এখানে কিছু কনস্ট্রাকশন হবে না। তাতে আমাদেরই লাভ, এ দিকটা অনেক দিন ফাঁকা থাকবে। চলুন, ওপরে যাই। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে কষ্ট হলে আপনি আমার পিঠে হাত রাখতে পারেন।

তারপর ফিসফিস করে বলল, কক্ষনও আর দোতলায় গিয়ে কফিটফি কিছু খাবেন না।

কেন?

কখন কী মিশিয়ে দেবে, তার ঠিক আছে! আপনার খাবারের মধ্যে কিছু

একটা মিশিয়ে দিয়েছিল, তাই তো আপনাকে নার্সিংহোমে যেতে হল। বুঝতেই তো পারছেন, কতটা ক্ষতি হয়ে গেছে আপনার।

হেমকান্তি ব্যাকুলভাবে বললেন, ঝিল্লি, ঝিল্লি, আমাকে ধরে থাকো। আমার মাথা ঘুরছে!

তিন

টিটোর সঙ্গে কথা হল অনেকক্ষণ।

সে এসেছিল একটা টেলিফোন যন্ত্র নিয়ে। টেবিলের নীচে প্লাগ পয়েন্ট, টিটো হাঁটু গেড়ে বসে অভিজ্ঞ মিস্তিরির মতন সব ঠিকঠাক করতে লাগল, কিন্তু ডায়াল টোন আসছে না। প্লাগের ভেতরটা খুলে ফেলে সব তার নাড়াচাড়া করে, মিনিট পনেরো বাদে সার্থকতার হাসি দিল সে।

হেমকান্তি তার পাশে দাঁড়িয়ে কৌতূহলের সঙ্গে সব দেখলেন।

টিটো বলল, ঠিক হয়ে গেছে। ছোটমামা, তোমার তো এখন বাড়ি থেকে বেরুনো চলবে না, তাই এটা লাগিয়ে দিলাম। লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।

হেমকান্তি বললেন, টেলিফোন করতে নম্বর লাগে। আমার তো কোনও লোকের কথা মনে নেই!

টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা সরু, লম্বা খাতা বার করে টিটো বলল, এই তো তোমার ফোনের খাতা।

হেমকান্তি সেটা হাতে নিয়ে খুললেন।

প্রথম নামটি আফতাব আমেদ। রিটায়ার্ড ব্রিগেডিয়ার। কে ইনি?

দ্বিতীয় নামটি অরুণিমা সান্যাল। আবার ব্ল্যাঙ্ক।

পরপর আরও কয়েকটি নামে তিনি চোখ বোলালেন, তাঁর নিজেরই লেখা। কিন্তু তাঁর মনোজগৎ থেকে এরা সবাই হারিয়ে গেছে।

তিনি অপ্রস্তুতভাবে বললেন, এটা বোধহয় আমার কোনও কাজে লাগবে না।

টিটো তার উদ্যমকে ব্যর্থ হতে দিতে চায় না। সে বলল, থাক, হয়তো তোমাকে কেউ কেউ কল করতে পারে।

হেমকান্তি বললেন, তুমি তো টিটো। তুমি একটু বসো।

এই তো আমার নাম মনে আছে। আমি এক্ষুনি আসছি।

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল সে। তার হাতে একটা বড় খাম।

সে বলল, ছোটমামা, এর মধ্যে আছে তোমার ব্যাঙ্কের চেক বই, কিছু ক্যাশ টাকা, চোদ্দো শো পঞ্চাশ, আরও কিছু কাগজপত্র, কয়েকটা চাবি তোমার ড্রয়ারে ছিল, আমি নিজের কাছে রেখেছিলাম।

খামটা হেমকান্তির হাতে দিতে গিয়েও সে একটু থমকে গেল।

ছোটমামা, তোমার ব্যাঙ্কের সইটা মনে আছে তো? কী সই করতে?

হেমকান্তি ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ ভাবলেন। এক আঙুল দিয়ে শূন্যে কিছু লেখার চেষ্টা করলেন কয়েকবার। তারপর বিষয়টাকে গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, আমি তোমার ছোটমামা? তোমার মা কে?

আমার মায়ের নাম ঐন্দ্রিলা। ডাকনাম বুলি। তোমার ঠিক পিঠোপিঠি বোন।

বুলি? কোথায় বিয়ে হয়েছিল?

জামসেদপুর। মায়ের কাছে গল্প শুনেছি, বিয়ের সময় তুমি মাকে ছাড়তে চাইছিলে না। তুমি ওঁর থেকে মাত্র তিন বছরের বড়। তুমি মায়ের সঙ্গে জামসেদপুর গিয়েছিলে, তারপর আর কিছুতেই ফিরে আসতে চাইছিলে না। খুব কান্নাকাটি করেছিলে।

জামসেদপুর?

তুমি মাকে কখনও দিদি বলতে না। এই নিয়ে খুব ঝগড়াঝাটি হত তোমাদের মধ্যে।

বুলি এখন কোথায়? জামসেদপুরে?

না। তার থেকে অনেক দূরে।

কত দূরে? আমি যদি বুলির কাছে যাই, ওকে দেখলে হয়তো সব মনে পড়বে।

না, তত দূরে তুমি যেতে পারবে না। তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। মায়ের সঙ্গে এখন একমাত্র আমার দেখা হয়। প্রায় প্রত্যেক দিন।

এরকম ভাষা হেমকান্তির অজ্ঞাত, তিনি টিটোর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অত্যন্ত সুদর্শন এই ছেলেটি। শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গড়ন

নিখুঁত। ঘোড়া কিংবা খরগোশের মতন প্রজাতির সব প্রাণীর চেহারা যেমন প্রায় একই রকম হয়, মানুষের তা নয়। সরু, পৃথুল, বেঢপ, বামন এরকম নানা প্রকার। স্কুলের স্বাস্থ্যবইতে শুধু আদর্শ মানুষের ছবি থাকে, সেই ছবির সঙ্গে টিটোর খুব মিল।

টিটো বলল, তুমি আমার সম্পর্কে বোধহয় কিছু জানো না। আমি পিয়োর ম্যাথমেটিক্সে এম এসসি করে এবার আই এ এস পরীক্ষা দিচ্ছি। তা ছাড়া আমি খেলাধুলো করি। টেস্টে এখনও চান্স পাইনি, তবে রঞ্জিতে খেলি নিয়মিত।

সেটা কী খেলা?

ও, সেটাও তোমার মনে নেই! ক্রিকেট। তুমিও একসময় এ-খেলাটা ভাল খেলতে।

টিটো, আমি একেবারে যা-তা হয়ে গেছি। সব ভুলে গেলাম? এভাবে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয়?

প্লিজ ছোটমামা, এ ধরনের কথা বোলো না। তুমি নিজের মনের জোরে বেঁচে ফিরে এসেছ।

আমার মন বলে কিছু নেই। মাথার মধ্যে শুধু হাওয়া। তোমাকে বলছি টিটো, আমার নিজের ওপর অসম্ভব রাগ হচ্ছে। লেম অ্যান্ড ব্লাইন্ড পিপল্ আর ... লেম এর বাংলা কী?

লেম খোঁড়া। ব্লাইন্ড অন্ধ।

জানি, মনে পড়ছিল না। বলছি যে, খোঁড়া কিংবা অন্ধ মানুষেরাও আমার চেয়ে স্বাধীন। ওরা চিন্তা করতে পারে। আমি যেন একটা গাছের মতন।

গাছরাও চিন্তা করে, ছোটমামা।

রিয়েলি?

ওদের চোখ নেই, তবু দেখে। পেট নেই, তবু খায়। মাথা নেই, তবু চিন্তা করে। এসব এখন প্রমাণ হয়ে গেছে।

তা হলে আমি একটা, আমি একটা ... এত রাগ হয় এক-এক সময়, ইচ্ছে হয় নিজের মাথাটা দেওয়ালে ঠুকে ঠুকে ভেঙে ফেলি। আচ্ছা, আমার ওই ইয়েটা, ওই যে, কাগজটা আঃ কী যেন বলে, সেটা কোথায় গেল?

কাগজটা মানে?

প্রেসক্রিপশনের মতন সামান্য কথাটা এখন হেমকান্তির মনে পড়ছে না।

দু'দিকে মাথা নাড়তে নাড়তে তিনি বললেন, নার্সিংহোম থেকে, ওই যে কাগজটায় লিখে দেয় ওষুধের নাম, আর, আর...

সেটা তো রত্নেশ মামার কাছে আছে।

রত্নেশ মানে, কোন জন?

যে তোমাকে কাল নার্সিংহোম থেকে নিয়ে এল। প্রেসক্রিপশনটা তার কাছে আছে। সে তো নতুন সব ওষুধ কিনে দিয়ে গেছে। ঝিল্লি তোমাকে ওষুধ খাইয়ে দেয়নি?

দিয়েছে। কিন্তু ওই কাগজটা আমার চাই। ওকে ডাকো।

রত্নেশ মামা তো এখানে থাকে না। সল্ট লেকে নতুন বাড়ি করেছে।

হেমকান্তি এবার একটা দৈত্যের মতন গর্জন করে বললেন, ওই কাগজটা আমি দেখতে চাই। এক্ষুনি!

টিটো খুব শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বলল, সন্ধের আগে কিছুতেই সম্ভব নয়। আমি ওকে ফোন করে বলে দেব।

এরকম স্মৃতিহারা হবার আগে হেমকান্তির স্বভাব কেমন ছিল? তিনি কি এমন অশিষ্টের মতন চিৎকার করতেন? চোখ গরম হয়ে যেত? সাধারণত মধ্যবিত্ত বাঙালিরা মিড ভিক্টোরিয়ান নীতিবোধে ভোগে। তারা কখনওই জীবনে নাটকীয়তা পছন্দ করে না। সেইজন্যই ব্যতিক্রমী কিছু করে ফেললে, জিন ফ্যাক্টরের প্রভাবেই হয়তো, তাড়াতাড়ি লজ্জা পায়, হেমকান্তির মুখের চামড়ায় ফুটে উঠল অনুতাপ বোধ।

এবং তিনি বললেন, আই অ্যাম সরি, টিটো।

তখনই ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন।

টিটো ধরেই নিল, তাকেই কেউ ডাকছে। সে রিসিভারটা তুলেই বলল, হ্যাঁ, মহাকাশ বলছি।

তারপর ওপাশের কথা শুনতে শুনতে তার ভুরুতে ঢেউ খেলতে লাগল। একসময় সে বলল, একটু ধরুন, দেখছি, আপনার নামটা কী বললেন?

কথা বলার দিকটা হাতের তালুতে চেপে ধরে সে বলল, ছোটমামা, তোমাকে চাইছেন। নাম বললেন, তাহেরে সফরজাদে। মনে হয়, বাঙালি নয়, কিন্তু বাংলা বলছেন।

হেমকান্তি দু'দিকে মাথা নাড়লেন।

তুমি একটু কথা বলবে?

তিনি আরও জোরে জোরে মাথা নাড়লেন।

টিটো বলল, তুমি চিনতে পারছ না। তবু একটু কথা বলে দেখো না! ক্ষতি কী?

রিসিভারটি সে প্রায় জোর করেই তুলে দিল হেমকান্তির হাতে।

হেমকান্তি বললেন, ইয়েস?

ওপাশ থেকে কিছু শোনার পর তিনি আবার বললেন, নো।

একটু বাদে তিনি বললেন, ইয়েস, আমার নাম এইচ কে লাহিড়ী।

পরের কথার উত্তরে তিনি বললেন, নাম এক, কিন্তু আমি সেই মানুষ নই। আমি কি কখনও তোপচাঁচি গেছি? তোপচাঁচি জিনিসটা কী আমি জানি না। আমি আপনাকে চিনতে পারছি না। আর কথা বলে লাভ কী!

তিনি রিসিভারটি টিটোর হাতে দেবার পর সে সেটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে বলল, তাহেরে সফরজাদে, এরকম নাম আমি আগে কখনও শুনিনি। আশ্চর্য ব্যাপার, মাত্র একটু আগে এখানে টেলিফোন কানেকশন হল, অমনি একজন তোমাকে ফোন করল, নম্বর জানল কী করে? সেলসের ছেলেমেয়েরা অবশ্য কী করে যেন নাম আর নম্বর জেনে যায়। এমনকী আমার মোবাইলেও...

হেমকান্তি খানিকটা বিরক্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, তোপচাঁচি কী?

একটা লেক। খুব সুন্দর। তবে এখন পিকনিক স্পট হয়ে গিয়ে বড্ড ভিড় হয়। শিমুলতলা কিংবা ধানবাদ থেকে যাওয়া যায়। চারদিকে পাহাড়ঘেরা। মহিলা আপনাকে সেই জায়গার কথা বললেন? জামসেদপুব থেকে ওখানে আমরা মাঝে মাঝে গেছি। ওখানকার বাংলোতেই...। ছোটমামা, কী আশ্চর্য না, এক মহিলা, তাঁকে আমরা চিনি না, এখানকার নম্বর কী করে জানলেন বুঝতে পারছি না। হঠাৎ তোপচাঁচির নাম বললেন। তার মানে সেলসের ব্যাপারে নয়। এইসব রহস্য আছে বলেই জীবনটা এত ইন্টেরেস্টিং! সব কিছুই জেনে যাওয়ার কিংবা বুঝে যাবার কোনও মানে হয় না।

তোমার অন্য নাম মহাকাশ?

আমার ভাল নাম আকাশ ভাদুড়ী। এই নাম রেখেছিলেন তোমার মা অর্থাৎ আমার দিদিমা। ক্রিকেট খেলতে শুরু করার পর আকাশ চোপড়া নামে একজন খেলোয়াড় এল। এইসব খেলায় এক নামে দু'জন খেলোয়াড় থাকতে নেই। তাই আমি নিজের নাম করে নিয়েছি মহাকাশ। তুমি দেখে নিয়ো ছোটমামা, আমি একদিন টেস্ট টিমে খেলবই!

সেখানে না খেললে কী হয়?

প্রথমে টিটোর মুখে ফুটে উঠল রাগ, তারপর বিদ্রূপের ভাব, তারপর অবজ্ঞা। খেলা সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য শুনলে যে-কোনও খেলোয়াড়েরই এরকম প্রতিক্রিয়া হবে। তবু সে সবই মুছে ফেলে সে গুরুজনের সামনে বাধ্য অনুজের মতন বলল, আমি তা হলে এখন আসি? ভাল হয়ে ওঠো, তারপর আমি তোমাকে একদিন আমার খেলা দেখাতে নিয়ে যাব।

টিটো চলে যাবার পর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন হেমকান্তি।

জয়ীর দেওয়া একটা সিগারেট এখনও রয়ে গেছে, সেটাকে ধরিয়ে টানলেন। মাত্র দু'বার কাশবার পর অনেকটা সহনীয় মনে হল। কে যেন বলেছে, তিনি সিগারেটের নেশা ছেড়ে দিয়েছেন অনেকদিন। এখন আবার সিগারেটের ইচ্ছে হল, তা হলে সেই সিগারেট টানবার দিনগুলির কথা মনে পড়বে না কেন?

টিটো যে বড় খামটা দিয়েছে, সেটা খুলে একবার দেখলেন। চেক বই, টাকাপয়সা ইত্যাদি তাঁর, তবু এ-ঘর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল কী কারণে?

খামটার মধ্যে কয়েকটা কলমও রয়েছে। একটা কলম খুলে তিনি খামটার ওপরে আঁকিবুকি কাটতে লাগলেন। তারপর লিখলেন একটা ট। পাশে আর একটা ট। ট ট? না, একটুক্ষণ কপাল কুঁচকে থাকার পর প্রথম ট-এ হ্রস্ব-ই এবং পরেরটায় ও-কার দিলেন। টিটো।

প্রথম ট লেখার সময় তাঁর বুক দুরুদুরু করছিল। মনে মনে বলছিলেন, পারবে তো? পারবে তো? লেখা ভুলে গেলে তা খুবই দুঃখের হত। কাল বই খুলে পড়তে পেরেছিলেন, বাংলা আর ইংরেজি, কিন্তু লেখার সময় অসুবিধে হচ্ছিল প্রথমে। ই-কার, ও-কার মনে পড়ছিল না।

নামগুলো লিখে রাখলে সুবিধা হবে। আর কার নাম মনে আছে? ঝিল্লি! এ মেয়েটি যে ঠিক কে, তা তিনি এখনও বুঝতে পারেননি। ওকে দেখলেই একটা তরঙ্গের অনুভব হয়।

দোতলার বড় চেহারার মেয়েটির নাম জয়ী। সে একটা কাগজে দশটা ইংরেজি সংখ্যা লিখে দিয়েছে কেন?

টিটোর ভাল নামটাও লিখে রাখা দরকার। নিজেই নাম নিয়েছে মহাকাশ। মহাকাশ লিখতে গিয়ে হেমকান্তি লিখলেন, মহাকাস।

সেদিকে তাকিয়ে থেকে তিনি বুঝতে পারলেন, কিছু একটা গন্ডগোল হয়েছে। রেখার এই ছবিটা ঠিক নয়। কী ভুল? তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, রি-কল! রি-কল!

'স' কেটে দিয়ে ল করলেন। মহাকাল। এটা তাঁর দেখতে ভালই লাগল। তিনি ধরে নিলেন, এটাই টিটোর অন্য নাম।

ব্রেকফাস্ট, ব্রেকফাস্ট বলতে বলতে ঢুকল ঝিল্লি।

তার হাতে খাবারের ট্রে, তার ওপরে একটা টাটকা খবরের কাগজ।

ঝিল্লি বলল, একটা কমলালেবু, দুটো টোস্ট আর ওমলেট, এটাই এ-বাড়ির স্ট্যান্ডার্ড ব্রেকফাস্ট। রবিবার সকালে লুচি আর আলুরদম।

হেমকান্তি জিজ্ঞেস করলেন, আজ কী বার?

মনডে। দা ফোরটিনথ অফ ফেব্রুয়ারি। আজকের দিনটির বিশেষত্ব কী, তা আপনার মনে আছে?

না।

আজ সেন্ট ভ্যালেনটাইন ডে। এই দিনে ইয়াং ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে প্রেমের বার্তা পাঠায়। অনেক কার্ড বিক্রি হয়। অনেক পাজি ছেলে আছে, তারা তিন-চারটে মেয়েকে একই কার্ড পাঠিয়ে দেয়।

হঠাৎ যেন অকারণেই হেমকান্তির হাসি পেয়ে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি কী, ইয়াং না ওল্ড বলো তো?

ঝিল্লি বলল, আপনি মাঝামাঝি। লেট মি গেস, আপনার বয়েস হবে ফিফটি টু প্লাস, পঞ্চান্নর থেকে বেশি নয়। আপনি প্রৌঢ়ত্বের দিকে পা দিয়েছেন, অবশ্য এ বয়েসেও অনেকে মনে মনে ইয়াং থাকতে পারে। ইভ্‌ন ফিজিক্যালি।

তারপর সেও হেসে ফেলে বলল, আসলে তো আপনি শিশু। কিছুই চেনেন না, জানেন না। সব একটু একটু করে শিখতে হচ্ছে।

হেমকান্তি বললেন, আর তুমি, তুমি এই সবেমাত্র ইয়ুথ, মানে যৌবনের সীমানায় প্রবেশ করছ। তোমাকেও নিশ্চয়ই অনেক ছেলে কার্ড পাঠিয়েছে?

মাথা ঝাঁকিয়ে ঝিল্লি বলে উঠল, না, না, না, আমার কোনও বয়েস নেই। অযোনিসম্ভূতা কাকে বলে জানেন? আমি কোনও মায়ের পেটে জন্মাইনি, আমার কোনও জন্মদাতা নেই। আমি একটা যজ্ঞের আগুন থেকে উঠে এসেছি, তাই আমার অন্য নাম যাজ্ঞসেনী।

হেমকান্তির ভুরু কুঁচকে গেল। তাঁর মনে হল, এই মেয়েটি তাঁকে একটা বাচ্চা ছেলের মতন কিছু একটা ভুল বোঝাচ্ছে। কিন্তু সেটা বিশ্লেষণ করার মতন তাঁর মস্তিষ্ক সবল নয়। মাঝে মাঝেই ঢেউ উঠছে।

তিনি আপন মনে বললেন, অযোনিসম্ভূতা? না, এ-কথাটার মানে আমি জানি না। হয়তো জানতাম আগে।

ঝিল্লি বলল, নিন, খেয়ে নিন, খাবারটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। এরপর আবার ওষুধ খেতে হবে। ডিমের ওমলেটের বদলে যদি আপনি হাফ বয়েলড কিংবা পোচ চান, তাও করা যেতে পারে। মেজবাবু কোলেস্টেরলের ভয়ে মাঝে অনেকদিন ডিম খেতেন না, এখন আবার খাওয়া শুরু করেছেন। আপনার নিশ্চয়ই ওসব সমস্যা নেই। যাদের স্মৃতি থাকে না, তাদের কোলেস্টেরলও থাকে না। তাদের হার্টেও কোনও অসুখ থাকে না।

হেমকান্তি চামচে দিয়ে খানিকটা ওমলেট তুলে মুখে দিয়ে বললেন, বাঃ!

ঝিল্লি বলল, কাগজ পড়বেন? এই দেখুন, কী দারুণ ছবি দিয়েছে।

হেমকান্তি প্রথমে দেখলেন সংবাদপত্রটার প্রথম পৃষ্ঠার লম্বা হেডলাইন, 'চাপে পড়ে আডবাণীর কাছে দূত পাঠালেন নেপালরাজ।' দু'জন পুরুষের ছবি, দু'জনই তাঁর অপরিচিত এবং খবরের শিরোনামটাও তাঁর বোধগম্য হল না।

তারপর কাগজের মাঝখানটায় একটা বড় ছবি, একটা বেশ মিষ্টি চেহারার তরুণী, তার মাথায় আবার টুপি। একটা হাত বাড়িয়ে আছে। ভারী লীলায়িত আঙুল, তার পাশে একটি গোলাপি রঙের বড় তুলোট জিনিস (হরতনের মতন আকার), তার ওপরে লেখা, 'Everyday I love you more.'

একেবারে পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে ঝিল্লি, তার শরীরে একটা অচেনা সুগন্ধ। তার উরুতের স্পর্শ হেমকান্তির বাহুতে।

সে বলল, দেখেছেন, পাকিস্তানেও ভ্যালেন্টাইনস ডে'র কার্ড বিক্রি হচ্ছে। এটা লাহোরের একটা দোকান। ওখানকার মৌলবাদীরা তো খেপে আগুন।

ছবিটা একটুক্ষণ নিরীক্ষণ করে হেমকান্তি আবার শিরোনামটিতে চোখ রেখে বললেন নেপালরাজ... আর আডবাণী কোথাকার রাজা?

ঝিল্লি বলল, আপাতত ওই ভদ্রলোকের কোনও রাজ্য নেই। তবে উনি শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর। আবার রামরাজত্ব চালু করতে চাইছেন।

খবরের কাগজ পড়ায় কোনও উৎসাহ পেলেন না হেমকান্তি। সেটা সরিয়ে রেখে তিনি বললেন, আমার রাত্তিরে ঘুম হয়নি।

ঠিক আছে জিজ্ঞেস করে দেখব, আপনাকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া যাবে কি না।

কাকে জিজ্ঞেস করবে?

একজন খুব থুরথুরে বুড়ো লোক আছে। তার নাম ধন্বন্তরি। সে ওষুধের সবজান্তা। তাকেই জিজ্ঞেস করতে হবে।

সত্যি করে বলো তো, তুমি কে?

আমি ঝিল্লি। আমার অন্য একটা নাম যাজ্ঞসেনী। এর মধ্যে তো মিথ্যে কিছু নেই।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠে সে বলল, আপনি খেয়ে নিন, আমি যাচ্ছি।

প্রাতরাশ শেষ করে কফিতে চুমুক দিলেন হেমকান্তি। মনে মনে ভাবলেন, তিনি অসুস্থ। এই ঘরখানা তাঁর নিজস্ব। তাঁকে নিয়মিত তিনবেলা খাবার এনে দেওয়া হচ্ছে এই ঘরে। অন্য ঘরগুলোতে আর কারা থাকে, তিনি এখনও ঠিক জানেন না।

বাড়ির বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে তাঁকে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করার সময় একটু একটু মাথা ঘোরে। তা ছাড়া শরীরে অন্য অসুস্থতা কিছু টের পান না। ইচ্ছে করলেই তিনি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারেন। সেটাই তিনি চান, কিন্তু কোথাও গেলে যদি এই বাড়ির কথা আর মনে না পড়ে? তখন কোথায় যাবেন?

আত্মরক্ষার চিন্তা মানুষের অবচেতনে সবসময়ই থেকে যায়। স্মৃতি নষ্ট হয়ে গেলেও তা যায় না। কোনও পাগল কি ইচ্ছে করে আগুনে হাত দেয়? বাড়ির বাইরে যাবার ইচ্ছেটা তেমন প্রবল হচ্ছে না হেমকান্তির, অন্য একটা চিন্তা তাঁকে সতর্ক করে দিচ্ছে।

বারান্দায় অন্য মানুষদের আনাগোনা টের পাচ্ছেন তিনি।

ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলেন, একজন মাঝবয়েসি স্ত্রীলোক জামাকাপড় শুকোতে দিচ্ছে রেলিংয়ে। হেমকান্তিকে দেখতে পেয়ে তার মুখখানা কিছুটা পাংশু হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ঘোমটা তুলে দিলে মাথায়।

কে এই রমণী?

একটা ঘরের দরজা বন্ধ, পাশের একটি ঘরের দরজা খোলা। সেখানে উঁচু কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। দু'জনের সংলাপ নয়, একজনেরই কথা, তাতে একটু সুর আছে।

সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হেমকান্তি দেখলেন, ঘরের এক কোণে কয়েকটি ধাতুর মূর্তি আর দেওয়ালে কয়েকটি ছবি। সেখানে একটি তুলোট আসনে বসে মন্ত্র পড়ছেন এক প্রৌঢ়, মাথার চুল সাদা, এঁকে চিনতে পারলেন হেমকান্তি, তাঁর মেজদা। নার্সিংহোম থেকে ফেরার পরই ইনি অপ্রসন্ন গলায় কথা বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে। দোতলায় তাঁর আর এক দাদা বেশ রাগের সঙ্গে কী যেন বলছিলেন। কী অপরাধ তিনি করেছেন এঁদের কাছে?

সে ঘরের পাশ দিয়েই ছাদে যাবার সিঁড়ি। বারান্দায় এখন আর কেউ নেই। একটুক্ষণ মন্ত্র শোনার পর তিনি ছাদের সিঁড়িতে পা দিলেন।

একটু উঠেই তিনি কোনও কৌতূহলে আবার নেমে এসে দাঁড়ালেন মেজদার দরজার কাছে। মেজদার সামনের দেওয়ালে যে-কয়েকটি বাঁধানো ছবি টাঙানো আছে, তার একটি ছবি তিনি ভালভাবে দেখলেন, তাঁর চোখ আটকে রইল সেই ছবিতে।

তার পরেই তাঁর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল। দেওয়ালের ছবিগুলো দুলতে দুলতে মিলিয়ে গেল দূরে। হেমকান্তি শুনতে পেলেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন জলোচ্ছ্বাস।

দু'হাত দিয়ে চোখ কচলাতেই আবার সামনেটা পরিষ্কার হয়ে গেল। যে-ছবিটায় হেমকান্তির চোখ আটকে গিয়েছিল, সেটা আবার দেখলেন। ছবিটি শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রী সারদামণির। কিন্তু হেমকান্তি দেখলেন অন্য একজন নারীকে।

একটুক্ষণ পরে তিনি অস্ফুটভাবে বললেন, মা।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি চলচ্চিত্রের মতন স্পষ্ট দেখতে পেলেন এক যুবতীকে। কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি পরা। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, হাতে একটা বই, বসে আছেন একটা বাগানের বেঞ্চে। অপরাজিতা। ইনিই হেমকান্তির জননী। তখন বয়েস প্রায় সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ। কিন্তু তাঁর চেহারায় একটুও মা-মা ভাব নেই, বয়েসের কোনও ছাপই পড়েনি, একটাও চুল সাদা হয়নি। অনেকেই মা আর ছেলেকে একসঙ্গে দেখলে জিজ্ঞেস করত, ভাই-বোন বুঝি।

মায়ের কথা যখনই মনে পড়ে, হেমকান্তি দেখতে পান, তাঁর হাতে কোনও-না-কোনও বই। যাকে বলে বইয়ের পোকা ছিলেন। এমনকী মাঝে মাঝে যখন তিনি শখ করে কিছু রান্না করতেন, তখনও রান্নাঘরে বসতেন বই নিয়ে, মাঝে মাঝেই কোনও রান্নায় পোড়া লেগে যেত। বইয়ের দিকে চোখ,

মায়ের হুঁশ নেই। অপরাজিতার ডাকনাম রানি। বাবা মজা করে বলতেন ছি ছি ছি রানি রাঁধতে শেখেনি, সুক্তোনিতে ঝাল দিয়েছে, অম্বলেতে ঘি! তারপর বাবা আরও একটু যোগ করতেন, বেগুন ভাজা কয়লা হল, এখন খাব কী? কড়াই থেকে মাছ পালাল, হায় রে উপায় কী?

বাবা বইটই পড়ার ধার ধারতেন না। তাঁর নেশা ছিল খবরের কাগজের। মা কোনও নতুন বই পড়লে হেমকান্তির সঙ্গেই আলোচনা করতেন। অনেক বই নিজে কিনতেন, পাড়ার লাইব্রেরি থেকেও আনাতেন নিয়মিত। দেওয়ালের এই ছবির মা বই থেকে মুখ তুলে বললেন, হেম, শোন, শোন, তুই রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' উপন্যাসটা পড়েছিস?

একটি একুশ-বাইশ বছরের সদ্য তরুণ মাথা নেড়ে বলল, না মা, এখনও পড়া হয়নি!

অপরাজিতা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার পড়া হলে তুই পড়ে দেখিস! জানিস তো, আমি এটা পড়ছি! আর এর নায়ক অন্তুকে মনে হচ্ছে যেন ঠিক তোর মতন!

তারপর আবার বললেন, হ্যাঁরে, রবীন্দ্রনাথ কি কখনও চায়ের দোকানে আড্ডা দিয়েছেন? কী করে লিখলেন?

কোনওরকম অস্পষ্টতা নেই, বিস্মৃতির একটুও অবলেপন হয়নি মায়ের ছবিতে।

এ যেন একটা আবিষ্কার। তাঁর পুরো অতীত হারিয়ে যায়নি। এমনকী ওই দিনটিতে মায়ের কথাগুলো পর্যন্ত মনে আছে। শাড়ির রং, চশমার রং, বইটার নাম 'চার অধ্যায়', মায়ের কাছ থেকে নিয়েই বইটা পড়েছিলেন হেমকান্তি। রবীন্দ্ররচনাবলী নয়, আলাদা পাতলা বই। তবে, বাগানের বেঞ্চটা চিনতে পারলেন না। এ-বাড়িতে এরকম বাগান থাকা সম্ভব নয়। কোথায়?

আর একটা ব্যাপারও হল! আগেকার দিনে বড় বড় গ্রামোফোন বা রেকর্ড প্লেয়ারে পিন আটকে গেলে একটা কথাই শোনা যেত বারবার, যেমন, 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই প্রহর হলো শেষ', এই গানটার না পাই এর জায়গায় আটকে গেল পিন। তারপর বারবার শোনা যেতে লাগল, না পাই, না পাই, না পাই... সেইরকমই স্মৃতির এই চলচ্চিত্রের টুকরোটিতে কিছু একটা আটকে গিয়ে সেটুকুই দেখা যেতে লাগল বারবার। অর্থাৎ বাগানের বেঞ্চে বসে মা বই পড়ছেন, একবার মুখ তুলে তাকালেন, ছেলের সঙ্গে কথা বলছেন, তারপরই

একটু অন্ধকার। আবার মা বেঞ্চে বসে আছেন, বই পড়ছেন, চোখ তুলে তাকালেন, ছেলের সঙ্গে কথা বলছেন, আবার...। অনেক সময় স্বপ্নে এরকম হয়।

শ্লোক উচ্চারণরত মেজদা দরজার কাছে হেমকান্তির উপস্থিতি টের পেলেন কিংবা পেলেন না বোঝা গেল না। তিনি ফিরেও তাকালেন না। সেটা শ্লোকের প্রতি তাঁর গভীর মনোযোগ কিংবা ছোটভাইয়ের প্রতি অবজ্ঞার কারণেও হতে পারে।

হেমকান্তি আবার ফিরে গেলেন ছাদের সিঁড়িতে।

ছাদটা বেশ বড়ই, তবে দুটি ভাগে উঁচু-নিচু। অর্থাৎ বারান্দার ছাদটা একটু নীচে, তিনটে সিঁড়ির ধাপে সেখানে নামা যায়। সেই দিকটাতেই বাইরের জংলা জায়গা ও পুকুর।

সব মধ্যবিত্ত বাড়িতেই নানা রকম ফুলগাছের টব রাখা হয়। এখানে সেরকম টবের সংখ্যা বেশি, প্রত্যেকটি টবই নানা রকম রং দেওয়া, গাছগুলোর নিয়মিত যত্নও হয় মনে হচ্ছে।

এই ছাদের পরিবেশ হেমকান্তির স্মৃতি থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। তিনি নতুন দেখার মতন দেখছেন। তিন দিকেই নানা আকারের বাড়ি। এক দিকটা শুধু ফাঁকা। পুকুরধারে দু'জন মানুষ ছিপ ফেলে বসে আছে। অন্য দিকগুলো না দেখে শুধু এই গাছপালা ও পুকুরের দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হতে পারে, এটা কলকাতা শহর নয়, কোনও একটা গ্রাম্য প্রকৃতি। দুটি মহীরুহ সদৃশ গাছে লম্বা লম্বা ফুল ফুটে আছে। সেগুলি মুচকুন্দ, অবশ্য হেমকান্তি এখন সে ফুল চেনেন না।

আকাশের দিকে তাকালেন হেমকান্তি। আজ রোদের তেমন তেজ নেই। এখন মেঘেদের নিরুদ্দেশে থাকার সময়, অনেকটা আকাশই গাঢ় নীল। মেঘলা আকাশকে ঠিক আকাশ বলে মনে হয় না। নীল রঙে দূরত্ব অনেক বেড়ে যায়। পাওয়া যায় অসীমের আভাস। ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে থাকলে যেন টের পাওয়া যায় পৃথিবীর ঘূর্ণন।

হেমকান্তির মনে হল, এই পৃথিবীতে তিনি সম্পূর্ণ একা, কোনও পরিচয় নেই, নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর এক প্রাণী, মাটিতে পা রেখে আকাশের তলায় ঘুরছেন। কোনও লক্ষ্য নেই, কোনও উদ্দেশ্য নেই।

পৃথিবীর ঘূর্ণন, না হেমকান্তির মাথার মধ্যেই খুব বেগে একটা আন্দোলন

হচ্ছে। তিনি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না, হেলে পড়ে যেতে যেতে ধরে ফেললেন ছাদের পাঁচিল, তাও ধরে রাখতে পারলেন না, কঠিন মেঝেতে তাঁর মাথা ঠুকে গেল। সেখানেই পড়ে রইলেন অসহায়ভাবে।

চার

বিবেকানন্দ পার্কে প্রায় ঘণ্টা তিনেক খেলা প্র্যাকটিশ করল টিটো।

আলো পড়ে গেলে সে সহ-খেলোয়াড়দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তার মোটরসাইকেলে চলে এল খুব কাছেই লেক রোডের একটা বাড়িতে। চারতলা গৃহটির চতুর্থ তলে সিঁড়ির শেষে লোহার গেট। ভেতরে হাত বাড়িয়ে কলিং বেল টিপতে হয়। টিটো বেল টিপল, কোনও আওয়াজ হল না।

দরজা খুলে দিলেন এক প্রৌঢ়া মহিলা। মলিন শাড়ি পরা। টিটোকে দেখেই বললেন. লোডশেডিং, এখন গরম জল পাবে না।

কাঁধের ঝোলাব্যাগ থেকে ঘামে ভেজা প্যান্ট, গেঞ্জি, জাঙিয়া ইত্যাদি বার করে দিয়ে টিটো বলল, এগুলো কেচে দিয়ো। গিজার চলবে না, গ্যাসে এক কেটলি জল গরম করে দাও, তাতেই আমি চান করে নিতে পারব। মাসি, বাড়িতে কেউ নেই?

ডাক শুনেই বোঝা যায়, এ-মাসি প্রকৃত মাসি নয়। তিনি ঝংকার দিয়ে বললেন, আহা, কেউ নেই মানে! আমি বুঝি কেউ না?

টিটো বলল, তুমি তো সর্বক্ষণই বাড়িতে থাকো। তাই তোমাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হয় না। কতদিন বাড়ির বাইরে পা দাওনি বলো তো?

মাসি বললেন, কে জানে বাপু! বাইরে গিয়েই বা কী করব? রাস্তায় তো সবসময় পাজি আর হারামজাদারা গিসগিস করছে।

আমার মতন লোকও তো রাস্তায় থাকে!

তুমিও কি কম পাজি নাকি? ওই ভটভটিটা চালিয়ে বেড়াও মানুষ মারার জন্য।

ভটভটি তো তোমাদের গ্রামের মোটর লাগানো নৌকোকে বলে। আমার মোটরসাইকেলটাকে ফটফটি বলতে পারো।

ওই একই হল। তোমার জন্য আমি কেটলিতে জল বসিয়ে রেখেছি।

জুতো খুলে ভেতরে এসে বসল টিটো। পাখা চালাতে গিয়ে মনে পড়ল, বিদ্যুৎ নেই।

পুরো সন্ধে হয়নি, বারান্দায় এখনও কিছুটা আলো আছে, ঘরের মধ্যে প্রায়ান্ধকার।

টিটো জিজ্ঞেস করল, আজ কি ঘুগনি আছে, না স্যান্ডউইচ?

মাসি বললেন, কোনওটাই না। আজ বোয়াল মাছের পুডিং বানানো হয়েছে। তবে গরম টরম করতে পারব না, ঠান্ডা খেতে হবে।

পুডিং আবার কে কবে গরম খেয়েছে!

কেন, তোমাদের রুচিরা। তার তো সব কিছু গরম করে না দিলে মুখে রোচে না।

ওর কথা বাদ দাও। ও তো পারলে আইসক্রিমও ভেজে খায়। বাপ রে বাপ, অমন জিভে-গরম খাবার আর ঝাল খেতে আমি আর কোনও মেয়েকে কখনও দেখিনি। দাও। গরম জলের কেটলিটা বাথরুমে দিয়ে দাও!

টিটো, তুমি ওই ভটভটিটা চালানো ছাড়ো। কোনদিন মানুষ মারবে, কিংবা নিজেই মরবে!

বছর খানেক আগে কোনও এক বেয়াকুফ মোটরসাইকেল চালক এই মাসিকে এক ধাক্কা মেরেছিল ঢাকুরিয়া ব্রিজের কাছে। খুব বেশি ক্ষতি হয়নি অবশ্য, ছিটকে পড়ে গিয়ে মাসির একটা গোড়ালি শুধু মচকে গিয়েছিল। সেই থেকে পৃথিবীর সমস্ত মোটরবাইক চালকের প্রতি মাসির যেমন রাগ তেমনই ওই যানটির প্রতি ঘৃণা।

টিটো বলল, আমি যখন মস্ত বড় চাকরি করব, তখন একটা ঢাউস চার চাকার গাড়ি কিনব। তোমাকে সেই গাড়িতে হাওয়া খেতে নিয়ে যাব!

উঠে দাঁড়িয়ে সে আবার বলল, তুমি বুঝবে না, মাসি! যখন মোটরসাইকেলে চাপি, নিজেকে দারুণ হিরো হিরো মনে হয়।

বাথরুমে ঢুকে কেটলির গরম জল এক বালতি ঠান্ডা জলে মিশিয়ে স্নান করে নিল টিটো।

ভেতরের গা-আলমারিতে রয়েছে তার নিজস্ব তোয়ালে, তার পাজামা, গেঞ্জি, হাফ-পাঞ্জাবি। সারা শরীরে চন্দন সাবানের সুগন্ধ।

ফ্ল্যাটটা প্রায় নিস্তেজ বলে টিটো ধরেই নিয়েছিল, অন্য বাসিন্দারা কেউ

ফেরেনি। বারান্দায় এসে একবার দাঁড়াতেই সে পাশের ঘরটিতে উঁচু ধরনের একটি নারীসুলভ কাতরোক্তি শুনতে পেল।

দরজাটা বন্ধ নয়, ভেজানো। এখন আকাশের আলো প্রায় অন্তর্হিত, ভেতরে এসে টিটো দেখতে পেল, বিছানায় রমণীর আকারের একটি অন্ধকার স্তূপ। নিশ্চিত ঘুমন্ত।

রুচিরা, না শ্রাবণী?

প্রথমেই চিনতে পারলে টিটোর ব্যবহার হত দু'রকম।

লোডশেডিং মাঝখানে একেবারে কলকাতা থেকে কমে গেলেও ইদানীং আবার শুরু হয়েছে। অবশ্য বেশিক্ষণ থাকে না।

টিটো এ-বাড়িতে না থাকলেও সে জানে, এই ফ্ল্যাটের কোথায় মোম-দেশলাই রাখা থাকে। বসবার ঘরের টিভির নীচের তাকে।

মোম জ্বেলে এই ঘরে ফিরে এসে টিটো কয়েক মুহূর্ত মুগ্ধভাবে তাকিয়ে রইল।

রুচিরা নয়, শ্রাবণী। একটা পাতলা ম্যাক্সি পরে শুয়ে আছে। ঠিক যেন এক ঘুমন্ত রাজকন্যা।

মোমের মৃদু আলো তার শরীরকে সুদূর কালের রূপ দিয়েছে।

পৃথিবী থেকে রাজা-রানি-রাজপুত্র-কন্যারা কবেই শেষ হয়ে গেছে। এনডেনজারড স্পিসিজের মতন যে-কয়েকটি রয়েছে, তাদেরও আর জাত-ধর্ম বলতে কিছু নেই। একেবারে এলেবেলে। তারা বিবাহ-বিচ্ছেদ করে, বিবাহ-বিচ্ছিন্নার সঙ্গে দৃষ্টিকটু সম্পর্ক হয়, তারা সহজ-স্বাভাবিক মানুষের মতনও হতে পারে না।

তবু, শুধু কাব্যে-সাহিত্যে নয়, অনেক মানুষের মনেই রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনায় এখনও রাজপুত্র-রাজকন্যার সঙ্গে প্রতিতুলনা আসে। যদিও ইংলন্ডের বর্তমান যুবরাজটির মুখ ঘোড়ার মতন, তাঁর রূপলেশহীন মায়ের দাঁত উঁচু, বিবাহ-বিচ্ছিন্না রাজবধূটি এক দোকানদারের সঙ্গে ব্যভিচার করতে গিয়ে মরেছে, তবু মানুষের মনে রূপকথার রাজপুত্র-রাজকন্যার প্রতিভাসও এসে যায়।

টিটোও বাচ্চা বয়েসে তার ঠাকুমার মুখে রূপকথার গল্প শুনেছে! সেই সব রূপের বর্ণনা তার মনে গেঁথে আছে।

সে মোমের নরম আলোয় দেখল, এই আলুলায়িত মূর্ধজা তরুণীর শরীরের

প্রতিটি বিভঙ্গে সৌন্দর্যের রেখা। শ্রাবণীকে এইভাবে ঘুমন্ত ও একা অবস্থায় সে আগে কখনও দেখেনি। ঘুমন্ত মানুষের মুখ যেন অন্য মুখ। তার ওষ্ঠে যেন জন্ম-জন্মান্তরের বেদনার রেখা।

শ্রাবণীর শিয়রের কাছে একটি আধ-খোলা বই ওলটানো। পায়ের কাছে একটা টেলিফোনের রিসিভার।

একটুক্ষণ টিটো দু'চোখ ভরে শ্রাবণীকে দেখল। ঠিক যৌন আগ্রহে নয়, শ্রাবণীর অন্য রকম মুখখানাই তাকে বেশি আকৃষ্ট করেছে।

বইটা তুলে শ্রাবণীর পায়ের কাছে রেখে, টেলিফোন রিসিভারটি রাখল ওর মাথার কাছে। তারপর একবার শিস দিল।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে তাকাল শ্রাবণী।

ঘরের মধ্যে সহসা অন্য পুরুষ দেখলে যে-কোনও মেয়েই প্রথমে একটু আতঙ্কিত হতে পারে। টিটোকে দেখে অবশ্য শ্রাবণীর সেরকম ভয় পাবার কোনও প্রশ্নই নেই। কয়েক পলকের পর চিনতে পেরেই সে নরমভাবে শুধু বলল, টিটো!

তারপর পাশ ফিরে শুল।

টিটো বলল, একালেও রূপকথা কত জাগ্রত, তা আজ বুঝলাম। যে-ই সোনার কাঠি আর রুপোর কাঠি বদলে দিলাম, অমনি ঘুম ভেঙে গেল রাজকন্যের। ওগো রাজকন্যে, এই অবেলায় আর কতক্ষণ শুয়ে থাকবে? এবার ওঠো!

পাশ ফিরে থেকেই, বিছানায় মুখ গুঁজে অর্ধস্ফুট স্বরে শ্রাবণী টেনে টেনে বলল, টিটো, কেন আমার ঘুম ভাঙালি! আজ যে আমার খুব মন খাবাপ।

টিটো বলল, কেন, কী হয়েছে আজ?

এবারে মুখ ফেরাল শ্রাবণী। দু'চোখের কোণে চিকচিক করছে জল। ভাঙা ভাঙা গলায়, খুবই কাতরভাবে বলল, কোনও কারণ নেই, কোনও কারণ নেই। এমনিই, খুব খুব মন খারাপ।

টিটো একটু হাসল। সে তেমন একটা রোমান্টিক প্রকৃতির যুবক নয়। সে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও কিছুটা আদর্শবাদী এবং বাস্তবপন্থী। কবিতা পড়ে না। নেভিল কর্ডাসের কবিত্বময় ক্রিকেটের বর্ণনাও সে পছন্দ করে না।

সে শ্রাবণীর মন খারাপের একটা বাস্তব কারণ নিজে নিজেই ঠিক করে নিল।

রূপকথার রাজকন্যারা সাধারণত পঞ্চদশী থেকে অষ্টাদশী হয়। তার বেশি বয়েস হলেই তো তারা রানি হয়ে যাবে। ধিঙ্গি বা অনূঢ়া রাজকন্যার স্থান রূপকথায় নেই।

শ্রাবণীও মোটেই কচি মেয়েটি নয়। তার বয়েস একত্রিশ থেকে তেত্রিশের মধ্যে। একালের রাজকন্যাদের মতনই সে এরই মধ্যে একবার বিয়ে এবং বিয়ে-ভাঙা সেরে ফেলেছে। তার একটি সাড়ে তিন বছরের মেয়েও আছে। তাকে রাখা হয়েছে জামশেদপুরে মায়ের কাছে, প্রাক্তন স্বামীর থেকে নিরাপদ দূরত্বে। তা ছাড়া শ্রাবণী কলকাতায় তার চাকরিটা ছাড়তে চায় না।

অতটুকু মেয়ে নিজের কাছে না থাকলে তো মাঝে মাঝে মনের মধ্যে তোলপাড় হবেই। তীব্র বাৎসল্য যাকে বলে। কিংবা বাৎসল্যও ঠিক নয়, মায়েদের ক্ষেত্রে বাৎসল্য কথাটা খাটে না, এটা স্রেফ সাদামাটা ইনস্টিংক্ট! শিশু পালনের জন্য প্রকৃতির অস্ত্র।

টিটো বলল, মিঠুর জন্য মন কেমন করছে?

দু'দিকে আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে শ্রাবণী বলল, না, চার দিন আগেই তো মিঠুকে দেখে এলাম। মায়ের কাছেই ও ভাল থাকে।

তা হলে, কীসের জন্য মন খারাপ? একটা কিছু কারণ থাকবে তো।

কী জানি, জানি না। তবু এমন কষ্ট হচ্ছিল, ঘুমের মধ্যে একেবারে ডুবে যাই, আর যেন জাগতে না হয় কোনওদিনও। তুই কেন আমাকে জাগালি, টিটো?

সর্বনাশ, ঘুমের ওষুধ টষুধ খাসনি তো! বাড়িতে একটা সুইসাইড কেস সামলাতে হচ্ছে, আবার তুই...

উঠে বসল শ্রাবণী, হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে উদাসীন গলায় বলল, না ওষুধ খাইনি। কেমন আছেন তিনি?

টিটো বলল, এমনিতে ভালই আছেন। তবে হাফ-জরদ্গব বলতে পারিস। কিছুই মনে করতে পারেন না। মানুষ চিনতে পারেন না। তুই তো একবার দেখতে গেলেও পারিস।

ওঁকে দেখলে আমার কেমন যেন ভয় ভয় করে।

ভয় করে! ভয় পাবার তো কিছু নেই। এমনিতে মানুষটা নরম স্বভাবের। অ্যামনেশিয়াতে ভুগছেন। কিন্তু ভায়োলেন্ট একেবারেই নন। তোর ভয় পাবার কী কারণ থাকতে পারে?

আছে। আমাকেও কি চিনতে পারবেন?

তা বলা যায় না। ওঁর সঙ্গে কথা বলার সাবজেক্ট খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তুই ভাবতে পারিস, একটা লোক, নিজে একসময় ক্রিকেট খেলত, এখন সেই খেলাটার বিষয়েই কিছু জানে না! আমি বললাম, আমি শিগগিরই হয়ত ন্যাশনাল টিমে খেলার চান্স পেতে পারি, তা শুনে মন্তব্য করল, না খেললে কী হয়?

হেমকান্তির সামনে কোনও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করলেও ওই কথাটা টিটোর খুবই বুকে লেগেছে।

শ্রাবণী বলল, আমার মনে আছে, বেশ কয়েক বছর আগে, আমি তখন বেশ ছোট, হঠাৎ উনি আমাদের জামসেদপুরের বাড়িতে এসে হাজির হলেন। উসকোখুসকো চেহারা, খুব বৃষ্টি পড়ছিল সেদিন, চোখে সানগ্লাস, ঘরের মধ্যে বসেও সেটা খোলেননি। আমি বারান্দায় ছিলাম, খুব কৌতূহল হচ্ছিল মানুষটি সম্পর্কে, উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিলাম জানলা দিয়ে। উনি আমার মাকে বললেন, আমি তোমার এখানে কয়েকদিন থাকতে পারি, বিভা? মা একটু দূরে সরে গিয়ে বললেন, কয়েকদিন না। তা সম্ভব নয়, হেম, তুমি চা-টা খাও, তারপর কোনও হোটেলে...। কেন মা ওই কথা বলেছিলেন, আজও তা জানি না, আমাদের বাড়ি তো তুই দেখেছিস। বড় বাংলো, মাঝে মাঝে কলকাতার কত গেস্ট এসে থেকে গেছে। অথচ মা ওঁকে এই কথা বললেন... উনি বৃষ্টির মধ্যেই ভিজতে ভিজতে চলে গেলেন সন্ধেবেলা...

টিটো বলল, জামসেদপুর উনি কতবার গেছেন, আমার জন্মের আগে থেকে, তবু উনি জামসেদপুরের কথা একেবারে ভুলে গেছেন। আমার মাকেও.

দরজার কাছে এসে মাসি বললেন, ওগো বাবু, তোমার খাবার সাজিয়ে আমি কতক্ষণ বসে থাকব? মোমবাতি নিভিয়ে দাও, আলো এসে গেছে!

ঘরের মধ্যে ঢুকে তিনি আলো জ্বেলে দিলেন।

দু'হাতে মুখ চাপা দিয়ে শ্রাবণী বলল, জ্বেলো না, মাসি আলো জ্বেলো না।

মাসি বললেন, তবে কি অন্ধকারে ভূতের মতো বসে থাকবে? তোমার জন্যও চা করা হয়েছে। টেবিলে খাবে, না এখানে এনে দেব?

টিটো বলল, চল টেবিলেই চল, একসঙ্গে চা খাব।

মাছের পুডিঙের সঙ্গে কয়েকখানা টোস্ট, একটা প্লেটে কিছু জিলিপি, টি-কোজিতে ঢাকা চায়ের পট, ঠান্ডা জলের বোতল।

শ্রাবণীর অঙ্গে ম্যাক্সির ওপর শাড়িটা আলুথালুভাবে জড়ানো, আঁচলটা বাঁ কাঁধে। চোখে এখনও লেগে আছে ঘুম।

মাসি গজর গজর করতে করতে বললেন, মেয়ের কাণ্ড দ্যাখো। ভর সন্ধেবেলা, গা-ধোওয়া নেই, চুল আঁচড়ানো নেই, এইসময় ঘুমোলে লোকে অলক্ষ্মী বলে! আমরা ছোটবেলায় একজন আরেকজনের চুল বেঁধে দিতাম টেনে, কপালে টিপ...

টিটো বলল, এখন তো আর চুল বাঁধার বালাই নেই। কোনও লেখাপড়া জানা মেয়েই বড় চুল রাখে না।

মাসি বললেন, আমি লেখাপড়া শিখিনি বলে তুমি আমায় খোঁটা দিলে। আমাদের গ্রামে মেয়েদের ইস্কুলে চার কেলাস পর্যন্ত পড়া যেত। সেখানে আমি পড়িছি, তারপর আর ছেলেদের ইস্কুলে মেয়েদের যেতে দিত না, সে কি আমার দোষ!

টিটো সঙ্গে সঙ্গে একটু অনুতপ্ত গলায় বলল, না, না তুমি বেশি লেখাপড়া না শিখলেও তো অনেক কিছু জানো। কালকেই তো বললে, ভগবান একটা পিঁপড়ের চোখ দিয়েও পৃথিবীটা দেখতে পান। এমন কথা আমি আগে কখনও...

তাকে থামিয়ে দিয়ে মাসি বললেন, শোনো, আগেকার কালে বিধবারাও মাথায় চুলে কদমছাঁট দিত, তা তারা লেখাপড়া শিখুক, না শিখুক!

শ্রাবণী বলল, মাসি, তুমি এমনভাবে কথা বলো, যেন তুমি কতকাল আগেকার মানুষ। তুমি আমার মায়ের থেকে ছোট।

তোমাদের বাড়ি আমি যখন প্রথম কাজ নিয়ে আসি, তুমি তখনও জন্মাওনি। জন্মের আগের মানুষরা সবাই আগের যুগের।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

মাসি উঁকি মেরে দেখে দরজা খুলে দিলেন। ভেতরে এল আর একটি যুবতী, শ্রাবণীরই বয়েসী।

শ্রাবণী যেমন আজ সন্ধ্যায় অলসশয়নবিলগ্না, তার বিপরীতে রুচিরা যেন ব্যস্ততার প্রতিমূর্তি। তার দু'কাঁধে ঝুলছে দুটি ব্যাগ, হাতেও একটা মস্ত বড় ঠোঙা। ঘামে ভেজা মুখ, কপালে চূর্ণ অলক।

শব্দ করে সব কিছু টেবিলের ওপরে নামিয়ে রাখতে রাখতে সে বলল, উফ, যা গরম পড়েছে হঠাৎ, খুব মেঘ করেছে। কই মাসি, আমার চা কই?

মাসি বললেন, তুমি কখন ফিরবে, তা কি হাত গুনে জানব?

রুচিরা বলল, ওদের যখন চা দাও, তখন আমার জন্যও ফ্লাস্কে... শোনো, তোমার জন্য নারকোল কোরা এনেছি, এখন প্যাকেট পাওয়া যাচ্ছে, আস্ত নারকোল কেনার দরকার নেই। চিংড়ি তো আছেই, তাই না?

টিটোর দিকে তাকিয়ে বলল, শোনো তোমার সঙ্গে আমার একটা দরকার আছে। তুমি তো ডাক্তার জয়ন্ত বাগচীকে ভালই চেনো। ওঁর কাছ থেকে আমার জন্য একটা রেকমেন্ডেশন লেটার আনিয়ে দিতে পারবে?

টিটো বলল, তুমি কোনও চিঠি পেয়েছ?

রুচিরা বলল, তিনটে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেছিলাম। নর্থ ক্যারোলাইনার ডিউক ইউনিভার্সিটি থেকে পজিটিভ রেসপন্স পেয়েছি।

বেশ জোরে মেঘ ডেকে উঠল।

রুচিরা পায়ের জুতো ছুড়ে ছুড়ে খুলতে খুলতে শ্রাবণীকে বলল, তুই আজ অফিসে যাসনি? তিনটের সময় ফোন করেছিলাম...

তার আগেই চলে এসেছি। ভাল লাগছিল না।

আবার ডিপ্রেশন! নীতি লাহিড়ী যে ওষুধ খেতে বলেছিল... মাসি, বাজারের জিনিসগুলো ফ্রিজে তুলে রাখো। কিমা আছে। আর মাইয়োনেজ।

চা সম্ভবত তৈরিই ছিল, গরম করে নিয়ে এসে রুচিরার সামনে কাপ রেখে মাসি জিজ্ঞেস করলেন, তরকারি কী হবে?

তার সঙ্গে সঙ্গে আবার মেঘের শব্দ। এবার গর্জনের মতন। শব্দ ও বিদ্যুতের ঝলক প্রায় একসঙ্গে, অর্থাৎ মেঘ বেশ নীচে নেমে এসেছে।

মাসি দু'হাত কপালে ছুঁইয়ে বললেন, বৃষ্টি এল বলে। আকাশের যা অবস্থা দেখলাম, আজ ভাসাবে।

রুচিরা বলল, তা হলে আজ খিচুড়ি হোক না। চিংড়ি ভাজা করে দিলেই হবে, আর তরকারি ফরকারির দরকার নেই।

মাসি টিটোর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি এবার উঠে পড়ো। বৃষ্টির মধ্যে যাবে কী করে?

রুচিরা বলল, টিটো যাবে কেন? ও খিচুড়ি খুব ভালবাসে। আমাদের সঙ্গে খেয়ে নেবে। তা ছাড়া আমরা আজ একটু ড্রিঙ্ক করব। আজ সারাদিন এত ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে, খুব টায়ার্ড, আমার কাছে ভদ্‌কা আছে। একজন পুরুষমানুষ সঙ্গে না থাকলে কি ড্রিঙ্ক জমে?

শ্রাবণী বলল, বেশি বৃষ্টিতে যদি রাস্তাঘাট জলে ভেসে যায়, তার মধ্যে তো টিটো মোটরসাইকেল চালাতে পারবে না, ও না হয় আজ রাত্তিরটা এখানেই থেকে যাবে।

মাসি বললেন, অ্যাঁ, কী বলছ! তোমাদের কি একটুও হায়া নেই গো?

দুই নারী কলকল করে হেসে উঠল।

মাসি বললেন, বাড়িতে দু'-দুটি সোমত্থ মেয়ে, আর একজন পুরুষ সেখানে রাত্তিরে থাকবে? আমি জীয়ন্ত থাকতে এখানে ওসব বেলাল্লাপনা হবে না।

দু'জনে প্রাণ খুলে হাসছে, টিটোর মুখেও লেগেছে সেই হাসির ছোঁয়াচ।

রুচিরা বলল. দু'জন মেয়ে বলছ কেন, মাসি? তুমিও তো এখনও বুড়ি হওনি। তোমার এই বয়েসটাও ডেঞ্জারাস।

শ্রাবণী বলল, রাত্তিরে একজন পুরুষমানুষ থাকলেই বেলেল্লাপনা হবে? আমরা তো সিভিলাইজড পার্সন, নারী আর পুরুষ পাশাপাশি থাকলেও যতক্ষণ না প্রেম-ভালবাসা হয়, কিংবা দু'জনেরই তীব্র ইচ্ছে একসঙ্গে মেলে, ততক্ষণ তো আমরা কেউ কারুকে ছুঁই না। তা ছাড়া পুরুষ কোথায়, ও তো আমাদের টিটো!

রুচিরা বলল, ও তো প্রেম-ভালবাসার কিছুই বোঝে না। দারুণ কেরিয়ারিস্ট। এই সিজনে রঞ্জি ট্রফিতে আরও দুটো সেঞ্চুরি করতে পারলে পরের বছর ন্যাশনাল টিমে চান্স পেয়ে যেতে পারে। এখন সেটাই ওর ধ্যান-জ্ঞান। মাথায় টেস্ট খেলার পালকটি গোঁজার পর ও দিল্লির জে এন ইউতে চাকরি করবে। তারপর বিয়েটিয়ের কথা ভাববে। তাই না টিটো?

মাসি বললেন, পুরুষমানুষদের তোমরা এখনও ভাল করে চেনো না। ওরা যখন তখন গায়ের ডোরা বদলায়। দিনের বেলা জেব্রা, রাতের বেলায় বাঘ।

রুচিরা বলল, ও মা, মেয়েদের সম্পর্কেই তো পুরুষেরা এই কথা বলে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও একটা উপন্যাসে আছে, দিন কা মোহিনী, রাত কা বাঘিনী।

শ্রাবণী বলল, মাসি, একটা রাত্তির টিটোকে থাকতে দিয়ে দেখোই না, কী হয়! ও যদি কোনওরকম অসভ্যতা করতে আসে, আমরা তিনজনে মিলে ওকে পেটাব!

মাসি বললেন, ওসব কথা ভাবলেও পাপ হয়। সত্যি কথা বলতে কী, আমি তোমাদেরও বিশ্বাস করি না।

ওরা দু'জন আবার হাসতে শুরু করে দিল।

তার মধ্যেই মাসি খানিকটা অভিমানের সঙ্গে বললেন, আমার কথা যদি তোমাদের পছন্দ না হয়, আমাকে তোমরা তাড়িয়ে দাও! আমি তো দাসীবাঁদি ছাড়া আর কিছু নয়।

এটা মাসির ব্ল্যাকমেল। তিনি নিজেও ভাল জানেন, শ্রাবণী প্রায় জন্মের পর থেকেই যাঁর কোলে-পিঠে চেপে বর্ধিত হয়েছে, তাঁকে বিদায় করে দেওয়া তার পক্ষে কোনওক্রমেই সম্ভব নয়। বিয়ের পর যখন শ্রাবণী জামসেদপুর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসে, তখন তার মা এই মাসিকেও সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন।

টিটো শ্রাবণীর পিসতুতো ভাই। সেই সম্পর্ক একেবারে পরিষ্কার। বয়েসেও টিটো কিছুটা ছোট। এই ফ্ল্যাটে একটা বেশি ঘর আছে, টিটো একসময় এখানে ওদের পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকতে চেয়েছিল। বাড়িতে একজন পুরুষমানুষ থাকলে অনেক রকম সুবিধে তো হয়ই, পাড়ার ছেলেদের গুলগুলি দৃষ্টি সবসময় গায়ে মাখতে হয় না। কাঠের মিস্তিরিটা যে এত ঠকিয়ে গেল, কারণ সে বুঝেছিল, তাকে ধমক দেবার মতন কোনও পুরুষ এ-বাড়িতে নেই। সবসময় গেটে তালা দিয়ে রাখতে হয়। সমাজটা তো এখনও এরকমই।

কিন্তু মাসির নৈতিক শুচিবায়ুর জন্য টিটোকে এ-বাড়িতে রাখার উপায় নেই। এমনকী রাত ন'টার পর আর মাসি তাকে এখানে থাকতে দেয় না। এই মাসিকে উপেক্ষা করার ক্ষমতাও এদের নেই। এই মাসি কোনওদিন ছুটিও নেবেন না, কারণ ওঁর যাবার জায়গা নেই আর কোথাও!

টিটো এতক্ষণ কিছু বলেনি। এইসময় তার পকেটের মোবাইল ফোন বেজে উঠতেই সে বারান্দায় চলে গেল।

একটু পরেই ফিরে এসে সে বলল, সরি, তোমাদের খিচুড়ি খাওয়া আর হল না আমার। একজন নেমন্তন্ন করেছে তাজবেঙ্গল হোটেলে। এক্ষুনি যেতে হবে!

শ্রাবণী বলল, যাক। মাসি যে তোকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, সেই অপমানটা আর গায়ে মাখতে হল না।

মাসি বললেন, আমি ওকে তাড়িয়ে দেব কেন, বালাই ষাট! হিরের টুকরো ছেলে। আমি তো ওর ভালর জন্যই— জোর বৃষ্টি নামলে ভটভটিয়া চালিয়ে ভিজতে ভিজতে ফিরবে, যদি নিউমোনিয়া হয়ে যায়।

রুচিরা জিজ্ঞেস করল, এক্ষুনি যেতে হবে কেন? কে নেমন্তন্ন করেছে জানতে পারি?

টিটো বলল, হ্যাঁ, পারো অবশ্যই। কোচবিহারের মহারানি।

রুচিরা হেসে বলল, ও, তাই বুঝি! এর আগে একদিন জুনাগড়ের বেগমসাহেবা তোমাকে গ্র্যান্ড হোটেলে ডেকেছিলেন না? তুমি রানি-মহারানিদের খুব ফেভারিট।

শ্রাবণী বলল, মহারানি! কোনও রাজকুমারীর খপ্পরে এখনও পড়োনি!

রুচিরা বলল, তুই কি ভাবছিস, সব মহারানিই বুড়ি কিংবা আধবুড়ি? কোচবিহারের মহারানির বয়েস কি আমরা জানি? কোনও কচি মেয়েও হতে পারে।

শ্রাবণী বলল, এখন কোনও রাজাই নেই, তার আবার রানি কিংবা মহারানি! গুড লাক টিটো! খুব বৃষ্টি হলে ভিজবি না, হোটেলেই মহারানির সঙ্গে থেকে যাবি।

তারপর সে ঝুঁকে মাসির গায়ে একটা চাপড় মেরে বলল, কী, তাতে তোমার আপত্তি নেই নিশ্চয়ই!

টিটো রাস্তায় বেরিয়ে দেখল, আকাশ এখন পাথরের মতন গম্ভীর এবং কালো। চাঁদ সমেত গ্রহ-তারকা সব মুছে গেছে। পাথরে পাথরে ধাক্কা লাগার মতোই শব্দ হচ্ছে মাঝে মাঝে। বৃষ্টির তোড়জোড় বেশ ভালোই!

সে মোটরসাইকেলে স্টার্ট দিল।

তাজবেঙ্গল হোটেল নয়, সে যেতে লাগল স্যাটারডে ক্লাবের দিকে। কোনও মহারানিটানিও নয়। তাকে ডেকেছে রত্নেশ।

এখন রাস্তার কেউ তাকে চিনতে পারছে না। পরের বছর টেস্ট টিমে প্রথম একটা সেঞ্চুরি করতে পারলেই সব কাগজের প্রথম পাতায় ছবি। অল্প বয়েসি ছেলেমেয়েরা সেই ছবি কেটে নিয়ে সেঁটে রাখবে নিজেদের পড়ার ঘরের দেওয়ালে। ইন্দ্রাণীর ঘরের দেওয়ালে এরকম অনেক প্লেয়ারের ছবি আছে। সে বলেছে, দ্যাখো টিটোদা, তোমার জন্য একটা জায়গা খালি রেখেছি।

কয়েক ফোঁটা মাত্র বৃষ্টি মাথায় নিয়ে টিটো ঢুকে পড়ল ক্লাবের আঙিনায়।

রত্নেশ হাসছে বারান্দায়, সঙ্গে একজন অচেনা ব্যক্তি।

রত্নেশ বলল, আয়। ভিজিসনি তো? তুই কী নিবি?

ওদের দু'জনের সামনেই হুইস্কির গেলাস। টিটো বিড়ি-সিগারেট টেনে

দেখেনি কখনও, মদ্যপানও করে না। নামের সঙ্গে মিল আছে, সে এখনও টিটোটালার। সে প্রতিজ্ঞা করে রেখেছে, দলে চান্স পাবার পর যেদিন ইন্ডিয়া প্রথম টেস্ট জিতবে, সেদিন সে প্রথম ঠোঁটে শ্যাম্পেন ছোঁয়াবে। রুচিরা তাকে খোঁচাবার জন্য একদিন বলেছিল, যদি তুমি টেস্ট খেলায় চান্স পেলেই না ধরো, কিংবা চান্স পেলেও তোমার টিমকে একবারও জেতাতে পারলে না, তা হলে তুমি সারাজীবনই এরকম বঞ্চিত থাকবে?

টিটো জোর দিয়ে বলেছিল, অফ কোর্স। তা হলে সারা জীবনেও অ্যালকোহল টাচ করব না। তাতে আমার কী এমন ক্ষতি হবে!

রুচিরা তখন বলেছিল, আমি দেখতে পাচ্ছি, একটা জায়গায় একটা শ্যাম্পেনের বোতল অপেক্ষা করছে তোমার জন্য। কবে তুমি সার্থক হবে, তার জন্য ছটফট করছে বোতলটা। মানুষ যেমন শ্যাম্পেন পান করে, তেমনই শ্যাম্পেনও মানুষের ঠোঁট ছোঁয়ার লোভে থাকে। প্রত্যেক সার্থকতার জন্যই ভেতরে ভেতরে একটা জেদের দরকার হয়, ওই শ্যাম্পেনের বোতলটা তোমার সেই জেদের প্রতীক।

টিটো খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও সাবধানী। কোনও ভাজা জিনিস ছুঁতেই চায় না প্রায়। চায়ে চিনি দেয় না। গুরুভোজনও করে না কক্ষনও।

চেয়ার টেনে বসতে বসতে সে বলল, তোমাদের ক্লাবের চিকেন রোস্ট বেশ ভালো, তার সঙ্গে এক কাপ চা।

রত্নেশ বলল, এই রে, এখানে বোধহয় সন্ধের পর চা সার্ভ করে না। তার বদলে একটা কিছু কোল্ড ড্রিঙ্কস।

অন্য ব্যক্তিটি বলল, চিকেন রোস্টের আবার ভালো আর মন্দ। সব জায়গাতেই এক।

রত্নেশ বলল, আলাপ করিয়ে দিই। আমার বন্ধু, ইনি ডাক্তার, ডাক্তার বাসুদেব সিংহানিয়া।

ইনি যে বাংলায় কথা বললেন, সেটা খেয়াল না করে টিটো ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, গ্ল্যাড টু মিট ইউ।

করমর্দন করে বাসুদেব মৃদু গলায় বলল, আমরা পাঁচ-সাত পুরুষের বাঙালি। বেশির ভাগ লোক পদবি দেখে বাঙালির বিচার করে। কিন্তু বলুন তো, সিংহ, চৌধুরী পদবির লোকেরা অনেকেই কত পুরুষ আগে এখানে এসেছে? দত্ত পাঞ্জাবিরাও হয়। সিংহানিয়াও বাঙালি। যাই হোক, চিকেন

রোস্টের বদলে আপনি হ্যাম স্যান্ডুইচ খান, সত্যিই ভালো। আর আপনি তো খেলোয়াড়, কোল্ড ড্রিঙ্কসগুলো একদম খাবেন না। খেলোয়াড়দের পক্ষে দু'পেগের মতন এনি ফর্ম অফ অ্যালকোহল বেশ উপকারী। তা যদি না খেতে চান, কোনও সংস্কার থাকে, তা হলে ফ্রেশ লাইম আর সোডা খাবেন, ওটা সব জায়গায় পাওয়া যায়।

রত্নেশ বলল, বাসু, তুমি টিটোকে 'তুমি' বলো, ও অনেক ছোট।

বাসুদেব বলল, আমি তোমার খেলা দেখেছি, একবার। তুমি লেফট হ্যান্ডার। খেলাটা ছিল মহারাষ্ট্রের এগেনস্টে, তুমি থার্ড পজিশনে নেমে এইট্টি টু করেছিলে, বাজেভাবে রান আউট হয়ে গেলে, তোমার সেঞ্চুরি পাওয়া উচিত ছিল।

রত্নেশ বলল, দ্যাখ টিটো, এর মধ্যেই তুই ফেমাস হয়ে গেছিস।

একটু লজ্জা পেয়ে টিটো বলল, ন'মামা, তুমি আজ সন্ধেবেলা ও বাড়ি যাওনি?

না, সেইজন্যই তো তোকে আনলাম। আমার খুব কাজ ছিল, যেতে পারিনি। দুপুরে ঝিল্লি ফোন করেছিল। উনি নাকি হঠাৎ খুব চেঁচামেচি করেছেন? কী হয়েছিল?

টিটো বলল, দুপুরে কী হয়েছিল জানি না। আমি তো আগেই বেরিয়ে এসেছি। তবে উনি হঠাৎ হঠাৎ মেজাজ হারিয়ে ফেলছেন। গলা তুলছেন। আগে তো এরকম ছিলেন না।

রত্নেশ বাসুদেবকে বলল, ডোন্ট মাইন্ড, আমাদের ঘরোয়া কথা বলছি। তুমি তো কেসটা সবই জানো।

বাসুদেব বলল, হোয়াই শুড আই মাইন্ড। তোমরা বলো, আমি শুনছি। আমি তো একদিন ওঁকে দেখতে যাব ভেবেছি। তবে এইসময় মাঝে মাঝে টেম্পার লুজ করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যে-লোক অনেক কিছুই মনে করতে পারে না, তার তো ভেতরে ভেতরে একটা চাপ তৈরি হবেই।

টিটো বলল, আমার কাছ থেকে নার্সিংহোম যে-প্রেসক্রিপশান দিয়েছে সেটা চাইছিলেন। আমি দিতে পারিনি বলে খুব রাগারাগি করলেন।

রত্নেশ বলল, সেটা আমার কাছে আছে। সেটা দেখেই বা উনি কী বুঝবেন? চিনতে পারবেন ওষুধের নাম দেখে? সুইসাইড অ্যাটেম্পটের কথাও লেখা নেই। তা লিখলে পুলিশ কেস করতে হয়। রুগি বেঁচে গেলে

আর নার্সিংহোম ওসব ঝামেলায় যেতে চায় না। লিখেছে অ্যাকসিডেন্টাল ওভারডোজ অফ ড্রাগ। আমি যে ওষুধগুলো কিনে দিয়েছি সব ঠিকঠাক খাওয়ানো হচ্ছে তো?

হ্যাঁ, ঝিল্লি বুঝে নিয়েছে।

আমি কয়েকদিনের জন্য রাউরকেল্লা যাচ্ছি। তোর ওপর একটু চাপ পড়ে যাবে টিটো। ঝিল্লি একা আর কতটা সামলাবে, তোকে নজর রাখতে হবে।

সকালের দিকটা আমি দেখছি। সারাদিন তো বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়। মুশকিল হচ্ছে যে, মেজমামু এখনও এমন রাগ করে আছেন যে ওঁর সঙ্গে ভাল করে কথাই বলছেন না। আর দোতলাতেও হি ইজ নট ওয়েলকাম।

নার্সিংহোমের এক ডাক্তার উৎপল চ্যাটার্জি আমাকে বলেছেন, এখন বেশ কিছু দিন ওঁকে খুব সাবধানে আর যত্নে রাখা দরকার। ডিপ কোমায় চলে গিয়েছিলেন, বাঁচার কোনও আশাই ছিল না, তবু স্রেফ ভাইটালিটির জোরে ফিরে এসেছেন, তার ফলে অনেকখানি লস অফ মেমরি হয়ে গেছে। এই অবস্থায় শুধু মন নয়, শরীরও বেশ দুর্বল হয়ে যায়। ডাইজেস্টিভ সিস্টেমেও গন্ডগোল করে।

সর্বক্ষণের জন্য একজন নার্স রাখলে কেমন হয়?

সেটাই বোধহয় দরকার। ঝিল্লি একা পারবে না। তুই মেজদার সঙ্গে কথা বল। টাকাপয়সা যা লাগবে...ওঁর ব্যাঙ্কে কত কী টাকা পয়সা আছে তা তো আমরা কিছুই জানি না।

যা আছে, তাও উনি সই করে তুলতে পারবেন কি না তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

তা যাই-ই হোক। আপাতত আমিই ম্যানেজ করে দেব। নার্সিংহোমের বিল তো আমিই মিটিয়েছি। সে সম্পর্কে মেজদা তো কিছুই উচ্চবাচ্য করলেন না।

বাসুদেব বলল, আমি তোমাদের একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি? তোমাদের এই যে ফুলদা ভদ্রলোক, ইনি কি রিলিজিয়াস মাইন্ডেড? পুজোটুজো করেন?

রত্নেশ বলল, আমি তো কখনও দেখিনি। ছাত্রবয়েসে উনি লেফট্ পলিটিকস করতেন জানি। তারপর অনেক বছর আমার সঙ্গে দেখাই হয়নি। এবারে মাত্র কয়েক মাস হল এখানে আছেন। ইন ফ্যাক্ট ইনি সম্পর্কে আমার দাদা হলেও ওঁর সঙ্গে আমার কখনও ঘনিষ্ঠতা হয়নি। একেবারে বড়দা যিনি

ছিলেন, অনেকদিন মারা গেছেন। তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের খুব ভক্ত। পরের যিনি, মেজদা, তিনি বাড়িতেই রোজ অন্তত এক ঘণ্টা পুজো করেন। আর একজন, থার্ড ব্রাদার, যিনি একজন অ্যাটর্নি, খুব একটা শাকসেসফুল নন, খানিকটা বাতিকগ্রস্ত, যাই হোক, তিনি মাঝেমধ্যে বেলুড়-দক্ষিণেশ্বরে যান, তবে মনে হয় হাফ-হার্টেড। এরকম তো কিছু লোক আছেই যাদের হৃদয়ে খুব একটা ভক্তি-শ্রদ্ধা নেই, তবু পুজোটুজো করে এইজন্য যে, যদি কিছু একটা লেগে যায়। যদি ঠাকুর-দেবতাদের কিছু ঘুষ দিয়ে একটা লটারির ফার্স্ট প্রাইজের টিকিট পাওয়া যায়!

টিটো বলল, ছোটমামাকে আমি কখনও, মানে এই ঘটনাটা ঘটে যাবার আগে কখনও ধর্ম নিয়ে কিছু বলতে শুনিনি। উনি ইতিহাসের বই পড়তেন বেশি।

বাসুদেব বলল, এই কথাটা জিজ্ঞেস করলাম এইজন্য যে, তোমরা যে নার্সিংহোমের ডাক্তার উৎপল চ্যাটার্জির কথা বললে, সে আমার খুব বন্ধু। উৎপল ঠিক কথাই বলেছে। ডিপ কোমায় যাবার পর যদি ফিরে আসে জ্ঞান, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরীরের কোনও না কোনও অঙ্গে একটা চোট লাগে। এঁর লেগেছে সবচেয়ে খারাপ জায়গায়, ব্রেনে। এর থেকে আর কখনও সেরে উঠবেন কি না, সন্দেহ আছে। উঠতেও পারেন, খুব রেয়ার কেসে তাও ঘটেছে। একটা আশ্চর্য ব্যাপার, যাঁরা ধর্মবিশ্বাসী, যাঁরা পুজোটুজোর রিচুয়াল মানেন, তাঁদের অনেকটা স্মৃতিভ্রংশ হলেও কিন্তু এগুলো ঠিক ভোলেন না। আংশিক স্মৃতি নষ্ট আর পাগল হয়ে যাওয়া তো এক নয়। এরা এই অবস্থাতেও অনেকটা ইনসটিঙ্কটিভলি, কিংবা বহুকালের অভ্যাসের ফলে যেমন খাবার খেতে ভোলেন না, ইংরেজি-বাংলা অক্ষর ভোলেন না, ঠিক সেই রকমই আবার পুজোয় বসে যান ঠিক সময়ে। এক হিসেবে এঁরা খানিকটা বিপন্মুক্ত, কারণ এঁরা পুরোপুরি আত্মনির্ভরশীল নন। এঁরা ভগবান কিংবা কোনও প্রিয় দেব-দেবীর ওপর নিজের অনেকটা ভার চাপিয়ে দেন। সেই ঠাকুরদেবতারা রাগ করবেন কিংবা পাপের ভয়ে এঁরা হঠাৎ কোনও জীবন-ধ্বংসী কিছু করেন না। আর যাঁরা নাস্তিক, তাঁরা খুবই লোনলি। তাঁদের কোনও নির্ভরশীলতা নেই, মনের কথা বলার মতনও তাঁদের কোনও আপনজন থাকে না। তাঁরা শুধু নিভৃতে কথা বলেন নিজের সঙ্গে। কিন্তু নিজের সঙ্গে কথা বলতে গেলে একটা আস্ত অতীত চাই, চেনাশোনা মানুষদের কিছু মুখ চাই। যাঁর অতীত মুছে গেছে, চেনাশোনা মুখও মনে পড়ে না, তিনি মনে মনেও কথা বলতে

পারেন না। তাই তাঁরা নিজের ওপরেই বিরক্ত হয়ে ওঠেন, রাগে জ্বলে ওঠেন। আর এক-এক সময় অসহ্য বোধ হলে এঁরা আবার আত্মহত্যার চেষ্টা করতে পারেন। বিষ জোগাড় করতে না পারলে ঘরে আগুন লাগিয়ে, উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়ে। সেইজন্যই বলছি, তোমাদের এই ফুলদাকে খুব সাবধানে, সবসময় চোখে চোখে রাখতে হবে। ইনি দ্বিতীয়বার সুইসাইড অ্যাটেম্পট করলে তোমাদেরও তো খুব বিপদ হবে।

পাঁচ

টেলিফোনের ঝনঝন শব্দে হেমকান্তির ঘুম ভেঙে গেল।

ঘর অন্ধকার, কত রাত্রি বোঝার উপায় নেই। সন্ধেবেলা বৃষ্টির জন্য সব জানলা বন্ধ করা হয়েছিল, আর খোলা হয়নি।

ঘুম ভাঙলেও বিছানা ছেড়ে উঠলেন না হেমকান্তি, টেলিফোনটা বেজেই চলল।

তারপর একটু থেমে আবার শুরু হল ঝনঝনানি। আবার একটু থেমে বাজতে লাগল তৃতীয়বার।

হেমকান্তি বুঝলেন, কেউ তাঁকে জাগিয়ে তুলতেই চাইছে। তাঁকে উঠতেই হল।

ফোনটা তুলে বললেন, হ্যালো।

ওদিক থেকে এক নারীকণ্ঠ বলল, ইউ আর অ্যাওয়েক, ফাইন। হাউ আর ইউ টুডে, মিস্টার লাহিড়ী?

আই অ্যাম অল রাইট। হু ইজ ইট, মে আই নো?

আমি তাহেরে সফরজাদে। আমার গলা শুনে চিনতে পারছ না?

এই নামে কারওকে আমি— আমি অসুস্থ ছিলাম, অনেক কিছুই মনে করতে পারি না এখনও।

তা আমি জানি। একবার তোপচাঁচির কথা মনে করার চেষ্টা করো।

তুমি কে? কেন এত রাত্রে আমাকে ডাকছ?

আমি এক রূপকথার দেশের প্রিন্সেস। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।

থ্যাঙ্কস। আমার কোনও সাহায্যের দরকার নেই।

শোনো শোনো। ফোন রেখে দিয়ো না। তোমার সঙ্গে আমার কথা বলার খুব দরকার। তুমি তো আমার সঙ্গে যোগাযোগ করছ না।

তোমার সঙ্গে যোগাযোগ...আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

তুমি একবার ছাদে উঠে আসতে পারবে? সেখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হতে পারে।

ছাদে? তুমি সেখানে আসবে কী করে?

রূপকথার রাজকন্যারা আকাশে উড়তেও পারে, জানো না?

এই ক'দিন হেমকান্তির অন্তত এইটুকু বোধ ফিরে এসেছে যে তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর স্মৃতিহীনতার সুযোগ নিয়ে কেউ কেউ খেলা করছে তাঁর সঙ্গে। যেন তিনি একটা শিশু, তাঁকে শোনানো হচ্ছে এক উড়ন্ত রাজকুমারীর গল্প।

আগে থেকে কেউ ছাদে উঠে বসে আছে? নীচের সদর দরজা অনেক সময়ই খোলা থাকে।

দু'দিকে মাথা নেড়ে হেমকান্তি মনে মনে বললেন, তাই বা কী করে হবে! ছাদে বসে কেউ টেলিফোন করবে কী করে?

হেমকান্তি চুপ করে আছেন বলে সেই রমণীকণ্ঠ আবার বলল, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? একবার ছাদে এসে দেখোই না। আর শোনো, খুব বৃষ্টি হয়েছে, তাই বাতাস বেশ ঠান্ডা। জামা পরে এসো। গায়ে একটা চাদরও জড়িয়ে নিতে পারো।

ফোন কেটে গেল। হেমকান্তি আলো জ্বাললেন।

আজ তিনি পরে আছেন একটা ডোরাকাটা স্লিপিং সুট। এটা কোথায় ছিল কে জানে! চাদর পাবেন কোথায়? বিছানায় তাঁর পায়ের দিকে রয়েছে একটা পাতলা কম্বল। সেটাই তুলে নিলেন।

আলো নিভিয়ে, দরজা খুলে বাইরে এসে হেমকান্তি দেখলেন, আর সব ঘরের দরজা বন্ধ। নিশ্চয়ই এখন গভীর রাত। বন্ধ দরজা ভেদ করেও শোনা যাচ্ছে তাঁর মেজদার নাসিকাগর্জন।

ছাদের সিঁড়িতে তিনি পা দিলেন। যদিও বিশ্বাস করছেন না, তবু তিনি কল্পনায় দেখতে পেলেন আকাশপথে উড়ে আসছে এক দুধ-সাদা পোশাক পরা যুবতী, তার হাতে একটা নীল রঙের টেলিফোন, আর কেটে যাওয়া

ঘুড়ির সুতোর মতন অনেকখানি তার দুলতে দুলতে আসছে তার সঙ্গে। এইমাত্র সে যুবতী আলতো করে নামল ছাদে।

ছাদে এসে হেমকান্তি কারুকেই দেখতে পেলেন না। তাতে তিনি নিশ্চিন্ত বোধ করলেন, তাঁর যুক্তিবোধ ঠিক কাজ করছে। আকাশ দিয়ে কোনও পৃথিবীর মেয়ে উড়ে আসতে পারে না।

এখন আকাশ পরিষ্কার, কয়েকটি তারা দেখা যাচ্ছে।

তার পরই হেমকান্তি পেলেন সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ।

কুলুকুলু হাসি দিয়ে এক নারী বলল, এই যে, আমি এখানে।

ঘাড় ফিরিয়ে হেমকান্তি দেখলেন, পাশের নিচু ছাদটার পাঁচিলে হেলান দিয়ে এক দীর্ঘকায়া রমণী সিগারেট টানছে।

একে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলেন হেমকান্তি। দোতলার সেই মেয়েটি, যে তাঁকে কফি খাইয়েছিল। এর নাম, এর নাম তিনি লিখে রেখেছেন, এখন মনে পড়ছে না।

এর পক্ষে ছাদে উঠে আসা তো অস্বাভাবিক কিছুই না। তিনতলার ছাদের সিঁড়িতে কোনও দরজা নেই।

শুধু হেমকান্তির যেটা অস্বাভাবিক মনে হল, তা হল টেলিফোন।

তিনি দুটো সিঁড়ি নীচে নেমে এসে বললেন, তুমি এখানে রয়েছ। টেলিফোন করলে কী করে?

মেয়েটি একটা ছোট্ট জিনিস তুলে ধরে বলল, সেটা আর এমন কী ব্যাপার। এই যে মোবাইল ফোন। মডার্ন মারভেল। আমি তোমায় নম্বর লিখে দিয়েছিলাম, তুমি তো একবারও ফোন করোনি!

এ-মেয়েটি একটা চিরকুটে দশটা সংখ্যা লিখে দিয়েছিল বটে, কিন্তু সেটা যে টেলিফোন নম্বর হতে পারে, তা তাঁর মাথায় আসেনি।

মেয়েটি বলল, সিন্দবাদ, তুমি একটা সিগারেট খাবে?

হেমকান্তি ভুরু কুঁচকে বললেন, সিন্দবাদ, সে আবার কে?

মেয়েটি আবার হেসে বলল, আমি যখন তাহেরে সফরজাদে, তুমি তখন সিন্দবাদ। আর আমি যখন জয়ী, তখন তুমি আমার ফুলকাকা। আপাতত আমি জয়ী, আগে দু'-একটা প্র্যাকটিক্যাল কথা সেরে নিই।

নিজের হাতের সিগারেটটাই এগিয়ে দিয়ে জয়ী বলল, এটাতেই দুটো টান দিতে পারো।

হেমকান্তি বললেন, না থাক। কাশি হচ্ছে।

তা হলে ওই চেয়ারটায় বসো।

সেখানে একটি মাত্র চেয়ার রয়েছে প্লাস্টিকের। বৃষ্টিতে ভিজলেও এর কোনও ক্ষতি হয় না। হেমকান্তি সেই চেয়ারটায় বসলেন। তাঁর খুব কাছেই জয়ীর পূর্ণাঙ্গ শরীর, সে পরে আছে পা পর্যন্ত ছোঁওয়া মেরুন রঙের ম্যাক্সি। রেখাগুলি কিছুটা অস্পষ্ট, তবে সুমেরু পর্বতের মতন দুটি সু-উচ্চ স্তন ঠিকই বোঝা যায়।

একটু ঝুঁকে জয়ী বলল, প্রথম কাজের কথাটাই হচ্ছে, তোমাকে কেউ কোনও ফর্মে কিংবা যে-কোনও কাগজে সই করতে বললে, তুমি রাজি হবে না।

হেমকান্তি বললেন, সই? কেন সই করতে হবে কেন?

তোমাকে ঘিরে একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে। সেই ষড়যন্ত্রের প্রধান হোতা হচ্ছেন আমার বাবা। তাই আমি সব জানি। আমার বাবা তোমাকে একেবারেই পছন্দ করেন না।

আমি কি ওঁর কাছে কোনও দোষ করেছি?

হ্যাঁ, করেছ। প্রথম দোষ, তুমি জন্মেছিলে কেন? দ্বিতীয়টা এখন বলছি না। তৃতীয়টা, তুমি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেও আবার বেঁচে ফিরে এলে কেন? দ্যাখো, আত্মহত্যা করাটা একটা ট্র্যাজিক ব্যাপার। কিন্তু আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেও বেঁচে ফিরে আসাটা কেমন যেন ভাল্‌গার। যুদ্ধের সময় পেছন ফিরে পালানো সৈন্যের মতন।

আই অ্যাম স্যরি, জয়ী।

শোনো, তা বলে তুমি যেন আবার ও চেষ্টা কোরো না। তা হলে আমি খুবই রাগ করব। এখন তোমাকে শক্ত থাকতে হবে। আমার বাবা তো নিজে তোমায় কিছু বলবেন না। অন্য কাকে যেন পাঠাবেন। সে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে তোমাকে ভোলাতে পারে। তুমি কিছুতেই সই করবে না।

সই করার ব্যাপারটা কী, তাই-ই তো বুঝতে পারছি না।

এই বাড়ি নিয়ে মামলা হচ্ছে, তুমি একজন অংশীদার। তোমাকে তোমার অংশ থেকে বঞ্চিত করার কোনও চেষ্টাই বাদ রাখবেন না আমার বাবা।

ও, এই ব্যাপার। বাড়ির অংশ নিয়ে আমি কী করব? আমার এখানে থাকতে ঠিক যেন, ইয়ে, কী যেন শব্দটা, স্বস্তি, হ্যাঁ, স্বস্তি লাগছে না। শরীরটা

আর একটু ঠিক হলেই এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। আর যদি ফিরে না আসি...

উঁঃ হুঁঃ, ওসব চলবে না! তুমি এ-বাড়িতে থাকো বা না থাকো, কিন্তু তোমার রাইট ছাড়বে না। সেটাই তোমার পাওয়ার। তোমার ব্যক্তিত্ব তাতেই ফিরে আসবে। এটা তোমার ট্রিটমেন্টের জন্যই খুব দরকারি। পরে, সম্পূর্ণ সুস্থ হলে তোমার অংশ তুমি ইচ্ছে মতন কারুকে দান করে দিতে পারো, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু মনে রেখো, তোমার পুরোপুরি সেরে ওঠার জন্যই তোমার মধ্যে এই অধিকারবোধটা থাকা দরকার।

পেছনের জংলা জায়গাটায় কুক কুক শব্দে ডেকে উঠল একটা রাতপাখি। এত রাতেও কেউ বোধহয় পুকুরে নেমেছে, জলে সেইরকমই শব্দ। রাত্রিবেলা জায়গাটা বেশ রহস্যময় হয়ে যায়।

হেমকান্তি খানিকটা অন্যমনস্কভাবে বললেন, এ-বাড়িতে যদি আমার অংশ থাকে, তা হলে তোমার বাবা সেটা নিয়ে নিতে চাইবেন কেন?

জয়ী হাসল। এক হাত বাড়িয়ে হেমকান্তির কাঁধ ছুঁয়ে বলল, তুমি যেন সত্যিই একটা শিশু হয়ে গেছ। মানবসভ্যতার শুরু থেকেই তো এটা চলে আসছে। একজন অন্যজনের ভূমি গ্রাস করতে চায়। একজনের শ্রম ভোগ করে অন্যজন। একজনের নারীকে কেড়ে নেবার জন্য লোলুপ হয়ে থাকে অন্য মানুষেরা।

হেমকান্তি বললেন, লোলুপ? এই শব্দটা বোধহয় আমি আগে জানতাম না।

জয়ী বলল, তোমাকে সাবধান করে দেবার জন্য... তোমার সঙ্গে দেখা করা মুশকিল, তুমি বাড়ির বাইরে যাও না, আমারও তিনতলায় যাওয়া নিষেধ... সেইজন্য টেলিফোনে... তুমি তো আমাকে ফোন করতে পারতে! তোমাকে আমার নম্বর দিলাম...

হেমকান্তি বললেন, তুমি নম্বর দিয়েছ?

জয়ী বলল, একটা কাগজে নম্বর লিখে দিইনি?

হেমকান্তির মনে পড়ল, একটা টুকরো কাগজে লেখা দশটি সংখ্যা।

হেমকান্তি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি আমার বাবার বাড়ি?

না, তোমার মায়ের। তা নিয়েই অনেক জটিলতা। সেসব তোমার এক্ষুনি জানার দরকার নেই। তা ছাড়া আর একটা কথা...

জয়ী, তুমি আমার এই উপকারটা করো না! তুমি আমার অতীতটা ফিরিয়ে দাও। কেউ আমায় সব কিছু খুলে বলছে না। এখনও আমি বুঝতে পারছি না,

আমি ঠিক কে, এতগুলো বছর কোথায় কাটিয়েছি, কী কাজ করতাম, কেন আমি হঠাৎ...

শোনো শোনো ফুলকাকা, এসব এক্ষুনি গড়গড়িয়ে বলে দেওয়া যাবে না। সবটা অনেকে জানেও না। আমি একজন শখের সাইকিয়াট্রিস্ট, অনেক সাইকোলজির বই পড়েছি। অবশ্য কোনও একসময় তোমাকে হয়তো কোনও একজন প্রপার কোয়ালিফায়েড সাইকোঅ্যানালিস্টের কাছে গিয়ে কনসাল্ট করতে হবে, তবে আমার ধারণা, একসঙ্গে অনেক কিছু বলে দিলে তোমার মাথা ঠিক নিতে পারবে না। অনেকখানি ভ্যাকুয়াম হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে সইয়ে সইয়ে তোমার অতীতটা ফিরিয়ে দিতে হবে। তোমার মনে যদি নির্দিষ্ট প্রশ্ন আসে, তুমি জিজ্ঞেস করো, আমি উত্তর দেব।

তোপচাঁচি। মাঝে মাঝেই এই নামটা শুনছি। কেন?

তোপচাঁচি নামটা আমিই বলেছি। এককালে একটা সুন্দর বেড়াবার জায়গা ছিল। একটা চমৎকার লেক, চারপাশে ছোট ছোট পাহাড়, প্রচুর গাছপালা, ভারী শান্ত, একটা প্রিস্টিন সিম্পলিসিটি অনুভব করা যেত। আমরা সেখানে একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম।

আমরা মানে, তুমি আর আমি?

ধ্যাত, তা হয় নাকি? আরও অনেকে ছিল, বুলিমাসি, টিটো তখন অনেক ছোট...

হোয়াট ইজ সো স্পেশাল অ্যাবাউট তোপচাঁচি? বেড়াতে তো লোকে অনেক জায়গাতেই যায়। তাই না?

হ্যাঁ, কিন্তু কোনও কোনও বিশেষ জায়গার কথা, কোনও বিশেষ কারণে মানুষের মনে গভীর দাগ কেটে যায়। সেবারে সেই তোপচাঁচির কথা আমার পক্ষে সারা জীবনেও ভোলা সম্ভব নয়। আমি ভেবেছিলাম, নামটা শুনলে তোমারও মনে পড়ে যাবে।

কী মনে পড়ে যাবে?

ওইখানে তুমি প্রথম আমাকে চুমু খেয়েছিলে। আমার জীবনের প্রথম...

অ্যাঁ?

তোমার কিছুই মনে নেই? ফুলকাকা, তুমিই তো আমাকে পাকিয়েছ। সব ক'টা ভাইপো-ভাইঝির মধ্যে আমিই ছিলাম তোমার সবচেয়ে ফেভারিট। আমার যখন দশ-এগারো বছর বয়েস, তুমি আমাকে কতরকম গল্প শুনিয়েছ।

তুমি ছিলে ইতিহাসের ভালো ছাত্র, তা ছাড়া পার্ট-টাইম বিপ্লবী, দেশ-বিদেশের কত কাহিনি শুনেছি, কত আদর্শের কথা। তারপর সাহিত্য, তুমি বলতে, সাহিত্যবোধ না জাগলে জীবনটাকে ঠিকমতন ভালোবাসা যায় না। আমার বারো বছর বয়সে তুমি আমাকে হ্যামলেট পড়ে বুঝিয়েছিলে, আমি কেঁদেছিলাম ওফেলিয়ার জন্য। তোমার তাও মনে নেই?

না। কোথায় হারিয়ে গেল? সত্যি, এক বিন্দুও মনে পড়ে না।

ছোটবেলা থেকেই আমার শরীরটা ছিল আমার বয়েসের তুলনায় অনেক বড়। আমার স্কুলের বন্ধুরা আমাকে বলত মেয়ে-ভীম। মেজজ্যাঠা বলতেন, হামিদা বানু। বারো-তেরো বছরে প্রথম শাড়ি পরি. তা পরে কোনও নেমন্তন্ন বাড়িতে গেলে মাসির বয়েসি মেয়েরাও আমার সঙ্গে আপনি আপনি বলে কথা বলত, শুনে আমার মজা লাগত খুব। আমার মধ্যে কিন্তু তখনও নারীত্বের ব্যাপার ঠিক জাগেনি। বুঝতাম না, ছেলেদের থেকে আমি কীসে আলাদা। তোমার গা ঘেঁষে দাঁড়াতাম। পেছন থেকে এসে তোমার গেঞ্জিপরা পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়তাম, তুমিও অনায়াসে আমার কাঁধে হাত রাখতে, কখনও পড়াশুনোর মধ্যে অন্য কথা বললে তুমি আমার কান মুলে দিতে। একবার এত জোর চুল ধরে টেনেছিলে... কিন্তু সেই তোপচাঁচির রাত্তিরে, তেমন জোৎস্না ছিল না, একটু অন্ধকার অন্ধকার, মেঘলা আকাশে চাঁদ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, লেকের ধারে আমি দুলছিলাম একটা দোলনায়, তুমি একেবারে জলের ধারে গিয়ে কী যেন দেখছিলে আর সিগারেট টানছিলে, অন্য সবাই একটু দূরে কোথাও ছিল, বোধহয় বাইরেই রান্নার জোগাড় হচ্ছিল, একসময় তুমি হঠাৎ আমার কাছে এসে দাঁড়ালে, বললে, তোকে আরও জোরে দুলিয়ে দেব? আমার সব ডিটেলস্ মনে আছে, আমি বললাম, না, আমার আস্তে আস্তে দুলতেই ভালো লাগে, ফুলকাকা, আমি তোমার সিগারেটটা একবার একটু খেয়ে দেখব? তুমি রাগ করে বকুনি দিলে না, বললে, খাবি? আচ্ছা, তার আগে তোর মুখে একটু গন্ধ করে দিই। দোলনাটা থামিয়ে দিয়ে তুমি সামনের দিক থেকে আমার জীবনে সেই প্রথম, তখন আমার বয়েস ঠিক তেরো বছর, তিন মাস, সতেরো দিন, নাইনটিনথ জুলাই, অমন সুন্দর পাহাড় ঘেরা জায়গায় আমি একটা খুকি থেকে একটা মেয়ে হয়ে গেলাম।

একটু চুপ করল জয়ী।

হেমকান্তি কল্পনায় একটা পাহাড়পরিবৃত হ্রদ দেখতে পেলেন বটে, কিন্তু সেখানে নিজেকে কিংবা জয়ীকে খুঁজে পেলেন না।

জয়ী আবার বলল, তুমি তখন খুব সিগারেট খেতে। তারপর একেবারে ছেড়ে দিয়েছিল। এতদিন পর আবার সিগারেট খেতে চাইছ, তাই আমার মনে হল, একটু উসকে দিলে হয়তো সেই সময়কার কথা তোমার মনে পড়তেও পারে। এখন বুঝতে পারছি, তোপচাঁচির কথা কেন তোমার মনে নেই। আসলে, সেদিনের সেই রাতের ব্যাপারটা আমার জীবনে একটা বিরাট ঘটনা, একটা চিরস্থায়ী স্মৃতি, কিন্তু তোমার তো তা নয়! তোমার তো ওরকম অভিজ্ঞতা আগেই অনেক হয়ে গেছে। সেই সময়েই তোমার তিন-চারজন প্রেমিকা ছিল।

হেমকান্তি আপন মনে বললেন, তিন-চারজন?

জয়ী হাসতে হাসতে বলল, ইউ ওয়্যার আ গ্রেট ফিলানডারার অ্যাট দ্যাট টাইম।

হেমকান্তি বললেন, ফিলানডারার? এই নামে বার্নার্ড শ'-র একটা নাটক আছে না?

এবার জয়ীর একটা দারুণ চমকের আঘাত পাবার পালা।

বেশ কয়েক মুহূর্ত সে স্থির চোখে চেয়ে থেকে অবিশ্বাসের গলায় বলল, বার্নার্ড শ'-র নাটকের কথা তোমার মনে আছে! অথচ হ্যামলেটের কথা...

হেমকান্তি লজ্জিতভাবে বললেন, হঠাৎ মাথার মধ্যে ঝলক দিল, আমি একটা রেল স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে বসে একটা বই পড়ছি, আর সেটা বার্নার্ড শ'-র ওই নাটক। বইটা মোটা, নিশ্চয়ই নাটকের কালেকশন।

জয়ী বলল, আশ্চর্য, আশ্চর্য! স্মৃতি ব্যাপারটা বোধহয় কোনও নিয়মের মধ্যে পড়ে না। ফিলানডারার বার্নার্ড শ'-র এমন কিছু নাম করা নাটকও নয়। ফিলানডারার শব্দটাও আজকাল তেমন চালু নয়। এখন বলে, উয়োম্যানাইজার। বাংলায় বলে মেয়েবাজ! কোনওটাই শুনতে ভাল লাগে না। শুধু মৌমাছি বললে মন্দ হয় না। কিংবা মৌমাছি পুং...

জয়ী, আমি কি মানুষটা খারাপ ছিলাম?

ভালো, না খারাপ, এটা তো বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে। তুমি বরাবরই ছিলে আমার হিরো। তবে নিরপেক্ষ বিচারে বলা যায়, এ-বাড়িতে তোমার ভাইদের মধ্যে, ইনক্লুডিং মাই বাবা, তুমিই ছিলে সবচেয়ে পরিষ্কার,

আর মুক্তমনা মানুষ। তোমার একটা আদর্শও ছিল, বিপ্লবে বিশ্বাস করতে। সাধারণত আমাদের দেশের আদর্শবাদীরা ব্রহ্মচারী থাকার ভড়ং করে, মেয়েদের পাত্তা দেয় না, কিন্তু তুমি মেয়েদের কম্প্যানি খুব পছন্দ করতে। সেটা অনেকের কাছে খুব দোষের মনে হতে পারে, কেউ কেউ হয়তো সেজন্য তোমাকে হিংসেও করত...

জয়ী, আমি তোমার প্রতি অন্যায় করেছি কিছু?

তা করেছ।

সেটাই আমার মনে হচ্ছিল এতক্ষণ। কী ধরনের অন্যায়, তা ক্ষমা পেতে পারে না?

জয়ী বেশ জোরেই হেসেই উঠল।

মেয়েদের এমন আকস্মিক হাসির মর্ম সুস্থ স্বাভাবিক পুরুষরাই বুঝতে পারে না, হেমকান্তি একেবারে হকচকিয়ে গেলেন। তাঁর মনের মধ্যে খানিকটা বিষাদ আর খানিকটা ভয় পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। একটা অনির্দিষ্ট অপরাধবোধ। এই মেয়েটি এত রাতে তাঁকে ছাদে ডেকে এনে কী বলতে চাইছে, তাও যেন ঠিক পরিষ্কার নয়।

জয়ীর হাসিটা থামাবার জন্যই তিনি খানিকটা জোর দিয়ে বললেন, তুমি কেন একবার বললে যে আমার জন্মানোটাই ভুল হয়েছে? কোনও মানুষ কি ইচ্ছে করে জন্মায়? সব মানুষই তো জন্মায় তাদের বাবা-মায়ের ইচ্ছেতে।

হাসি থামিয়ে জয়ী বলল, সবসময় বাবা-মায়ের ইচ্ছেতেও নয়। অনিচ্ছেতেও হয়। বাবা আর মা, আরও প্রিসাইজলি বলতে গেলে মেল স্পার্ম আর ফিমেল উম্ব, এর মধ্যে চলে এক্স আর ওয়াই ক্রোমোজোমের খেলা, সেই খেলার ফলাফল পিয়োর চান্স, অ্যাকসিডেন্টও বলতে পারো, সেইভাবে জন্মায় সব মানুষ। অনেক সো-কলড জনক আর জননী সন্তান চায়ও না। শুধুই খেলতে চেয়েছিল, তবু অ্যাকসিডেন্টালি জন্মে গেল একটি প্রাণ।

আমার বাবা-মা আমাকে চাননি?

তা আমি কী করে জানব! সে তো আমার জন্মেরও অনেক আগের ব্যাপার।

তা হলে?

বাবা-মা ছাড়া আরও অনেক লোক থাকে, যারা অন্য কোনও একজনের জন্মটা সহ্য করতে পারে না। যেমন ধরো মহাভারতের কর্ণ। কত লোক

ভেবেছে, এই লোকটা না জন্মালে কত দিকে কত সুবিধা হত! আমার বাবার কথাবার্তা শুনে মনে হয়, তোমার অস্তিত্ব না থাকলেই তিনি খুশি হতেন।

তাই যদি হয়, তা হলে তুমি কী একটা কাগজে আমাকে সই করতে বারণ করছ কেন জয়ী? আমি তো কিছু চাই না!

তুমি চাও না, কিন্তু আমি চাই। তুমি কিছু ছাড়বে না। তুমি বুঝতে পারছ না কেন...

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেমকান্তি বললেন, সত্যিই আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আস্তে আস্তে বলো। সিন্দবাদ, তাহেরে সফরজাদে...।

ছয়

একটা খরখর শব্দ হচ্ছে, মাঝে মাঝে বই থেকে চোখ তুলে সেদিকে তাকাচ্ছেন হেমকান্তি। একটা মোচড়ানো কাগজ, মেঝেতে পড়ে আছে, হাওয়ায় নড়ছে এদিক ওদিক।

হেমকান্তি হ্যামলেট পড়ায় মন বসাতে চাইছেন। বইখানা এ-ঘরেই ছিল, হ্যারল্ড জেনকিনসের সম্পাদনা। শুধু অন্যদের কাছ থেকে সাহায্য নিলেই হবে না, নিজেকেও একটা শৃঙ্খলার মধ্যে ফেলতে হবে। জয়ী বলল, একসময় তিনি জয়ীকে হ্যামলেট পড়ে শুনিয়েছেন, অথচ এখন তাঁর স্মৃতি থেকে এই রচনা একেবারে হারিয়ে গেল কী করে? অন্য কিছু কিছু তো মনে আছে। এমনকী হুইটম্যানের কবিতাও।

হ্যামলেট মনে নেই, এখন আবার নতুন করে পড়তে গিয়ে বুঝতে পারবেন তো? নাকি বোঝার ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে গেছে! বইটার প্রথম পৃষ্ঠা খুলতে খুলতে তাঁর এই আশঙ্কা হচ্ছিল।

দা ট্রাজেডি অফ হ্যামলেট, প্রিন্স অফ ডেনমার্ক। প্রথমে দু'জন শান্ত্রির সামান্য কথোপকথন। ইংরেজির অর্থ বোঝা যাচ্ছে, এ-বইটিতে তলায় তলায় টিকা দেওয়াও আছে। একটু একটু মনে পড়ছে গল্প, হোরেশিও ভূত দেখতে এসেছে। কিন্তু রসসাহিত্য পাঠের যে আগ্রহ সেটা জাগছে না হেমকান্তির মনে। একটু পরে পরেই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন।

মেঝেতে পড়ে থাকা কাগজটা একবার এদিক, একবার

ঘোরাফেরা করছে ঠিক যেন জীবন্ত। যেন একটা ইঁদুর। টেবিলের তলায় ঢুকেও বেরিয়ে এল, চলে গেল পায়ের পাশ দিয়ে, কিন্তু পায়ে ছোঁওয়া লাগল না। শুধু একটা কাগজ হলেও যেন ওর ইচ্ছে-অনিচ্ছে আছে।

পড়া থামিয়ে হেমকান্তি কাগজটা তুলতে গেলেন, সেটা অনেকটা দূরে সরে গেল। তবু ধরা তো পড়বেই। হেমকান্তি সেটা খুলে দেখলেন। ছাপা অক্ষর নয়, হাতের লেখা। মাত্র দুই লাইন :

আয় মন বেড়াতে যাবি, কালী—
কল্পতরু তলে গিয়ে চারিফল কুড়ায়ে খাবি

তলায় আরও একটা লাইন লেখা ছিল, সেটা ঘষে ঘষে কেটে দেওয়া। এটা কার কাগজ, এ ঘরের মধ্যে এল কী করে?

হ্যামলেটের থেকেও এই পঙ্‌ক্তি দুটি হেমকান্তিকে বেশি কৌতূহলী করে তুলল। চারিফল কী জিনিস! চেরি নামে একটা ফুল আছে না? চেরি ফলও থাকতে পারে। এখানে লিখেছে চারিফল। মানুষের মন কি আলাদাভাবে বেড়াতে যায়?

এর পরেই হেমকান্তির একটা অদ্ভুত কথা মনে হল। তাঁর মনও বোধহয় তাঁকে ফেলে অন্য কোথাও বেড়াতে চলে গেছে। তাই খাঁচার মতন এই শরীরটা ফাঁকা। মানুষের মন তো থাকে মাথায়, তাই মাথাটাও শূন্য, আর শূন্য বলেই যখন তখন টলমল করে। কাল যেমন ছাদে গিয়ে আকাশের দিকে তাকাতেই মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন।

এই যে কাগজের টুকরোটা, এটাও কি কারও মন? ঘরের মধ্যেই বেড়াচ্ছে। বাইরে না গেলে কোনও গাছতলায় বসবে কী করে? আলতো করে ধরে, ঠিক একটা পাখির মতন, কাগজটাকে জানলা দিয়ে উড়িয়ে দিলেন হেমকান্তি।

দরজার কাছ থেকে টিটো জিজ্ঞেস করল, কী ফেলে দিলে ছোটমামা?

হেমকান্তি বললেন, একটা কাগজ, তাতে লেখা, আয় মন বেড়াতে যাবি। কাগজটা এ ঘরে এল কী করে?

এ-প্রশ্নে গুরুত্ব না দিয়ে টিটো বলল, কাগজ টাগজ রাস্তায় ফেলো না। পাড়ার লোক আপত্তি করে। ওই তো একটা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট রয়েছে। শোনো, তোমার সঙ্গে কি মেজমামুর কিছু আলোচনা হয়েছে?

হেমকান্তি বললেন, মেজমামু মানে, ওই ঘরের আমার এক দাদা?

সকালবেলা শুধু একবার বললেন, তোর বাথরুমে এতক্ষণ ধরে জল পড়ার শব্দ হয় কেন? হয়তো আমি কল বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলাম।

টিটো বলল, আর কিছু না? যাই হোক, তোমাকে কয়েকটা কথা জানানো দরকার। তোমার ব্যাঙ্কের পাস বইটা দাও, আপ টু ডেট করে আনতে হবে। তোমার চিকিৎসার জন্য বেশ কিছু খরচ হচ্ছে, আরও ওষুধ কিনতে হবে, পরশুদিন একজন ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়েছে, মেজমামু ফ্যামিলি ফান্ড থেকে এইসব খরচ দিতে রাজি নন। তোমার নার্সিংহোমের টাকা রত্নেশমামা মিটিয়ে দিয়েছেন। তোমাকে এবার ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে হবে।

হেমকান্তি বললেন, তুমি টিটো, তোমার ভাল নাম, ইয়ে, মহাকাল, তুমি আমার এক বোনের ছেলে, রাইট?

টিটো বলল, মহাকাল! মহাকাল আবার মানুষের নাম হয় নাকি? আমার নাম মহাকাশ। শুধু আকাশও বলতে পারো।

আই অ্যাম সরি টিটো। মহাকাশ, মহাকাশই ভাল, আর ভুল হবে না। এবার বলো তো ওই রত্নেশ আমার কে হয়?

রত্নেশমামা তোমার এক জ্যাঠতুতো ভাই। চশমার ফ্রেমের ব্যাবসা করেন, খুব শাকসেসফুল।

সে এ-বাড়িতে থাকে না?

তার একটা নিজস্ব ঘর আছে। তবে নিজে আলাদা বাড়ি করেছে সল্ট লেকে।

আর দোতলায় থাকে আমার আর এক ভাই। তার মেয়ে জয়ী। তার আর ছেলেমেয়ে নেই?

জয়ীর দুটি বোন আছে। একজন বাঙ্গালোরে...

হাতে দু'কাপ কফি নিয়ে ঝিল্লি এসে বলল, ভিজিটর! ভিজিটর!

টিটো মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী বলছিস?

আজ ঝিল্লির সালোয়ার-কামিজের রং দু'রকম। তলারটা ঘি রঙের, ওপরেরটা সোনালি। গলায় ঝুলিয়েছে একটা পোড়ামাটির গয়না।

কাপ দুটো টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে সে বলল, এ-বাড়ির ছোটকত্তাটির কাছে তিনজন ভিজিটর এসেছে। দেখা করে কথা বলতে চায়।

হেমকান্তি জানতে চাইলেন, কার কাছে?

ঝিল্লি বলল, ফর ইউ, স্যার।

হেমকান্তি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, না, না।

টিটো জিজ্ঞেস করল, ভিজিটর মানে কারা? তুই চিনিস?

ঝিল্লি বলল, হ্যাঁ, চিনি। পাড়ার লোক। বোসদা, সরকারবাড়ির সুফলদা, আর একজনকে আগে দেখিনি। নীচের ঘরে বসিয়েছি।

ভিতু, অপরাধীর মতন হেমকান্তি বললেন, আমি যাব না। আমি যাব না, আমি চিনতে পারব না।

হাতের তালু দিয়ে চিবুকটা ঘষতে ঘষতে টিটো একটু চিন্তা করে বলল, পাড়ার লোক, একেবারে ফিরিয়ে দেওয়াটা ঠিক হবে না। বোসদাকে এখানকার সবাই খুব মানে।

কিন্তু আমি কী কথা বলব?

চলো না, আমিও সঙ্গে থাকব। দু'-চারটে কথা বলবে।

না, প্লিজ না। তুই গিয়ে বল, আমি অসুস্থ, বিছানায় শোওয়া।

ঝিল্লি বলল, তা হলে যদি ওরা ওপরে এসে দেখা করতে চায়?

টিটো হেমকান্তির বাহু ছুঁয়ে বলল, দু'মিনিট কথা বললে ঝামেলা চুকে যাবে। ঝিল্লি, ওদেরও কফি দেবার ব্যবস্থা কর।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় হেমকান্তির হাত ধরেই রইল টিটো।

তিনজন দর্শনার্থী তিন বয়েসি। মধ্যবয়েসি ব্যক্তিটি বেশ বলশালী, ধুতি ও বোতাম খোলা হাফ হাতা সাদা পাঞ্জাবি পরা, ইনিই বোসদা। অপেক্ষাকৃত প্রবীণটির চোখে রঙিন চশমা, প্যান্ট-শার্ট পরা তরুণটি দাঁড়িয়ে আছে।

বোসদা ঘনিষ্ঠভাবে বললেন, এসো হেম, অনেকদিন পর দেখা, তুমি তো থাকোই না এখানে।

হেমকান্তি তিনজনের দিকেই তাকিয়ে হাত জোড় করে বললেন, নমস্কার।

বোসদা হেসে বললেন, দেখা না হলে এমনই হয়। তুমি আর আমি একসঙ্গে ক্রিকেট খেলেছি, মনে নেই?

তরুণটি বলল, হেমকাকা, আমার বাবা আপনার কথা খুব বলতেন, আমার বাবার নাম প্রশান্ত সরকার, আমার নাম সুফল।

সে এসে প্রণাম করল হেমকান্তির পা ছুঁয়ে।

টিটো বলল, রাস্তায় একটা প্যান্ডেল বাঁধা হচ্ছে দেখছি। এখন কীসের পুজো?

বোসদা বললেন, পুজো নয়। অনেকটা ওইজন্যই এসেছি। আগামীকাল ওখানে বরুণদার স্মরণসভা হবে। সেই সঙ্গে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প। আমাদের যাদের বয়েস পঁয়ষট্টির নীচে, সবাই ব্লাড ডোনেট করব। আর কিছু খরচও আছে। সব বাড়ি পিছু দুশো টাকা চাঁদা। যারা পারবে, দেবে। জোরজারির কিছু নেই।

টিটো বলল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। চাঁদা দেব না কেন?

বোসদা বললেন, আর বরুণদার স্মরণসভায় হেমকান্তিকে কিছু বলতেও হবে। ওকে স্টেজে বসাব।

হেমকান্তি জানেন না বরুণদা কে। এই বোসদা নামে ব্যক্তিটিকেও তিনি যেন এই প্রথম দেখছেন।

সুফল বলল, হেমকাকা, আপনি অনেকদিন ছিলেন না, আপনাকে আমি এত ছোট বয়েসে দেখেছি, মনেই নেই ভালো।

টিটো বলল, উনি মাঝে মাঝে এসেছেন দু'-চার দিনের জন্য...

পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে হেমকান্তির দিকে বাড়িয়ে দিলেন বোসদা।

হেমকান্তি দু'দিকে মাথা নাড়লেন।

ছেড়ে দিয়েছ, ভালো! বলে একটা সিগারেট বার করে চেয়ারের হাতলে ঠুকতে ঠুকতে বোসদা বললেন, এ-ঘরটা অনেকদিন ব্যবহার হয় না, না? একসময় এ-ঘরে কত আড্ডা দিয়েছি। তুমি তখন অত্যধিক সিগারেট খেতে, তাই না হেম?

বিস্মৃতির অন্ধকারে হাতড়াবার চেষ্টা না করে হেমকান্তি কায়দা করে বললেন, সে কতদিন আগেকার কথা।

ঝিল্লি জিজ্ঞেস করল, সবাইকার কফিতে দুধ-চিনি?

বোসদা বললেন, বরুণদাও এ-ঘরে কিছুদিন ক্লাস নিয়েছেন, ওপর থেকে খাবার আসত। এ-বাড়ির খাস্তা কচুরি খুব বিখ্যাত ছিল। টিটো, তুমি তো তখন এখানে থাকতে না।

টিটো বলল, আমি তো মাত্র দু'বছর আগে বিহার টিমে খেলতাম।

সুফল বলল, কাল আমরা শুরু করব ঠিক এগারোটায়। মেয়র তার আগে আসতে পারবেন না। তিন-চারটে স্কুলকে খবর দিয়েছি। স্মরণসভা বেশি লম্বা করা হবে না। তিনজন বক্তা, মৃণাল সেন, বোসদা আর আপনি। আপনাদের তিনজনকে একসঙ্গে ডায়াসে বসাব।

বোসদা মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বললেন, ডায়াস আবার কী? ডেইস। যদি ইংরেজি বলতেই হয়, ঠিকঠাক বলবি। নইলে মঞ্চ বললেই হয়।

সুফল এমনভাবে তাকাল যেন বোসদাকে সে অগাধ শ্রদ্ধা করলেও এটা সে বিশ্বাস করতে পারছে না। ডায়াস ভুল? সারাজীবন শুনে আসছে।

হেমকান্তি আতঙ্কিতভাবে বললেন, আমি মঞ্চে বসব? আমি, মানে, আমি কী বলব...

টিটো তাড়াতাড়ি বলল, উনি মঞ্চে বসতে পারবেন না। মানে, ওঁর অভ্যেস নেই...

বোসদা বললেন, অভ্যেস নেই মানে! হেমকান্তি লাহিড়ী ইজ আ ভেরি গুড অরেটর। বরুণদার সঙ্গেও অনেকবার বাইরে বাইরে ঘুরেছে, ও অনেক কিছু জানে।

টিটো বলল, হ্যাঁ, মানে, এখন ওঁর শরীর খুব খারাপ।

হেমকান্তিও সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আমি সত্যিই খুব অসুস্থ।

বোসদা গম্ভীরভাবে বললেন, হ্যাঁ, আমি শুনেছি, তোমাকে নার্সিংহোমে পাঠাতে হয়েছিল। ভুল করে বিষ খেয়েছিলে। হ্যাঁ, ভুল করে, তাই না? সেইটা ভাবাই সব দিক থেকে ভালো।

টিটো বলল, এখনও ভেতরে ভেতরে বেশ দুর্বল। অনেক ওষুধ খেতে হচ্ছে।

বোসদা বললেন, অ্যাপারেন্টলি তো ঠিকই আছে দেখছি। ভেতরের দুর্বলতা থাকলে সেটা কাটাবার উপায় কি সর্বক্ষণ বাড়িতে বসে থাকা? হাঁটতে চলতে পারে, বাইরে বেরুবে না কেন? নর্মাল হতে গেলে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা দরকার।

প্রবীণ ব্যক্তিটি এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবারে কাছে এসে তিনি প্রথমে হেমকান্তির একটা বাহু ছুঁলেন, তারপর তাঁর বুকে হাত বুলোতে লাগলেন।

ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল, তিনি অন্ধ।

এখন হাত বুলোচ্ছেন হেমকান্তির মুখে, তিনি একটু সরে যাবার চেষ্টা করলেন।

অন্ধ ব্যক্তিটি মৃদু স্বরে বললেন, হেম, আমি একবার শুনেছিলাম, তুমি আর বেঁচে নেই। শুনে খুব কষ্ট হয়েছিল। অনেকদিন তোমার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। এখন তো দেখছি, তুমি বেশ ভালোই আছ, হেম।

অন্ধরাও 'দেখছি' শব্দটি ব্যবহার করেন।

হেমকান্তি অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, আপনি...

অন্ধ ব্যক্তিটি বললেন, আমায় চিনতে পারোনি? বেশি দেখোনি অবশ্য। আমি নিরঞ্জন ঘোষাল। মানুষকে ছুঁয়েই আমি তার ভেতরের দুঃখ-কষ্ট টের পাই। বুঝতে পারছি, বরুণের কথা শুনে তোমার মনটা খুবই উতলা হয়ে উঠেছে।

টিটো জিজ্ঞেস করল, উনি কোন বাড়িটায় থাকতেন? আমি তো ওঁকে দেখিনি কখনও।

বোসদা বললেন, তুমি দেখবে কী করে? তুমি তো মাত্র দু'বছর এ-পাড়ায়...বরুণদা খুন হয়েছেন পাঁচ বছর আগে, আগামীকাল ওঁর ফিফথ ডেথ অ্যানিভার্সারি...

নিরঞ্জন ঘোষাল বললেন, হেম, একেবারে শেষ সময়ে তুমিই তো বরুণের পাশে ছিলে। শেষ মুহূর্তগুলোর কথা তুমি ছাড়া আর তো কেউ জানে না। সেইটুকুই তুমি বলবে।

হেমকান্তি অবুঝ শিশুর মতন মাথা নেড়ে বললেন, না, আমি পারব না। আমি কিছু বলতে পারব না!

এর মধ্যে ঝিল্লি ফস করে বলে উঠল, অত ভয় পাচ্ছ কেন? মিনিট দশেক তো বলতেই পারো। তোমার কাছ থেকে ফার্স্ট হ্যান্ড রিপোর্টই সবাই শুনতে চাইবে।

হেমকান্তি আর টিটো দু'জনেই সঙ্গে সঙ্গে তাকাল ঝিল্লির দিকে। তার এরকম কথা বলা আস্পর্ধার মতন। সে মুচকি মুচকি হাসছে।

নিরঞ্জন ঘোষাল বললেন, তুমি পারব না বলছ কেন হেম? তার মানে, তুমি কি বলতে চাও না?

হেমকান্তি বললেন, আমি কিছু জানি না।

কিছু জানো না! তুমিই তো সঙ্গে ছিলে। শান্ত হও হেম, অনেকদিন তো কেটে গেছে।

নিরঞ্জন ঘোষালের কণ্ঠস্বরে কিছু একটা আছে, যাতে চঞ্চল হয়ে টিটো বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি ছোটমামাকে কাল নিয়ে যাব।

এই সময়ে ওপরের সিঁড়ি দিয়ে জুতোর শব্দ করে নেমে এলেন, এ বাড়ির দোতলার অধিপতি পিনাকেশ লাহিড়ী। ফিনফিনে ধুতি পরা, এক হাতে কোঁচা, দুধসাদা পাঞ্জাবি, বাঁ হাতে সোনালি ঘড়ি। বাইরে বেরুতে হলে তাঁকে

এই ঘরের মধ্যে দিয়েই যেতে হবে, তিনি কারও প্রতি দৃকপাতও না করে চিবুক উঁচিয়ে চলে গেলেন।

বোসদা টিটোকে জিজ্ঞেস করলেন, কথা বন্ধ?

টিটো বলল, না তো! ব্যস্ত আছেন নিশ্চয়ই।

বোসদা সুফলকে বললেন, এই দৌড়ে যা তো! ওঁর কাছ থেকে দুশো টাকা চেয়ে নে। হেম, তোমাদের আর টাকা দিতে হবে না। উনি আমাদের সঙ্গে কথা বললেন না, এ-বাড়ির চাঁদাটা ওঁর কাছ থেকেই নেব।

টিটো বলল, না, না, আমরাও দেব। ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প খুব ভালো কাজ।

বোসদা বললেন, ঠিক আছে, কাল এগারোটায়। চলুন নিরঞ্জনদা...

নিরঞ্জন ঘোষাল আবার হেমকান্তির গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, ভালো থেকো হেম।

হেমকান্তি এবার রীতিমতন কেঁপে উঠলেন। তাঁর একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। এই অন্ধ মানুষটি যেন তাঁরই পরিপূরক হয়ে এসেছেন। ওঁর দৃষ্টি নেই, তাঁর মন নেই। উনি কি জানেন, হেমকান্তির চেহারা কী রকম? গায়ে হাত দিয়ে কতটা বোঝা যায়?

মানুষের আকৃতি কী রকম, তাও কি উনি বোঝেন? কেমন হয় বাড়ি-ঘর? এই ঘরটার সঙ্গে অন্য ঘরের তফাত? আর হেমকান্তি এই নিরঞ্জন ঘোষাল কিংবা বোসদা নামে ব্যক্তিটিকে স্পষ্ট দেখতে পেলেও এঁদের সম্পর্কে তাঁর মনে কোনও ছাপ নেই।

অন্যরা বেরিয়ে যাওয়ামাত্রই টিটো ঝিল্লির কাঁধ খিমচে ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, অ্যাই, তুই আমাদের কথার মাঝখানে কথা বলতে গেলি কেন রে?

ঝিল্লি তার মুখের হাসি বিস্তৃত করে বলল, আমি কথা বলতে পারব না, এমন কোনও শর্ত আছে নাকি? আমার ফ্রিডম অফ স্পিচ নেই?

তা বলে কিছু না বুঝেশুনে, আলটপকা একটা কিছু বলে দিলেই হল!

বুঝেশুনেই বলা হয়েছে স্যার। বোসদা তো ঠিকই বলেছেন। দিনের পর দিন বাড়িতে বসে থাকলে কি স্যারের অসুখ সারবে? রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হবে, মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে। সাত-আট দিন হয়ে গেল, বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছে, এর মধ্যে একজন ডাক্তারও আসেনি। মাঝে মাঝে কিন্তু ওঁর মেন্টাল কন্ডিশন আগের থেকেও খারাপ হচ্ছে। কালকে ডিম কথাটা উচ্চারণ করতে

পারছিলেন না, ডিম কিংবা এগ, কোনওটাই না, অথচ দ্বিতীয় দিনেই পেরেছিলেন।

সেটা আলাদা। উনি যদি বরুণবাবু সম্পর্কে সব ভুলে গিয়ে থাকেন, তা হলে তাঁর স্মৃতিসভায় কী বলবেন? তোর অত পাকামি করার কী দরকার ছিল?

শোনো মার্শাল টিটো, তোমরা একটা ব্যাপার বুঝতে পারোনি। ওই বোসদারা আগে থেকেই ঠিক করে এসেছিলেন, বরুণদা নামে কারওর একজনের স্মরণসভায় আমাদের স্যারকে দিয়ে কিছু বলাবেন। তোমরা যত না না করতে, ওঁরা তত ইনসিস্ট করতেন। উনি কেন বলতে রাজি নন, সেটা ঠিক বোঝাতে পারতে? অনেকটা সময় আছে, এর মধ্যে এই বরুণদা সম্পর্কে কিছুটা ফ্যাক্ট জেনে নিলেই হয়।

কী করে সেটা জানা যাবে শুনি?

কাছেই ন্যাশনাল লাইব্রেরি। সেখানে চলে যাও, পুরনো খবরের কাগজ দেখো। পাঁচ বছর আগে খুন হয়েছিলেন, নিশ্চয়ই কোনও ইম্পর্ট্যান্ট লোক, কাছাকাছি তারিখের খবরে নিশ্চয়ই কিছু খবর থাকবে!

আমি এখন লাইব্রেরিতে গিয়ে পুরনো কাগজ ঘাঁটব? আমার আর কাজ নেই!

ওদের থামিয়ে দিয়ে হেমকান্তি বললেন, খবরের কাগজের খবর দেখে কি স্মৃতি, স্মৃতি, কী যেন বলে...

ঝিল্লি বলল, স্মৃতিচারণ।

হ্যাঁ, স্মৃতিচারণ করা যায়? ও তো সবাই জানে। তোমরা বিশ্বাস করো, ওই বরুণদা কে, আমি নাকি তার সঙ্গে ছিলাম, একেবারে টোটাল ব্ল্যাঙ্ক! এই নিরঞ্জন ঘোষালই বা কে, ওঁকে দেখে কেন আমার ভয় করছিল?

টিটো বলল, উনি বোধহয় এ-পাড়ার নন। আমি এর মধ্যে এক দিনও দেখিনি।

হেমকান্তি বললেন, উনি যখন আমাকে ছুঁয়ে ছিলেন, যেন আমার ভেতরের সব কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন। অন্ধ মানুষেরা বাইরের কিছু দেখতে পায় না, অথচ ভেতরটা দেখতে পায়, এটা কি সত্যি? এদিকে আমি যে আমার নিজের ভেতরের কথা অনেক কিছুই জানি না!

ঝিল্লি তার কমলার কোয়ার মতন নীচের ঠোঁট উলটে বলল, গা ছুঁয়েই সব

বোঝা যায়, এ আমি বিশ্বাস করি না। তা হলে তো খুনিটুনিদের ধরে আসল ব্যাপারটা জানার জন্য পুলিশরা অন্ধদের সাহায্য নিত!

টিটো বলল, ওসব কথা থাক। ওই বরুণদা ভদ্রলোক সম্পর্কে একটা নোট তো তৈরি করতে হবে। মেজমামু নিশ্চয়ই জানবেন কিছু কিছু। ঝিল্লি, তুই কায়দা করে মেজমামুর সঙ্গে গল্প করতে করতে...

ঝিল্লি বলল, হুঁ! মেজমামু ভারি গল্প করার লোক। সবসময় বকাবকির মুডে থাকেন। বরং রত্নেশকাকাকে ডাকো। জয়ীদিদিও অনেক কিছু বলতে পারবেন।

টিটো বলল, আমাকে এখন বেরোতে হবে। তুই দ্যাখ চেষ্টা করে, কতদূর কী পারিস!

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দোতলায় থেমে গিয়ে হেমকান্তি ডাকলেন, জয়ী, জয়ী!

একটি কাজের মেয়ে বেরিয়ে এসে বলল, দিদি নেই। চন্দননগরে গেছে।

পেছনে একটা দরজার কাছে দেখা গেল বনানীকে। তিনি কোনও কথা না বলে মিলিয়ে গেলেন ভেতরে।

ওপরের বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসে আছেন মেজবাবু। পাড়ার লোক ওঁকে বলে কান্তবাবু। আসলে পুরো নাম অয়স্কান্ত লাহিড়ী। ওঁর দাদা, যিনি বেঁচে নেই, এ-বাড়ির বড়ছেলে, তাঁর নাম ছিল সুবর্ণকান্তি বা সোনাবাবু। পাড়ার লোকেরা এ-বাড়িকে লাহিড়ীবাড়ি বলে না, এখনও বলে সোনাবাবুর বাড়ি, যে-সোনাবাবু কংগ্রেস আমলে কিছু দিনের জন্য উপমন্ত্রী হয়েছিলেন।

হেমকান্তির সঙ্গে চোখাচোখি হলে মেজবাবু প্রতিবার একই প্রশ্ন করেন, কী রে, আজ ভালো আছিস তো?

এর উত্তরে একইভাবে মাথা নেড়ে হেমকান্তি বলেন, হ্যাঁ, তুমি কেমন আছ, মেজদা?

মেজবাবুর তার পরের কথাটাও বাঁধাধরা, আমার আর থাকা না থাকা! শুধু মায়ার বন্ধন!

তারপর আপন মনে বিড়বিড় করে বলেন, হারামজাদাটা আজও কোনও খবর দিল না!

উক্ত হারামজাদা তাঁর নাতি সোমশঙ্কর, সে থাকে আফ্রিকার কেনিয়ায়।

এ-মাসেই নাকি তার একবার কলকাতায় ফেরার কথা, ফোনে জানিয়েছিল, তারপর আর কোনও পাত্তা নেই।

হেমকান্তিকে তাঁর ঘরে পৌঁছে দেবার পর ঝিল্লি বলল, আজ বিকেলে তোমাকে নিয়ে একটু বেড়াতে বেরুব। তোমার বাইরে যেতে ইচ্ছে করে না?

হেমকান্তি বললেন, হ্যাঁ, ইচ্ছে করে। কিন্তু এখনও মাথাটা হঠাৎ হঠাৎ দুলে ওঠে।

ঝিল্লি বলল, তাতে কিছু হবে না। আমি তো তোমার পাশেই থাকব। কিন্তু আমার অন্য একটা চিন্তা হচ্ছে। তুমি নতুন করে যা শিখছ, তাও কিছু কিছু আবার ভুলে যাচ্ছ কেন? ডিম বলতে পারোনি। টিটোর নাম তুমি কী করে বললে, মহাকাল! মহাকাল আর মহাকাশ এক?

মহাকাশ তালব্য শ, না দন্ত্য স?

তার মানে তুমি আকাশ বানানও ভুলে গেছ। তোমাকে একটা ডিকশনারি দিতে হবে। এটা কী বলো তো?

সে তার ডান হাতটা তুলে ধরল হেমকান্তির মুখের সামনে। সে হাতে কিছু নেই, পাঁচটা আঙুল ছড়ানো।

এটা তোমার হাত।

না, ঠিক হল না। হাত নয়, হাতের পাঞ্জা। একেবারে ছোট আঙুলটাকে কী বলে?

ছোট আঙুল?

হ্যাঁ, এটাকে বলে কড়ে আঙুল। আর এই যে মোটা আঙুলটা, ইংরিজিতে থাম্ব। বাংলায় এর নামটা বিশ্রী। বুড়ো আঙুল। এই নামটা চেঞ্জ করা দরকার। একটা বাচ্চা ছেলে কিংবা মেয়ে, তার এই আঙুলটাও কেন বুড়ো আঙুল হবে?

তুমি যে ওদের বলে দিলে, কাল আমাকে বক্তৃতা করতে হবে, কিন্তু আমি... আমি...

অত ভয় পাচ্ছ কেন? ঠিক পরীক্ষার আগের দিন বাচ্চা ছেলেমেয়েরা যেমন ভয় পায়... যা পারবে বলবে, না পারলে বলবে, কিছু মনে নেই। স্বীকার করতে লজ্জার কী আছে? ট্রুথ ইজ অলওয়েজ বিউটিফুল! আমারও তো ইচ্ছে করে, অতীতটা একেবারে যদি ভুলে যেতে পারতাম!

তোমার অতীত তো খুবই ছোট্ট ঝিল্লি।

সূচও তো ছোট। একটা ছোট্ট কাঁটা যদি চোখের মধ্যে ঢুকে যায়...

তুমি তো তোমার অতীত ভুলে যাওনি। আমাকে কিছু কিছু বলবে? এ-বাড়ির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী?

শুনবে? একবার খুব বৃষ্টির দিনে একটা বেড়ালের বাচ্চা কী করে যেন এ-বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে। খুবই বাচ্চা, সবেমাত্র চোখ ফুটেছে, অনবরত মিউ মিউ করে ডাকে। এ-বাড়ির কেউ বেড়াল পছন্দ করে না, এক লাথি মেরে বাচ্চাটাকে বাইরে ফেলে দেওয়াই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু বেড়াল বাচ্চাটা চিত হয়ে শুয়ে পড়ে অসহায়ভাবে হাত-পা নাড়তে লাগল, সমুদ্রের দু'ফোঁটা জলের মতন নীল চোখ, তাই এ-বাড়ির গিন্নি মায়া করে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলেন, তারপর থেকে বাচ্চাটা এ-বাড়িতে রয়েই গেল!

সেই বেড়ালটা এখন কোথায়? ও, তুমি হাসছ? আমি বুঝতে পারিনি। এটা একটা রূপ, রূপ, রূপক। বেড়াল বাচ্চাটার মতনই তুমি এ-বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছ?

ইয়েস স্যার!

না, আমি এটা বিশ্বাস করি না। তুমি একটা গল্প বানালে। তুমি একজন অ্যাকমপ্লিশড মেয়ে। লেখাপড়া জানো। অথচ তুমি একটা কাজের মেয়ের মতন, একজন মেড সারভেন্টের মতন...নো, দিস ইজ অ্যাবসার্ড।

বারান্দা থেকে মেজবাবু ঝিল্লিকে ডাকলেন।

ঝিল্লি বলল, আবার পরে কথা হবে। এখন তুমি হ্যামলেট পড়ো।

বিকেলে বেড়াতে যাওয়া হল না, আজও বৃষ্টি নেমেছে।

ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের পরীক্ষাভীতির তুলনাটা ঠিকই দিয়েছে ঝিল্লি। সেইরকমই বোধ করছেন হেমকান্তি, যেন প্রশ্নপত্র এসে গেছে, তিনি এক লাইনও লিখতে পারছেন না, যেন মঞ্চের ওপর বসানো হয়েছে কয়েকজনকে, হেমকান্তির নাম ডাকা হল, তিনি মাইকের সামনে গিয়ে নির্বাক। শত শত শ্রোতা উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে...।

জয়ীর দেওয়া চিরকুটটা রয়ে গেছে ড্রয়ারে। দু'বার তাকে ফোন করবার চেষ্টা করলেন হেমকান্তি, দু'বারই শোনা গেল, উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে এখন পাওয়া যাবে না। অথচ আজ জয়ীর সঙ্গে কথা বলার খুবই প্রয়োজন ছিল।

কয়েক দিন ধরে হেমকান্তিকে আর ঘরে খাবার দেওয়া হচ্ছে না। তাঁকেই যেতে হয় খাবারঘরে। দু'বেলা নির্দিষ্ট সময়ে একজন বয়স্কা স্ত্রীলোক ডাকতে

আসে। খাবারঘরটিও বেশ বড়, এদিকেও একটা বারান্দা আছে। রান্নার জায়গাটা নতুন।

হেমকান্তি যখন খেতে আসেন, তখন প্রায়ই আর কেউ থাকে না। মেজবাবু প্রতি রাত্রে শুধু দুধ-মুড়ি খান বারান্দায় বসে। টিটো মাঝে মাঝে সঙ্গ দেয় হেমকান্তিকে, আজ সে নেই। ঝিল্লিই সাধারণত পরিবেশন করে, গল্প করে, সেও নেই আজ। সরমা সব কিছু এনে দিল, সে সবসময়ই নিঃশব্দ। এই তিনতলাতে আরও দু'-তিনজন অধিবাসীর অস্তিত্ব টের পেয়েছেন হেমকান্তি, কিন্তু তাদের কেউই আলাদাভাবে কথা বলেনি তাঁর সঙ্গে। টিটো একদিন বুঝিয়ে বলেছিল, এখানকার রান্নাবান্নার খরচ আসে ফ্যামিলি ফান্ড থেকে, এই বাড়িখানা ছাড়াও লাহিড়ী পরিবারের দুটি ভাড়াবাড়ি আছে, আর একটি ছোট বাজারের আংশিক মালিকানা। রান্নার পদ অনেক দিন ধরেই ঠিক করা আছে, তবে কেউ ইচ্ছে করলে নিজের পছন্দমতন খাবারও আনাতে পারে। যেমন মেজবাবু মাঝে মাঝে রাবড়ি আনান উত্তর কলকাতার এক বিখ্যাত মিষ্টির দোকান থেকে, নিজের খরচে, কিন্তু অন্যদেরও দেওয়া হয়।

আজ এত উদ্‌বেগের মধ্যে থেকেও, আশ্চর্য ব্যাপার, রাত্তিরে বেশ খিদে বোধ করলেন হেমকান্তি। অন্যদিনের তুলনায় দুটো রুটি বেশি খেলেন দই-বেগুনের তরকারির সঙ্গে। আজ ওপরতলাটা যেন বেশি বেশি নিঃশব্দ। তিনি নিজের খাওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন।

আরও একখানা রুটি খাবেন কি না ভাবছেন, সরমা একটা প্লেটে দুটি মিষ্টি এনে দিল, চ্যাপটা, গোলাপি রঙের। রুটির বদলে সে দুটোও খেলেন তিনি।

ওঠার ঠিক আগে এল ঝিল্লি। একটা ডোরাকাটা ম্যাক্সি পরা, হাতে ছোট্ট রুপোর রেকাবিতে কয়েকটি ওষুধ। সকালে ও রাতে এই ওষুধ খাওয়ানোর দায়িত্ব ঝিল্লির। তার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন হেমকান্তি। চোখ দুটো ফুলো ফুলো, ভেতরে গোলাপ-বর্ণ। যেন এক্ষুনি কাঁদছিল সে। ঝিল্লির এ-মুখ তিনি আগে দেখেননি, সে সবসময়ই উৎফুল্ল আর কৌতুকপরায়ণ। কী হয়েছে তার? কিন্তু মানুষকে মন-খারাপের কথা জিজ্ঞেস করতে নেই, এটা হেমকান্তি পূর্ব-অনুভূতি দিয়ে বোঝেন।

ধরা গলায় ঝিল্লি বলল, আজ একটা ঘুমের ওষুধও দিয়ে দিয়েছি। নইলে তোমার রাত্তিরে ঘুম হবে না। এখনই সব খেয়ে নাও। সরমার হাত দিয়ে একটা কাগজ পাঠিয়ে দিচ্ছি, পড়ে নিয়ো।

মন খারাপ হলে যে কারও কাছে সান্ত্বনা চাইতে আসবে, সেরকম সম্পর্ক হেমকান্তির সঙ্গে হয়নি ঝিল্লির। তবু হেমকান্তি নিজের ঘরে এসে দরজার দিকে চেয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। আশা করেছিলেন, কিছু না কিছু বলার জন্য ঝিল্লি অন্তত আর একবার আসবে।

এল না। তার বদলে সরমা রাত্রের জলের বোতলের সঙ্গে একটা কাগজ দিয়ে গেল। একটা মাত্র পাতা। তাতে লেখা :

বরুণদা, পুরো নাম বরুণ ঘোষ দস্তিদার।

তেত্রিশ নম্বর বাড়ি, সাদা রঙের, লোহার গেট, পাশে একটা চাঁপা ফুলের গাছ। সারা বছরই ওই গাছে ফুল ফোটে।

ঘোষ দস্তিদারদের একটা বড় বইয়ের দোকান আছে কলেজ স্ট্রিটে। আর একটা বর্ধমানে। উনি নিজে অবশ্য এ ব্যাবসা দেখতেন না। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক। (এখানে ইতিহাস কেটে লেখা হয়েছে ইকনমিক্স)। পাড়ার অনেকের উপকার করতেন, পেয়ারাবাগান বস্তিতে কী সব কাজটাজ। বয়েস পঞ্চান্ন, যতদূর জানা যায় নট ম্যারেড। সবাই জানত ভালো লোক। পুরুলিয়ার বান্দোয়ানে খুন হন ২৩ ফেব্রুয়ারি। সামনাসামনি গুলি। সঙ্গে ছিলেন দু'জন, তাদেরও একজনের পায়ে গুলি লাগে, অন্যজনের কথা জানা যায় না।

যার পায়ে গুলি লেগেছিল, সেই-ই কি হেমকান্তি লাহিড়ী?

•

হেমকান্তি লেখাটা তিনবার পড়লেন। এটুকু পড়ে একজন মানুষ সম্পর্কে কতখানি জানা যায়? মানুষটাকে দেখতে কেমন ছিল, বেঁটে, না লম্বা? পাতলা, না ভারী চেহারা? মাথার চুল, মুখটা না জানলে কি একজন মানুষ সম্পর্কে বোঝা যায়? কেন খুন হলেন, তা জানা যায়নি এত দিনে?

হেমকান্তি নিজের পায়ের দিকে তাকালেন। তাঁর পায়ে গুলি লেগেছিল? কোনও চিহ্ন নেই। এত বড় ঘটনা, তার কিছুই মনে থাকবে না? নিশ্চয়ই ওঁদের ভুল হয়েছে, হেমকান্তি ছিলেন না সেখানে। বান্দোয়ান? আগে কি এ নাম শুনেছেন?

ঝিল্লি কখন এসব তথ্য সংগ্রহ করল? বরুণদা নামে লোকটি কি গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গে মারা গিয়েছিলেন, না হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? সবাই যাঁকে ভাল লোক বলে জানত, তাঁকে হঠাৎ কেউ গুলি করবে কেন?

ডাকাতদের ব্যাপার? কয়েক দিন খবরের কাগজে এরকম ঘটনা দেখা যাচ্ছে, দিনেরবেলা গয়নার দোকানে ঢুকে কয়েকটি ছেলে এক মহিলাকে গুলি চালিয়ে মেরে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল। মানুষ মারা এত সোজা?

ঝিল্লি আজ কাঁদছিল কেন?

এই লেখাটিতে একটি মাত্র অপ্রয়োজনীয় তথ্য আছে। একটা চাঁপাগাছে সারাবছর ফুল ফোটে। এই রাতেও কি সে গাছটায় ফুল ফুটে আছে? একবার গিয়ে দেখলে হত।

লেখাটা মুখস্থ করার চেষ্টা করতে লাগলেন হেমকান্তি। কিছু না বলার চেয়ে... বাকিটা বলবেন, আর কিছু ঠিক মনে পড়ছে না। তবু কাগজের টুকরোটা হাতে রাখতে হবে, বান্দোয়ান নামটা নির্ভুল বলতে পারবেন কি না সন্দেহ হচ্ছে।

ঘুমের ওষুধটা দিয়ে ভাল করেছে ঝিল্লি। জামাটামা না খুলেই একসময় শুয়ে পড়লেন হেমকান্তি।

পরদিন সকালেও ঝিল্লি চা দিতে এল না।

হেমকান্তি মুখটুখ ধুয়ে কয়েকবার বাইরে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মারলেন। দেখা গেল না ঝিল্লিকে। সরমা চায়ের সরঞ্জাম সাজাচ্ছে, বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছে টিটো। সে শুধু একবার মুখ তুলে বলল, গুড মর্নিং ছোটমামা।

আজ যে হেমকান্তিকে বক্তৃতা দেবার মতন একটা দারুণ শক্ত কাজ করতে হবে, বরুণদা নামে ব্যক্তিটি সম্পর্কে কোনও তথ্য জানা গেল কি না, সে বিষয়ে চিন্তার কোনও চিহ্ন নেই টিটোর মুখে। সে এ ব্যাপারে কোনও দায়িত্ব নিতে চায় না।

যদি কেউ-ই তাঁর দায়িত্ব নিতে না চাইত, তা হলে অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি কী করতেন? এইরকম অবস্থায় পড়লে কী করে অন্য মানুষেরা? রাস্তায় রাস্তায় পাগল হয়ে ঘুরে বেড়ায়?

ঝিল্লিই বা কেন এতটা যত্ন করছে তাঁর? নিঃস্বার্থ? আজই ঝিল্লিকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল। অন্য কেউ যেন আজ গ্রাহ্যই করছে না তাঁকে।

সামনের রাস্তায় মাইক বাজতে শুরু করেছে। প্যান্ডেল তৈরিও হয়ে গেছে, দেখাও যায়। অনেকগুলো চেয়ার পাতা হয়েছে রাস্তারই ওপরে, পাশাপাশি কয়েকটা তাঁবুর মতন কাপড়ের ঘর।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতে হঠাৎ একসময় হাত থেকে

কাপটা ফেলে দিলেন হেমকান্তি। কঠোরভাবে টিটোকে জিজ্ঞেস করলেন, ঝিল্লি কোথায়?

মুখ তুলে খুব সাধারণভাবে টিটো বলল, ভোরবেলাতেই তো সে কোথায় বেরিয়ে গেছে দেখছি!

হেমকান্তি বিকট গলায় চিৎকার করে বললেন, কেন সে আমায় কিছু না বলে বেরিয়ে গেল?

এমন চিৎকারে ঝনঝন করে উঠল সারাবাড়ি। নিজেদের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মেজবাবু, আরও দু'জন।

টিটো উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বেরিয়েছে, খানিক বাদে ফিরবে নিশ্চয়ই।

হেমকান্তি একইভাবে চেঁচিয়ে বললেন, আমাকে কিছু না বলে কেন সে বেরিয়ে গেল, আমি জানতে চাই!

এখন হেমকান্তির মুখখানি হিংস্র হয়ে উঠেছে। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। মাথার চুল খাড়াখাড়া, বদ্ধ পাগলেরই মতন চেহারা।

মেজবাবু ধমক দিয়ে বললেন, হেম, অত চেঁচাচ্ছিস কেন? ঝিল্লি বেরিয়েছে, আবার আসবে...

তাঁর চেয়েও জোরে ধমক দিয়ে হেমকান্তি বললেন, চুপ! তুমি কে? তোমাকে কে কথা বলতে বলেছে! অ্যাই টিটো! ঝিল্লি কোথায়, ডেকে আন তাকে।

ডান হাতটা জোরে সরাতে গিয়ে সেটা লাগল জানলায়। কাচটা ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল না বটে, একটা ফাটল দেখা দিল। তিনি আবার এক থাবড়া মেরে সেটা ভেঙে দিলেন।

টিটো তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলল, ছোটমামা, কী করছ, কী করছ, শান্ত হও!

হেমকান্তি অসুরের শক্তিতে তাকে এমন ধাক্কা দিলেন, সে ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। অজগরের মতন ফোঁসফোঁস করে নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন হেমকান্তি।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল জয়ী। তার সারা মুখে জলের ফোঁটা। মুখ ধুচ্ছিল, মোছারও সময় পায়নি।

সে বলল, ফুলকাকা, কী করছ? অত জোরে কথা বলছ কেন?

হেমকান্তি বললেন, বেশ করেছি! ইউ আর অল মাই এনিমিজ। আমাকে এখানে ইমপ্রিজনড করে রেখেছ। আমি চলে যাব! আজই চলে যাব!

ওপরে এসে এক পা এগিয়ে জয়ী জিজ্ঞেস করল, কোথায় চলে যাবে?

হেমকান্তি একেবারে অচেনা, কর্কশ গলায় বললেন, দ্যাট ইজ নান অফ ইয়োর বিজনেস! আমি তোমাদের কারওকে আর দেখতে চাই না। সরো।

জয়ী বলল, না, সরব না! তুমি কোথাও যাবে না।

হেমকান্তি বললেন, সরে যাও বলছি। আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না। আর এক মিনিটও...

জয়ী দৃঢ় গলায় বলল, পারব না মানে! টোটো উঠে এসো তো। আমরা দু'জনে দু'দিকে ধরলে উনি কেমন করে যেতে পারেন দেখি!

একটা হাত হেমকান্তির মুখের সামনে এনে সম্মোহন করার ভঙ্গিতে নাড়তে নাড়তে সে আবার বলল, তাকাও, আমার দিকে তাকিয়ে দেখো, আমি জয়ী, আমাকে চিনতে পারছ না?

হয়তো সম্মোহন নয়, এমনিই গলার আওয়াজটা খানিকটা নরম হয়ে গেল, হেমকান্তি বললেন, চিনব না কেন? এখানকার সবাইকে চিনেছি। কারওকে আমার প্রয়োজন নেই। লিভ মি অ্যালোন। এ-বাড়িতে আর আমি থাকব না।

জয়ী বলল, বেশ তো! এখানে ভালো না লাগে, তুমি কিছু দিন চন্দননগরে গিয়ে থাকো। মস্ত বড় বাড়ি, সামনেই গঙ্গা...

একটু যেন থমকে গেলেন হেমকান্তি। নদীর ধারে কোনও বাড়ির ছবি দেখতে চাইলেন কল্পনায়।

তারপরই আবার সেটা মুছে দিয়ে গর্জন করে বললেন, না, না, ওসব নয়! আমি চলে যাব অনেক দূরে, কেউ আমাকে সেখানে খুঁজে পাবে না! আমাকে দয়া দেখাচ্ছ তোমরা! ফুঃ! আই কেয়ার আ ড্যাম! সরে যাও...

একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে জয়ী বলল, না, সরব না!

টিটো উঠে দাঁড়িয়েছে। হেমকান্তির চোখ-মুখ দেখলে এখন রীতিমতন ভয় করে। তিনি কি জয়ীকেও ধাক্কা মেরে ফেলে দেবেন?

মেজবাবু বললেন, এই জয়ী, সাবধান, সরে আয়!

মানসিক বিপর্যয় ঘটলেও বহু বছরের পারিবারিক শিক্ষা ও সহবত শরীরের অণু-পরমাণুতে যেন গেঁথে থাকে। সেই শিক্ষাই মেয়েদের গায়ে হাত তুলতে বাধা দেয়।

রক্তচক্ষে জয়ীর দিকে তাকিয়ে থাকলেও হেমকান্তি তাকে স্পর্শ করলেন না। টিটোকে বললেন, এই মেয়েটাকে সরে যেতে বল।

টিটো বলল, আমার মাথায় খুব জোরে লেগেছে।

হেমকান্তি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আই অ্যাম সরি। আই অ্যাপোলোজাইস, আমাকে এখানে জোর করে ধরে রাখার চেষ্টা করিস না।

জয়ী বলল, অদ্ভুত কথা! এটা কি অন্য বাড়ি নাকি! এটা তোমার নিজের বাড়ি, এখানে তোমাকে জোর করে ধরে রাখার চেষ্টা করার তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তোমার মাথা গরম হয়ে গেছে। ওষুধটষুধ ঠিকমতন খাওনি বোধহয়।

হেমকান্তি বললেন, আমি আর ওষুধ খাব না। আমি চলে যাব।

জয়ী বলল, ঠিক আছে, যেয়ো! কেউ তোমায় আটকাবে না। কিন্তু এইরকম উত্তেজিত অবস্থায় কেউ বাড়ি থেকে বেরোয় নাকি! এখন খানিকটা বিশ্রাম নাও। তারপর স্নান করে কিছু মুখে দাও। চলো, নিজের ঘরে চলো—।

সে হেমকান্তির হাত ধরে টানল, তিনি বাধা দিলেন না।

দরজার কাছে এসে জয়ী টিটোদের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি একটু ওঁর সঙ্গে কথা বলছি, তোমরা এখন ডিস্টার্ব কোরো না।

ভেতরে এসে দরজাটা চেপে বন্ধ করে দিল জয়ী।

হেমকান্তিকে খাটের ওপর বসিয়ে সে শাড়ির আঁচলটা ফেলে দিল। ব্রা পরা নেই। শুধু সাদা ব্লাউজ। সেই ব্লাউজেরও হুক খুলে ফেলতে বেরিয়ে এল বাতাবি লেবুর আকৃতির সুগোল দুটি স্তন। খুবই দর্শনীয়।

জয়ী এমনই সাবলীলভাবে তার বক্ষদেশ নগ্ন কবে ফেলল যে হেমকান্তি হকচকিয়ে গিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। একেবারে কাছে এসে জয়ী বলল, নাও।

বুঝতে না পেরে হেমকান্তি বললেন, কী?

জয়ী তার একটি স্তন হেমকান্তির মুখে চেপে ধরে বলল, খাও!

হেমকান্তি প্রথমে মাথাটা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করেও পারলেন না। জয়ী পেছন দিক দিয়ে ধরে আছে।

জয়ী বলল, শোনো ফুলকাকা, তোমার সঙ্গে আমার নিজের স্বার্থও জড়িয়ে গেছে! তুমি এ-বাড়িতেই থাকো কিংবা অন্য কোথাও যাও, আমার সঙ্গে তোমার যোগাযোগ রাখতেই হবে।

দুধের শিশুর মুখে মায়ের স্তন, সেই স্তন যদি আকারে বেশ বড় হয়, তাতে

অনেক সময় শিশুর দম বন্ধ হয়ে আসে, হেমকান্তিরও অনেকটা সেই অবস্থা হল। তিনি উঁ উঁ শব্দ করতেই জয়ী একটু সরে এসে, আবার সেই স্তনটির বৃন্ত ভালোভাবে ছুঁইয়ে দিল হেমকান্তির ঠোঁটে।

হেমকান্তি আর প্রতিরোধ করলেন না।

মিনিট খানেক বাদে জয়ী নিজেই সরে গিয়ে স্তনদ্বয় ঢেকে দিল ব্লাউজে।

হেমকান্তি বিহ্বলের মতো বললেন, এ তুমি কী করলে?

জয়ী বলল, এমন কিছু না। এটা এক ধরনের ওষুধ। ট্রিটমেন্টও বলতে পারো। একটুখানি সেক্স মাথার অনেক বাজে চিন্তা সরিয়ে দেয়। তোমার রাগ কমে যায়নি?

হেমকান্তি যেন অমৃত পান করেছেন। এবার দু'হাত বাড়িয়ে বললেন, এসো। আবার দাও—

জয়ী বলল, না, আর নয়। দরজাটরজা সব খোলা। কোনও ওষুধই বেশি খেতে নেই একসঙ্গে। এখন তোমার মাথায় যে অক্সিটোসিন সিক্রিশন হবে, সেটাই মৌতাতের কাজ করবে। শোনো ফুলকাকা, তোমার অতীত সম্পর্কে আমি কয়েকটা খুব জরুরি ব্যাপার জানতে পেরেছি, তা নিয়ে সিরিয়াস আলোচনা করতে হবে, অনেকটা সময় লাগবে। দু'-তিন দিন বাদে আমি তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব, এর মধ্যে আর পাগলামি কোরো না, একা কোথাও যাবার চেষ্টা কোরো না! এখন শুয়ে থাকো।

হেমকান্তি বিহ্বলভাবে বললেন, তুমি এ কী করলে!

জয়ী বলল, আমরা দু'জন অনেকটা কাছাকাছি এলাম। তুমি আমাকে ভুলে গেছ সিন্দবাদ। তাহেরে সফরজাদেকে চিনতে পারছ না। অনেক কথা আছে।

হেমকান্তি দু'হাতে মুখ চাপা দিলেন।

দরজা খুলে বেরিয়ে এল জয়ী।

একটু পরেই কয়েক রকম কাটা ফল ভরতি একটা প্লেট নিয়ে ঢুকল সরমা। মুখখানা ভয়ে আড়ষ্ট।

প্লেটখানা বিছানার ওপর নামিয়ে রেখে ম্লান গলায় বলল, ঝিল্লি ফিরেছে, সে এখানে আসতে ভয় পাচ্ছে। তাকে মারবে টারবে না তো!

খুব ক্লান্তভাবে হেমকান্তি বললেন, না, আমি আর কারওকেই কিছু বলব না। ওর ভয় নেই। তবে, ওকে এখন এখানে আসতে হবে না। আমি একটু ঘুমোব। এই ফলটলও নিয়ে যাও।

সটান শুয়ে পড়ে পাশবালিশটা জোরে আঁকড়ে নিলেন হেমকান্তি।

ঠিক এগারোটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে পাড়ার দুটি ছেলে তাঁকে ডাকতে এল। দরজা ঠেলে টিটো এ-খবর দিয়ে বলল, ছোটমামা, চলো, আমরা ঘুরে আসি। ওদের বলে দিয়েছি, তোমাকে বেশিক্ষণ আটকাবে না। তুমি কি এই পাজামা পরেই যাবে? ওটা তেমন পরিষ্কার নয়। তুমি বরং প্যান্ট-শার্ট গলিয়ে নাও।

বাধ্য মানুষের মতো হেমকান্তি বাথরুমে গিয়ে পোশাক বদলে এলেন। দাড়ি কামানো হয়নি অবশ্য আজ। ঝিল্লির দেওয়া টুকরো কাগজটা নিয়ে নিলেন পকেটে।

টিটোর কাছে এসে তিনি কুণ্ঠিতভাবে বললেন, তোর চোট লাগেনি তো? আমি জেনুইনলি সরি। হঠাৎ কী যে হল।

টিটো বলল, তোমার এতটা হিংস্র ভাব আগে দেখিনি। সবাই জানে, তুমি শান্ত ধরনের মানুষ। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

পাগলের মতন মনে হচ্ছিল?

অনেকটা।

আমি পাগল হতে চাই না টিটো!

না, না এটা খুব অস্বাভাবিক নয়। সাডেন আউটবার্স্ট। একজন ডাক্তার আমাকে বলেছেন, খুব লোনলিনেস থেকে এরকম হয়। যাদের মেমারি লস হয়, তাদের চেয়ে বেশি লোনলি আর কে! আবার এইরকমভাবে হঠাৎ তোমার সব স্মৃতি ফিরেও আসতে পারে!

মাঝে মাঝে এই লোনলিনেস একেবারে অসহ্য হয়ে ওঠে।

আর শোনো, ঝিল্লি তো বাচ্চা মেয়ে, সবসময় বাড়ির কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, তা তো হয় না। ওর একটা আলাদা জীবন থাকতেই পারে। মাঝে মাঝে বাইরে যায়...

তা তো ঠিকই। আমার মতন একজন অসুস্থ লোককে নিয়ে ও কেন পড়ে থাকবে সবসময়। আমি ওর কাছেও মাপ চাইব।

তার দরকার নেই। ও ঠিক বুঝবে।

অন্যদিন এ-পাড়াটা নিস্তরঙ্গ থাকে, আজ একেবারে হইহই করে জেগে উঠেছে। মাইকে তারস্বরে গান বাজছে, এক একবার সেই গান থামিয়ে নানা রকম ঘোষণা। গাড়ি এসেছে অনেক, কয়েকটা স্কুল থেকে লাইন করে এসেছে

ছেলেমেয়েরা, রক্তদান শিবির চালু হয়ে গেছে। পাশেই মঞ্চ, রাস্তা জুড়ে অনেক চেয়ার পাতা। মঞ্চের এক পাশে এক মধ্যবয়স্ক, বিরলকেশ মানুষের ছবি, তাতে মালা পরানো।

মঞ্চের ওপর চেয়ারে তিনজন ব্যক্তি বসে আছেন। হেমকান্তি তাঁদের না চিনলেও একজন অতি বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন। হেমকান্তিকে বসানো হল তাঁর পাশে। তিনি হাত জোড় করে নমস্কার জানালেন, তাঁর বুকের মধ্যে যে দুম দুম শব্দ হচ্ছে, তা কেউ শুনতে পাচ্ছে না।

তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, বান্দোয়ান, পুরুলিয়া। বরুণ ঘোষ দস্তিদার। পাঁচ বছর আগে...

চোখে কালো চশমা পরা নিরঞ্জন ঘোষাল বসে আছেন দর্শকদের মধ্যে একেবারে সামনের সারিতে। দর্শক বলাটা ঠিক হল না, ইনি তো শুধু শ্রোতা। তবু হেমকান্তি এসে বসতেই এমনভাবে মুখ ফেরালেন যেন ওঁকে দেখতে পাচ্ছেন।

প্রথমে ভূমিকা হিসেবে এ-পাড়ার শুভকামী সঙ্ঘের কার্যকলাপ বুঝিয়ে বলতে লাগলেন উমাপতি বসু, অর্থাৎ সর্বপরিচিত বোসদা। নিজের নামটা তাঁর একেবারে পছন্দ নয়, প্রথমত, ঠাকুর-দেবতার নাম, দ্বিতীয়ত, এই এলাকার ছেলেরা তাঁকে উমাদা উমাদা বলে ডাকতে শুরু করেছিল। তা শুনলেই তিনি চটে যেতেন। উমাদা কথাটার কোনও মানে হয়? তা ছাড়া মেয়েলি শোনায়। এঁর চেহারায় কিংবা ব্যক্তিত্বে সামান্য মেয়েলিপনার চিহ্নমাত্র নেই। তাই তিনি বোসদা, তাঁর প্রথম নামটা প্রায় মুছেই গেছে।

মৃণাল সেন অন্য পাশের ব্যক্তিটির সঙ্গে কথা বলছেন মৃদু কণ্ঠে। হেমকান্তি মনোযোগ দিয়ে শুনছেন বক্তৃতা। নিশ্চয়ই বরুণদার কথাও আসবে, তাতেও অনেকটা জানা হয়ে যাবে।

যে-সব বাড়ির লোকজন সভায় যোগ দিতে আসেনি, সেইসব বাড়িরও বারান্দায় ও ছাদে দাঁড়িয়ে আছে অনেকে। দিনটা বেশ ভাল, রোদ্দুর নেই, ছায়া ছায়া আকাশ, হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হবারও সম্ভাবনা নেই। এটা একটা বন্ধ রাস্তা, তাই গাড়িটাড়িরও উৎপাত হবে না। দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা পুলিশের গাড়ি।

বোসদা বলছেন, আমাদের এই রক্তদান শিবির প্রথম শুরু হয় উনিশশো সত্তর সালে। আপনারা মনে করুন, সেইসব দিনের কথা। এখনকার

অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েরা হয়তো জানে না, কিন্তু আরও অনেকের নিশ্চিত স্মরণে আছে। তখন চতুর্দিকে চলেছে রক্তারক্তি কাণ্ড, রাজনৈতিক দলাদলিতে চলছে খুনোখুনি, সেই সুযোগ নিয়ে পুলিশও যেখানে সেখানে গুলি চালিয়ে হত্যা করছে নিরীহ মানুষকে, পথে পথে রক্তস্রোত, ভাল ভাল ছেলেরা বাড়ি থেকে বেরুলে আবার ফিরে আসবে কি না, তা পর্যন্ত অনিশ্চিত। সেই সময় বরুণদা স্লোগান তুলেছিলেন, 'রক্তের বদলে রক্ত চাই।' তাঁর নেতৃত্বে আমরা গড়ে তুললাম এই ক্লাব, বরুণদা তরুণ সমাজের কাছেই রক্ত চাইলেন। একদিকে চলেছে রক্তের অপব্যয়, আমরা দাবি তুললাম, আসুন, সবাই দলে দলে স্বেচ্ছায় রক্তদান করুন, যে-রক্তে বেঁচে উঠবে অনেক মুমূর্ষু মানুষ, অনেক আহত মানুষ, অনেক আগুনে পোড়া মানুষ, অনেক গরিব, দুর্বল, দুরারোগ্য রোগে ভোগা মানুষ। আমরা রক্ত চাই জীবনের জন্য। আমরা রক্ত দিয়ে অকারণ রক্তপাতের প্রতিবাদ জানাব...

একটি বাচ্চা ছেলে মঞ্চের ওপর উঠে এসে, পেছন দিয়ে একটা চিরকুট দিল হেমকান্তিকে।

ঝিল্লির হাতের লেখা। সে লিখেছে, তুমি বান্দোয়ান যাওনি। তার আগের দিন তোমার খুব জ্বর এসেছিল। তাই তুমি পুরুলিয়া সার্কিট হাউজে থেকে গিয়েছিলে। সেই জন্য বান্দোয়ানে বরুণদার শেষ মুহূর্তে ঠিক কী হয়েছিল, তা তোমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

মাত্র এক মুহূর্তের জন্য পুরুলিয়ার সার্কিট হাউজটা দেখতে পেলেন হেমকান্তি, তার পরই আবার অন্ধকার! বরুণদাকে তিনি কিছুতেই রক্তমাংসের চেহারায় আনতে পারছেন না।

চিরকুটটার দিকে চেয়ে রইলেন হেমকান্তি। তাঁর ভুরু কুঁচকে আছে। এইসব খবর কোথা থেকে জোগাড় করছে ঝিল্লি! এ তথ্যগুলোও কি এমন কিছু জরুরি? কিছু মনে নেই বলাটা যথেষ্ট নয়? পাঁচ বছর আগে খুন হয়েছেন একজন মানুষ, এত দিনেও সব জানা যায়নি?

ঝিল্লি কি এখানে এসেছে? হেমকান্তি চোখ দিয়ে তাকে খুঁজতে লাগলেন। টিটোকে দেখা যাচ্ছে, তার পাশে অন্য কেউ, কাছাকাছি ঝিল্লি নেই।

তখন তিনি দেখতে পেলেন এক দীর্ঘকায় ব্যক্তি, বুক-খোলা কোট পরা, মাথার সব চুল পাটকিলে রঙের, ধীর পায়ে এসে বসলেন একেবারে পেছন দিকে। সেখানে কয়েকটি চেয়ার খালি। সেই ব্যক্তিটি প্রথমে একটি চেয়ারে

বসতে গিয়েও আবার বেছে নিলেন একেবারে এক প্রান্তের অন্য একটি চেয়ার। হেমকান্তির কৌতূহলের সঙ্গে মিশে গেল অনেকটা খুশির ভাব।

আফতাব আমেদ! এই প্রথম একজনকে দেখামাত্র চিনতে পারলেন তিনি। সব মনে আছে।

আফতাব আর্মিতে ছিল, বেয়াল্লিশ বছর বয়েসে গুরুতর চোট পেয়ে অবসর নেয়, শেষ পোস্টিং ছিল তেজপুরে। ফিরে আসে ওদের নিজস্ব বাড়ি ডায়মন্ড হারবারে।

পুরোপুরি সেরে উঠে আফতাব শুরু করে চিংড়িমাছ এক্সপোর্টের ব্যাবসা। আফতাবের স্ত্রী সোফি, ক্রিশ্চিয়ান, কিন্তু উর্দু জানে। ওদের দুটি ছেলেমেয়ে, ছেলেটির নাম লর্ড, আর মেয়েটি, মেয়েটি, সে যাই হোক, সবই ছবির মতন দেখতে পাচ্ছেন হেমকান্তি, ওদের বাড়ি থেকে নদী দেখা যায় না এখন, সামনে একটা হোটেল তৈরি হয়েছে, কিন্তু সন্ধের পর ছাদে উঠলে দূরে জ্বলজ্বল করে হলদিয়া বন্দরের আলো।

আফতাব কি হেমকান্তির সঙ্গেই দেখা করতে এসেছে, নাকি ও বরুণদাকেও চিনত? মোট কথা ক্রমশ বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠতে লাগলেন তিনি, এবার কি সব কিছুই মনে পড়ে যাবে? হ্যাঁ, ডায়মন্ড হারবারের ট্রেন, একবার গাড়িতেও যাওয়া হয়েছিল অনেকে মিলে। আফতাবের গাড়িটা স্টেশন ওয়াগন, গাড়ি চলার সময় সে কারওকে সিগারেট খেতে দেয় না...।

এইসব ভাবতে ভাবতে বোসদার বক্তৃতা আর তাঁর শোনা হল না। একটা কিছু দেখতে দেখতে অন্য কিছু শোনা যায়, কিন্তু একটা কিছু চিন্তা করতে করতে অন্য কোনও কিছুরই মর্ম বোঝা যায় না।

আফতাবের সঙ্গে একবার চোখাচোখি হল, সে কিন্তু হাসল না, চেয়ে রইল এক দৃষ্টিতে। হেমকান্তি একটা হাত তুললেন, অর্থাৎ সে যেন চলে না যায়।

আফতাবের দিক থেকে চোখ সরাতেই চোখ এসে যায় সামনের সারিতে। সবাই অচেনা, শুধু কালো চশমা পরা নিরঞ্জন ঘোষালের মুখখানা তাঁর দিকেই ফেরানো। যেন তিনি বক্তৃতা শুনছেন না, হেমকান্তিকেই দেখছেন।

এবার ভাষণ দিতে উঠলেন মৃণাল সেন।

হেমকান্তি আবার মনঃসংযোগ করার চেষ্টা করলেন।

ইনি বরুণ ঘোষ দস্তিদারকে ভালো চিনতেন না, দেখা হয়েছে মাত্র দু'-তিনবার নানা উপলক্ষে। তবে, ইনি 'কলকাতা একাত্তর' নামে একটি

চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন, টুকরো টুকরো ভাবে স্মরণ করছেন সেইসব দিনগুলোর কথা। ইনি সুবক্তা ও সুরসিক, বক্তৃতার মধ্যেও থাকে আড্ডার মেজাজ।

শুনতে শুনতে হেমকান্তি মাঝে মাঝে তাকাচ্ছেন আফতাবের দিকে। সে বাঁ দিকের গালে হাত দিয়ে বসে আছে।

হঠাৎ যেন একটা কামান দাগার শব্দ হল। সে শব্দে তছনছ হয়ে গেল হেমকান্তির উৎফুল্ল ভাব। যেন একটা পাতলা কালো চাদর দুলতে লাগল তাঁর চোখের সামনে।

এ তিনি কাকে দেখছেন! এ তো আফতাব হতেই পারে না।

আফতাব, আফতাব তো আর নেই। তেজপুরের কাছের জঙ্গলে একদল পোচারকে তাড়া করতে গিয়ে আফতাবের পেটে গুলি লাগে। তারপর চার-পাঁচ বছর কেটে গেলেও আফতাব বলত, গুলিটা তার পেটের মধ্যে রয়ে গেছে! সোফি অবশ্য হাসতে হাসতে প্রতিবাদ করে বলত, মোটেই তা নয়, সে সময় ও পুরো তিন দিন অজ্ঞান হয়ে ছিল। তার মধ্যে অপারেশন করে বার করে নেওয়া হয়েছিল সেই বুলেট। আফতাব বলত, আরে ভাই, গুলিটা আমার তলপেটে গেঁথে আছে, আমি প্রায়ই টের পাই। ম্যায় গোলা খা ডালা, লেকিন আভি তক হজম নেহি হুয়া।

সেই আফতাব একদিন সন্ধেবেলা হঠাৎ পেটের ব্যথায় বিকট চিৎকার করতে লাগল। ডাক্তার এসে পৌঁছোবার আগেই সব শেষ। আর্মি থেকে রিটায়ার করার সময় অনেক টাকা পেয়েছিল আফতাব, চিংড়ি মাছের ব্যবসায়েরও খুব রমরমা, পড়ে রইল সব কিছু। তার পেটের মধ্যে সত্যিই একটা বুলেট গেঁথে ছিল কি না তা তার ডেডবডি পোস্টমর্টেম করলে জানা যেত, কিন্তু তার পরিবারের লোকেরা তার শরীরটাকে কাঁটা-ছেঁড়া করে দেখাতে রাজি হয়নি, ডাক্তারকে দিয়ে কারডিয়াক অ্যারেস্টের সার্টিফিকেট লিখিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

মুসলমানদের শ্রাদ্ধের ব্যাপারটাকে যেন কী বলে? জানাজা। হেমকান্তি নিজে সেই জানাজায় উপস্থিত ছিলেন।

ও যদি আফতাব না হয়, তা হলে ও কে? না, না, ওকে আফতাব হতেই হবে, আফতাবের সূত্র ধরে হেমকান্তি পূর্বস্মৃতি ফিরে পাচ্ছেন।

তবে কি আফতাবের কোনও যমজ ভাই? হুবহু এক রকম চেহারা, এক

রকম তাকাবার ভঙ্গি, বুক খোলা জ্যাকেট, মাথার সব চুল মেহেন্দি করা।

না, যমজ কেন, আফতাবের কোনও ভাই-ই ছিল না। ওরা চার বোন, একমাত্র ভাই। হেমকান্তির এও মনে পড়ল যে আফতাব একদিন আফশোস করে বলেছিল, ভাই, দেওর-বউঠানের সম্পর্কটা আমার এ জীবনে জানা হল না।

ওখানে কি সত্যিই কেউ বসে আছে, নাকি হেমকান্তির চোখের ভুল? আর কেউ দেখতে পাচ্ছে ওকে? আফতাব কারও সঙ্গে কথা বলছে না, অন্য কেউও কথা বলেনি ওর সঙ্গে। তবে কি ওখানে বসে আছে আফতাবের প্রেতমূর্তি? এই দিনদুপুরে? যাঃ, প্রেতমূর্তি-টুর্তি আবার কী! হেমকান্তি নিজেকে বললেন, এমন দুর্বল হয়ে পড়লে চলবে না।

ও যদি আফতাব না হয়, তা হলে তিনি এতক্ষণ যা ভাবলেন, আফতাবের স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ডায়মন্ড হারবারের বাড়ি, এসবও ভুল! নিছক কল্পনা! এক্ষুনি একবার উঠে ওই আফতাবকে ছুঁয়ে দেখতে হবে। আফতাব, আফতাব, তোমার মৃত্যুর খবরটা মিথ্যে হয়ে যাক, আমি ভুল মানুষের জানাজায় গেছি, কিংবা যাইনি কোথাও, তুমি বেঁচে থাকো, এখন তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু ...।

হেমকান্তি উঠে দাঁড়াতে গিয়েই দেখতে পেলেন সামনের সারির নিরঞ্জন ঘোষালকে। তিনি এখন চশমাটা খুলে ফেলেছেন, তাঁর এক চোখ বোজা, অন্য চোখটা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। সেই উন্মুক্ত চোখটি দিয়ে যেন অগ্নিবর্ষণ হচ্ছে হেমকান্তির দিকে। যেন তিনি এক মহা অপরাধ করতে বসেছেন।

হেমকান্তি উঠে দাঁড়িয়ে আর্তকণ্ঠে বললেন, 'না!'

মৃণাল সেন মাঝপথে বক্তৃতা থামিয়ে বললেন, আরে আরে, এ ভদ্রলোকের কী হল? আপনারা একটু দেখুন তো, একজন ভলান্টিয়ার ...

হেমকান্তির মাথাটা এখন মৃণাল সেনের বুকের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। তিনি কাঁদছেন ফুঁপিয়ে আর কী যেন বলছেন বোঝা যাচ্ছে না।

তারপর গড়িয়ে পড়ে গেলেন মৃণাল সেনের পায়ের কাছে। একেবারে চেতনাহীন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল টিটো। হেমকান্তির মুখের চেহারা দেখেই ভয় পেয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, ডাক্তার, ডাক্তার, এখানে কোনও ডাক্তার আছে?

পাঁচজন জুনিয়র ডাক্তার সাহায্য করতে এসেছে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে। ডেকে আনা হল তাদের দু'জনকে।

ততক্ষণে মঞ্চটা ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছে। সভা আপাতত স্থগিত। বোসদা এসে দাঁড়িয়ে আছেন নিরঞ্জন ঘোষালের কাছে। নিরঞ্জন ঘোষাল চোখে আবার চশমাটা পরে নিয়েছেন। নিম্ন স্বরে বললেন, চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে দেখো না।

জুনিয়র ডাক্তার দু'জন পরীক্ষা করে দেখে বলল, তেমন ভয়ের কিছু নেই। হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন। প্রেশার ঠিকই আছে। পালস বিট ... খানিকটা বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। হার্টের কোনও হিস্ট্রি আছে?

টিটো বলল, না, হার্টের কোনও প্রবলেম নেই। নার্ভের ... বাড়িতে নিয়ে যাব?

বোসদা বললেন, ওই ক্যাম্পের একটা কটে এখন শুইয়ে রাখো। পরে বাড়িতে নিয়ে যেয়ো। যদি একটুক্ষণের মধ্যে চাঙ্গা হয়ে ওঠে ...

দূরে দাঁড়িয়ে আছে ঝিল্লি, সে এসব দেখেও কাছে আসেনি।

কয়েকজন মিলে ধরাধরি করে হেমকান্তিকে নামিয়ে আনা হল মঞ্চ থেকে।

দর্শক-শ্রোতারা অনেকে কৌতূহলী হয়ে ভিড় করেছে কাছে এসে।

হেমকান্তি যাকে আফতাব মনে করেছিলেন, সে কিন্তু কায়াহীন কিংবা অলীক নয়। এবার সে উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে গেল বড় রাস্তার দিকে।

জোরে জোরে ঘণ্টা বাজিয়ে সে রাস্তা দিয়ে ছুটে গেল দুটো দমকলের গাড়ি।

সাত

শ্রাবণী কাজ করে একটি ব্যাঙ্কে। আর রুচিরা কয়েকটি চাকরি বদলে এখন একটা বিজ্ঞাপন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। বিজ্ঞাপন সংস্থা বললে ঠিক বোঝা যায় না। এদের কাজ নানারকম, বিভিন্ন কোম্পানির সেমিনার কিংবা কনফারেন্সও এরা সাজিয়ে গুছিয়ে দেয়, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, এমনকী এন আর আইদের বিয়েতেও এরা প্রয়োজনীয় ফর্দ আর পুরুত জোগাড় করার ভার নেয়। এসব কাজকে বলে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট। সেইজন্য এদের কোনও বাঁধাধরা কাজের সময় নেই। রুচিরার বাড়ি ফিরতে ফিরতে এক একদিন ক্যালেন্ডারের তারিখ বদলে যায়।

শ্রাবণীর নির্দিষ্ট সময়ের কাজ। বড়জোর বছরে দু'-চার দিন কিছুটা অতিরিক্ত সময়। তবু, রুচিরা নিজের কাজটা খুবই উপভোগ করে, আর শ্রাবণীর ব্যাঙ্কের কাজ একেবারেই পছন্দ নয়। কিন্তু সে অন্য কাজ খোঁজার উদ্যোগও নেবে না। রুচিরা কতবার শ্রাবণীকে নিজের অফিসে টেনে আনতে চেয়েছে। শ্রাবণী অনায়াসেই ভালো কপি রাইটার হতে পারে। কিন্তু শ্রাবণী খানিকটা আদরিণীর মতন বলেছে, না রে বাপু, আমার দশটা-সাড়ে পাঁচটাই ভালো।

পুরোপুরি বর্ষা ঋতু, যখন তখন বৃষ্টি নামে, শ্রাবণী ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল উলটোডাঙা বাস স্টপে। আকাশ এখন আকাশের মতন নয়। আকাশ শব্দটার সঙ্গেই মিশে আছে নীল বর্ণ, কিন্তু কলকাতায় সেই বর্ণ দেখা যায় কদাচিত। এখন ময়লা ময়লা। যেন ভুসোকালি মাখা।

দু'-তিনজন সহকর্মীও এসেছে সঙ্গে, কিন্তু অফিস থেকে বেরোবার পর শ্রাবণী ওদের সঙ্গে বিশেষ কথা বলে না। তারাও কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় জেনে গেছে যে এই উড়ু উড়ু চোখের নারীটি তাদের কারও সঙ্গে রবীন্দ্র সদনে যাবে না, চায়ের দোকানে বসবে না। অথচ শ্রাবণী মোটেই রোখাচোখা, বদমেজাজি টাইপের নয়, চেহারার মতন তার স্বভাব এবং কথ্যভঙ্গিও খুব নরম, কেউ কিছু অন্যরকম প্রস্তাব দিলে সে খুব মৃদু গলায় বলে, না গো, আমার যে আজ অন্য জায়গায় যেতে হবে, তুমি কিছু মনে কোরো না।

বাসে উঠে শ্রাবণী একটা জানলার ধারের বসবার জায়গা পেয়ে গেল।

তার ঠিক কয়েক মুহূর্ত পরে সেই বাস স্টপে উপস্থিত হল একটা নীল রঙের গাড়ি, সেই গাড়ি থেকে একজন কেউ বাসটায় উঠতে চেয়েছিল ... বোধহয়, পারল না।

ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে ছুটছে বাসটা। জানলার কাছে যে বসে আছে, তার পক্ষে তো রাস্তার দৃশ্য দেখা স্বাভাবিক। শ্রাবণী চেয়ে আছে বটে, কিন্তু দেখছে না কিছুই। দেখা কিংবা না-দেখা তার মেজাজের ওপর নির্ভর করে। তার মন অন্য জায়গায়, তাই তার চোখ আপাতত ছুটিতে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে তার দৃষ্টি ফিরে এল মনের কেন্দ্রবিন্দুতে। সে দেখল, বাসটার পাশাপাশি ছুটতে চাইছে একটা নীল রঙের গাড়ি, ডান দিকের জানলা দিয়ে কেউ যেন হাত নেড়ে কিছু বলতে চাইছে তাকে।

শ্রাবণী প্রথমে বেশ কৌতুক বোধ করল। বাচ্চা বয়েসে যেমন হয়,

পাশাপাশি দুটো গাড়ি গেলে মনে হয়, আমাদেরটা আগে, আমাদেরটা আগে, সেইরকম। গাড়িটাকে এক একবার পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে বাসটা।

এক জায়গায় লাল আলোয় বাসটা থামার পর সেই নীল গাড়ি থেকে সুদর্শন চেঁচিয়ে বলল, শ্রাবণী, নামো, নেমে পড়ো, তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

শ্রাবণী হাসিমুখে দু'দিকে মাথা নাড়ল।

রুবি হাসপাতালের সামনে শ্রাবণীকে নামতেই হয়। এখান থেকে তার অটো ধরার কথা।

নীল গাড়িটা থেকে নেমে এসে সুদর্শন বলল, তুমি আমার গাড়িতে ওঠো। তোমাকে আমি বাড়ি পৌঁছে দেব।

শ্রাবণী সরলভাবে জিজ্ঞেস করল, কেন, তোমার গাড়িতে উঠব কেন?

সুদর্শন বলল, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা খুব জরুরি কথা আছে।

শ্রাবণীর চোখ একটু ওপরে উঠে গেল। সুদর্শনকে ছাড়িয়েও সে দূরে কিছু দেখল।

তারপর একই রকম সরল ও নরম ভঙ্গিতে বলল, ওই যে দেখো না একটা পুলিশের গাড়ি। ওদের গিয়ে যদি বলি, তুমি আমাকে জোর করে নিয়ে যেতে চাইছ!

আগে দাড়ি ছিল না। এখন দাড়ি রেখেছে সুদর্শন। তার ফরসা মুখে এরকম খোঁচা খোঁচা দাড়ি বেশ মানায়। প্যান্টের ওপর পাঞ্জাবি তার বরাবরের পোশাক। নামের সঙ্গে চেহারায় মিল আছে, তার বাঁ হাতে সবসময় সিগারেট।

সুদর্শন একবার পেছনে তাকিয়ে সত্যিকারের পুলিশের গাড়িটা দেখে নিয়ে ক্ষুব্ধভাবে বলল, না, সে-কথা তুমি বলতে পারো না। আমি জোর করছি না, অনুরোধ করছি। তোমার সঙ্গে দু'-চারটে কথা বলার অধিকারও কি আমার নেই? শ্রাবণী, ভুলে যেয়ো না, মিঠু আমারও মেয়ে। যে-কোনও দিন আমি ওর ওপর অধিকার দাবি করতে পারি।

দু'দিকে মাথা নাড়তে নাড়তে শ্রাবণী বলল, পারবে না, পারবে না। মিঠু আছে জামশেদপুরে আমার মায়ের কাছে। তুমি যদি ওখানে গিয়ে ওর গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করো, আমার ছোড়দা তোমাকে গুলি করে মেরে ফেলবে।

সুদর্শন অধৈর্যের সঙ্গে বলল, তুমি কী যে ছেলেমানুষ রয়ে গেলে! গুলিফুলির কথা আসছে কোথা থেকে? আমি কি জোর করব নাকি? এটা

আইনের প্রশ্ন। কোর্ট বললে, তুমি মাঝে মাঝে মিঠুকে আমার কাছে পাঠাতে বাধ্য!

শ্রাবণী বলল, আমি আইন মানি না!

দু'কাঁধ ঝাঁকিয়ে সুদর্শন বলল, সে দেখা যাবে। তুমি গাড়িতে উঠবে? আমি তোমাকে রিকোয়েস্ট করছি।

শ্রাবণী বলল, গাড়িতে উঠতে হবে কেন? এখানেই বলো।

সুদর্শন বলল, খানিকটা সময় লাগবে।

তারপর সে হা-হা করে হেসে বলল, ওই দ্যাখো, পুলিশের গাড়িটা চলে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে। এবার কী হবে?

তুমি কি করে আমাকে জোর করে গাড়িতে তুলবে? এখানে এত লোক আছে।

তোমাকে আমি কোনওদিন জোর করেছি? যেদিন তুমি মুকুটমণিপুরে হঠাৎ অশেষদের গাড়িতে উঠে চলে এলে, আমি জোর করে তোমাকে আটকাতে পারতাম না! কিংবা, আর একবার, আমাকে কিছু না জানিয়ে দুর্গাপুর থেকে ... আমি স্টেশন পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিলাম, তোমাকে জোর করে ট্রেন থেকে নামিয়ে আনার চেষ্টা করেছি?

জোর করোনি। আসলে তখন তুমি আমাকে ধরে রাখতে চাওনি। ভেবেছিলে, যাক, বিদায় হল, বাঁচা গেল!

এইসব কথা এখানে আলোচনা করা যাবে না। সেইজন্যই বলছি, গাড়িতে উঠতে। আমার ওপর কি তোমার এইটুকু ভরসা নেই যে আমি জোর করে তোমায় কোথাও ধরে নিয়ে যাব না! সে-প্রশ্নই ওঠে না।

ঠিক! ডিভোর্স হবার পর সেই বউকে কেউ জোর করে ধরে নিয়ে যায় না। কিন্তু সুদর্শন, তুমি আমার সঙ্গে যাই-ই বলতে চাও, কোনও হোটেল ফোটেলে আমি যাব না। আমি যেখানে থাকি, সেখানে গিয়ে কথা হতে পারে।

তোমাদের ওখানে, মানে, ওই যে মেয়েটা, কী যেন নাম, রুচিরা, সে-ও থাকবে? ওঃ, ওকে আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না। ওর সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক বলো তো?

শ্রাবণী এবার সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে দিল। তারপর বলল, কী সম্পর্ক? অনেকেই বলে, আমরা লেসবিয়ান। সেইজন্যই আমার বিয়ে ভেঙে গেছে। আর ওর বিয়েই হয়নি। হতেও পারে।

সুদর্শন বিরক্তির ভঙ্গি করে বলল, লেসবিয়ান! নাঃ! ও আগে অন্তত দু'জনের সঙ্গে, আই মিন দু'জন পুরুষের সঙ্গে অ্যাফেয়ার করেছে আমি জানি। ও বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে, সেইজন্য ওকে আমি পছন্দ করি না। তুমি ওকে সহ্য করো কী করে? তা ছাড়া, ও মেয়েটা ড্রিঙ্ক করে। একদিন ওলিম্পিয়ায় দেখেছি ...

শ্রাবণী বলল, আমিও, মাঝে মাঝে ...

তারপর হঠাৎ মেজাজ বদলে ফেলে সে বলল, তুমি যদি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও, তা যতই গুরুতর হোক, তা শোনার কোনও আগ্রহ আমার নেই যদিও, তবু, তোমার অনুরোধে শুনতে পারি। কিন্তু কথা হবে আমার বাড়িতে। রুচিরা এখন সেখানে থাকবে না।

মাসি থাকবে?

মাসি তো থাকবেই।

শ্রাবণী উঠে পড়ল নীল গাড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় ফোঁটায় শুরু হল বৃষ্টি। একবার মাত্র বজ্রগর্জন হল।

সামনের অন্য সিটে আর একজন ব্যক্তি বসে আছে। তার মুখখানা শ্রাবণীর চেনা চেনা লাগতেও পারে, কিন্তু সে মনোযোগ দিল না, তার শাড়ির আঁচলের একটুখানি দরজায় আটকে গেছে।

গাড়িটা নতুন। চালকের আসনে বসে সুদর্শন বোতাম টিপে সব ক'টা জানলা বন্ধ করে দিল। তারপরই আবার কাচ নামিয়ে সে পাশের সঙ্গীকে বলল, সিগারেটটা ফেলে দে অমিত! বন্ধ গাড়িতে সিগারেটের ধোঁয়ায় শ্রাবণীর কষ্ট হয়!

সে ব্যক্তিটি প্রায় গোটা একটা সিগারেট ফেলে দিল বাইরে। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে পেছনের সিটের শ্রাবণীকে বলল, নমস্কার।

সুদর্শন বলল, ওকে চিনতে পারছ তো? অমিত, আমার বন্ধু। ওর বাবাও আমার বাবার খুব বন্ধু ছিলেন। তুমি সুবিমলকাকাকেও দেখেছ আমাদের বাড়িতে।

শ্রাবণী সংক্ষেপে বলল, হ্যাঁ। তারপর বলল, আমার আঁচলটা খানিকটা ছিঁড়ে গেল, কেন যে জোরে টানলাম!

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে সুদর্শন জিজ্ঞেস করল, খুব বেশি ছিঁড়েছে? আমাকে বললেই আমি দরজা খুলে দিতাম। অবশ্য, তোমার শাড়ি তো প্রায়ই ছেঁড়ে।

শ্রাবণী বলল, আমি ছেঁড়া শাড়িই পরি। সবাই জানে।

অমিত জিজ্ঞেস করল, আপনি কি ছেঁড়া জায়গাটা সেলাই করে নেন? নাকি সেরকমই থাকে? আমার মা-ও মাঝে মাঝে ...

শ্রাবণী বলল, অফিসে সালোয়ার-কামিজ পরেও আসা যায়। নতুন একটা মেয়ে জিনস্ আর টপ পরে আসে। ব্যাঙ্কে কোনও ড্রেস কোড নেই।

সুদর্শন বলল, তোমাদের ব্যাঙ্কে ...

তাকে বাধা দিয়ে শ্রাবণী বলল, আমরা এইসব সাধারণ কথা আর বলব না। বাড়িতে গিয়ে কাজের কথা হবে। ততক্ষণ আমরা চুপ করে থাকি, কেমন!

সুদর্শন তবু বলল, বাড়িতে না গিয়ে, এই রাস্তায় অনেক নতুন নতুন রেস্তোরাঁ খুলেছে। এখন বিকেলবেলা, নিরিবিলি হবে...

উত্তর না দিয়ে শ্রাবণী বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

বাতাসের বেগ আছে। তাই বৃষ্টির রেখাগুলো দিক বদলাচ্ছে অনবরত। এইসময় গাড়িগুলো বেশি হর্ন দেয়। শ্রাবণীর মুখ দেখে বোঝা যাবে না, সে এখন নিঃশব্দে একটা গান গাইছে। সেটা অবশ্য বৃষ্টির গান নয়, এ মোহ আবরণ খুলে দাও ...।

কেন যে কখন কোন গান মনে আসে, তার একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই তা বোঝা সম্ভব নয়।

ক্রমশ ভিড়ের রাস্তায় এসে পড়ল গাড়িটা। অমিত ও সুদর্শন মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে নিম্নস্বরে কথা বলছে। পেছনের সিটে শ্রাবণী একেবারে নিশ্চুপ।

শুধু চুপ আর নিশ্চুপের মধ্যে কি কিছু তফাত আছে? আছে হয়তো, নইলে দু'রকমই লেখা হয় কেন?

এখন শ্রাবণীকে চুপের বদলে নিশ্চুপ বললেই মানানসই হয়। নিশ্চুপ অবস্থায় মানুষ শুধু নিজের নাকটা দেখে।

বাড়ির সামনে এসে গাড়িটা থামার পরেও শ্রাবণী কোনও কথা বলল না।

খুব কাছেই একটা পানের দোকান। সেখানে সন্ধের দিকে এই পল্লির কয়েকটি নবযুবক নিয়মিত জটলা করে। তারা শ্রাবণী-রুচিরার গমন-নির্গমনের প্রতি নজর রাখে। ওদের সঙ্গী-সাথীদেরও তদন্ত-চোখে দেখে। এটা অস্বাভাবিক নয়, শ্রাবণী আর রুচিরা দু'জনেই পুরুষ-বিযুক্ত যুবতী। সুতরাং সবসময় তারা কৌতূহলের সামগ্রী। তা ছাড়া তাদের নিরাপত্তার অলিখিত

দায়িত্বও তো পাড়ার ছেলেদেরই। এরা অবশ্য টিটোকে চিনে গেছে। এর মধ্যেই সে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন খেলোয়াড় হিসেবে খানিকটা সম্মান পায়।

ওপরের গেটের তালা খোলার পর মাসি প্রথমে শ্রাবণীকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, পেছনে দু'জন পুরুষকে দেখে থমকে গিয়ে তিনি মুখখানি কঠোর করে ফেললেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি সুদর্শনকে চিনতে পেয়ে খুশি হয়ে অস্ফুট স্বরে বললেন, ঠাকুর জামাই!

মাসির এখনও আশা, শ্রাবণীর সঙ্গে সুদর্শনের মনোমালিন্য হয়েছে বটে, তা তো অনেক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই হয়, আবার ঠিক মিটে যাবে। আদালতে যে বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলার নিষ্পত্তি হয়ে গেল, তা তিনি গ্রাহ্য করেন না।

ভেতরে এসে শ্রাবণী ঠিক সুদর্শনের উদ্দেশে নয়, আলগাভাবে বলল, আমি একটু আসছি।

মাসি খাতির করে সুদর্শন ও তার বন্ধুকে বসালেন। জল এনে দিলেন দু'গেলাস। তারপর রঙ্গ করে বললেন, কী গো, ঠাকুর জামাই, ভাল আছ তো? একটু মোটা হয়েছ, মনে হচ্ছে!

এই মাসিটিকে সুদর্শন কোনওদিন দু'চক্ষে দেখতে পারেনি। বাড়ির কাজের লোক হয়েও নিজের অধিকারের সীমা জানে না। যে-কোনও মানুষকে দেখলেই প্রথমে মোটা হচ্ছ কিংবা রোগা হয়েছ বলা চাই! যেন সেটা তার মাথাব্যথা!

আর সত্যিই তো, সুদর্শনকে মোটেই মোটা বলা চলে না। সে এখনও বেশ সুপুরুষ। শুধু ইদানীং তার মধ্যপ্রদেশ সামান্য স্ফীত হয়েছে। এই ব্যাপারে সে বেশ স্পর্শকাতর। কেউ মোটা কথাটা উচ্চারণ করলেই সে চটে যায়।

বিরক্ত ও গম্ভীরভাবে সে বলল, তুমি ভালো তো? চা খাওয়াবে? চিনি দিয়ো না আমারটায়।

মাসি বললেন, আমি কারও চায়েই চিনি দিই না, যার যা ইচ্ছে মিশিয়ে নেয়। টিটোও চিনি খায় না। রত্নেশদাদা পাউডার দিয়ে খায়।

চা দেবার আগে মাসি ফ্রিজ থেকে সন্দেশ বার করে দুটি প্লেটে সাজিয়ে এনে রাখলেন ওদের সামনে।

সুদর্শন ঝাঁঝালোভাবে বলল, আবার এসব! বললাম না যে আমি মিষ্টি খাই না!

মাসি বললেন, তুমি খাও বা না খাও, বাড়িতে জামাই এলে মিষ্টি দেব না? সব কিছুরই তো একটা ধারা আছে!

সুদর্শন বলল, এসব সরিয়ে নিয়ে যাও, একটা অ্যাশট্রে নিয়ে এসো!

মাসি বললেন, এই দাদাটিও খাবে না? প্রথমবার এল বাড়িতে ...

অমিত বলল, আমি মিষ্টি খাই। তবে দুটো নয়, একটা খাব।

শ্রাবণী ভেতরে চলে গেছে, এখনও ফিরে আসেনি।

বাইরে থেকে এলেই হাত ও পা সাবান দিয়ে ধোওয়া তার স্বভাব। তাতে আর কতক্ষণ লাগে!

শ্রাবণী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাথরুমের আয়নার সামনে। শরীর যেন প্রায় নিস্পন্দ। আয়নায় সে নিজেকে দেখছে না।

সাধারণ চেহারার বাঙালি মহিলাদের তুলনায় সে কিছুটা দীর্ঘকায়, একেবারেই তন্বী, ছিপছিপে যাকে বলে, কিন্তু তার কোমরের খাঁজ ও স্তন দুটির ঢৌলে ভোগবাদী রূপ আছে। এখন তার মুখখানি বিষাদ মাখা। যখন তখন সে মনে মনে কষ্ট পায়। যেন সে কষ্ট পাওয়ার জন্যই জন্মেছে।

সুদর্শনের এখানে আসাটা সে পছন্দ করতে পারছে না। সুদর্শন যা-ই বলতে চাক, তাতে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। খানিকক্ষণ ভদ্রতা রক্ষা করে হুঁ-হাঁ করে শুনে তারপর বিদায় করে দিলেই তো পারে।

কিন্তু ওই কাজটাই যে শ্রাবণীর পক্ষে সহজ নয়। সুদর্শনের সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করতে হতে পারে। এই কথাটা ভেবেই সে কষ্ট পাচ্ছে।

শ্রাবণীর দেরি দেখে সুদর্শন মাসিকে বলল, ও কোথায় গেল? ওকে একবার ডাকো। আমরা বেশিক্ষণ থাকব না।

মাসি বাথরুমের কাছে গিয়ে ডাকতেই শ্রাবণীর ঘোর কেটে গেল। সে বেরিয়ে এসেও বসবার জায়গায় গেল না। দাঁড়িয়ে রইল বারান্দার দরজার কাছে।

সুদর্শন তাকে দেখতে পেয়ে কাছে গিয়ে বলল, কী ব্যাপার!

শ্রাবণী বলল, তুমি দরকারি কথা বলবে, তা কি তোমার বন্ধুর সামনে?

সুদর্শন বলল, ওর সামনেও দু'-একটা কথা বলতে হবে, তা পরে। এখন, মানে, এই বারান্দাটায় বসা যায়? যদি দুটো চেয়ার ...

শ্রাবণী বলল, কয়েকটা মোড়া আছে। একটু বৃষ্টির ছাঁট লাগতে পারে।

সুদর্শন বলল, তা লাগুক। বৃষ্টিও প্রায় ধরে এসেছে।

খানিকটা দূরত্ব রেখে দুটো মোড়ায় বসার পর সুদর্শন বলল, আমি ক্যাটিগরিক্যালি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড।

ইমোশনাল হবার বয়েস তো নেই। আমার প্রথম প্রশ্ন, এই দেড় বছরের মধ্যে তুমি কি অন্য কারও সঙ্গে ইনভলভড্ হয়ে পড়েছ? হতেই পারো, ইউ আর ফ্রি নাউ। আমি শুধু জানতে চাইছি...

কেন জানতে চাইছ্?

সেটা একটু পরে বলব। তুমি জাস্ট ইয়েস অর নো বললেই চলবে। টিটোর কথা আমি জানি। দ্যাট আই ডোন্ট মাইন্ড। পিসতুতো-মাসতুতো ভাই বোনদের মধ্যে ওরকম একটু কাফ-লাভ হতেই পারে।

আমি টিটোকে ভালোবাসি।

জানি, জানি, বললাম তো, সেটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। তুমি তো আর টিটোকে বিয়ে করতে যাচ্ছ না। তোমাদের ফ্যামিলিটা কত মরালিস্টিক, তাও তো আমার দেখা আছে। তুমি কখনও টিটোর সঙ্গে কোনও ফিজিক্যাল সম্পর্কও পাতাবে না। তুমি পারবে না। আমি জানতে চাইছি, অন্য কোনও ব্যক্তি...।

কী জানি!

শোনো শ্রাবণী, আমি তোমাকে ফ্র্যাঙ্কলি একটা কথা বলছি, এতদিন পরেও অন্য কোনও মেয়েকে, মানে, তোমার সম্পর্কে আমার মনে এমন একটা সফটনেস আছে, মানে, মাঝে মাঝে আমি ফিল করি, আই স্টিল লাভ ইউ। আই লাভ ইউ!

একটুও বিস্মিত কিংবা বিচলিত না হয়ে শ্রাবণী কয়েক মুহূর্ত সুদর্শনের দিকে চেয়ে থেকে শান্ত গলায় বলল, তা তো হতেই পারে। সাড়ে সাত বছর আমরা একসঙ্গে কাটালাম। সব কি নষ্ট হয়ে যায়!

তোমার সম্পর্কেও তো আমি ... তোমার যদি খুব অসুখ করে, আমি কি দৌড়ে যাব না! হয়তো এটার নাম মায়া। এক ধরনের টান। ভালোবাসাও হতে পারে। মিঠুকে কতদিন দেখি না। মিঠুর জন্য মাঝে মাঝে আমার বুকটা মুচড়ে ওঠে। ও রাত্তিরে আমাকে জড়িয়ে ধরে শুত।

জামসেদপুরে গিয়ে মিঠুকে মাঝে মাঝে দেখে এলেই তো পারো। কেউ কিছু বলবে না। কিংবা পুজোর ছুটিতে যদি কলকাতায় আসে ...

শ্রাবণী, কী হয়েছিল আমাদের মধ্যে? কেন বিয়েটা টিকল না? আমি কি কখনও খারাপ ব্যবহার করেছি তোমার সঙ্গে?

খারাপ ব্যবহার তো না। আমাদের মনের মিল হয়নি।

দেখো, অনেকেই এগুলো বলে, তারা ঠিক বুঝতে পারে না। বিয়ে ভেঙে যায়, যদি স্বামীটা অমানুষ হয়, বউয়ের ওপর অত্যাচার করে, কিংবা ডাউরির জন্য চাপ দেয়। অথবা স্ত্রী যদি অসতী হয়, শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারে, কিংবা মাঝখানে কোনও তৃতীয় ব্যক্তি থাকে, কোনও পুরুষ কিংবা মেয়ে। আমাদের মধ্যে তো সেরকম কেউ ছিল না।

ছিল।

ছিল? তার মানে! আই ক্যান সোয়্যার টু গড, আমার সঙ্গে অন্য কোনও মেয়ের সম্পর্ক ছিল না। আর তোমার সঙ্গেও অন্য কোনও পুরুষের ... না, আমি দেখিনি। টিটো প্রায়ই আসত, কিন্তু সেটা অন্য ব্যাপার ...

টিটো নয়। প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু অন্য একজন পুরুষ ছিল আমার জীবনে।

পুরুষ! তোমার জীবনে? নাম জানতে পারি?

রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ হু? কোথাকার লোক? কীভাবে তোমার সঙ্গে আলাপ হল?

রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ। দ্য রবীন্দ্রনাথ। সুদর্শন, তোমাদের পদবিও ঠাকুর। সেইজন্য মাসি তোমাকে ঠাকুর জামাই বলে। বিয়ের আগে তোমাদের পদবি জেনে আমি থ্রিলড হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, আমি ঠাকুরবাড়ির বউ হতে যাচ্ছি। পরে অবশ্য বুঝেছিলাম, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে তোমাদের কোনও সম্পর্ক নেই।

আমরা পাবনার ঠাকুর। আমি অবশ্য কখনও পাবনায় যাইনি। পদবির মিল তো থাকতেই পারে। শরৎ চাটুজ্যের মতন আরও তো কত চাটুজ্যে আছে। তারা সবাই কি সাহিত্যিক?

রবীন্দ্রনাথরা ছিলেন ব্রাহ্ম। তোমাদের মতন অনেক ঠাকুর ফ্যামিলিই হিন্দু। হয়তো মনে মনে তারা ব্রাহ্ম ঠাকুরদের এখনও অপছন্দ করে!

আমাদের বাড়িতে এই ব্যাপারে আমি কখনও কোনও আলোচনা শুনিনি। বাট, হোয়াট ডাজ ইট ম্যাটার? ব্রাহ্ম, হিন্দু, এসব কথা আসছে কেন? আমি ধম্মো ফম্মো নিয়ে কখনও মাথাই ঘামাইনি।

সুদর্শন, আমার কাছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমরা তো জামসেদপুরের প্রবাসী বাঙালি, আমরা যাতে আমাদের কালচার হারিয়ে না ফেলি, তাই বেশি বেশি করে আঁকড়ে ধরেছি। আমি হিন্দি ভালোই জানি, কিন্তু বাড়িতে সবসময় বাংলা কথা বলতে হত। না হলে বাবা বকতেন। বাবার

কথা খুব মনে পড়ছে। বাবা রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন। আমাদের ভাই-বোনদের সেই গান শোনাতেন। আমি ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতাম। পনেরো-ষোলো বছর বয়েস থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রেমে পড়ি। মনে হত, রবীন্দ্রনাথ আমার জীবনের সব কিছু জানেন। আমার মন খারাপ, রাগ-দুঃখ-অভিমান, তখন রবীন্দ্রনাথই আমার একমাত্র সঙ্গী। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বেশি আর কোনও পুরুষকে ভালোবাসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়!

পকেট থেকে সিগারেট বার করে, বেশ জোরে দেশলাইকাঠি জ্বেলে সুদর্শন বলল, হাউ ফানি! রবীন্দ্রনাথ টেগোর! লং ডেড অ্যান্ড গন। তাঁর সঙ্গে আমার কোনও প্রতিযোগিতা আছে নাকি! ভালোবাসো না তাঁকে যত খুশি! তার জন্য আমাদের মধ্যে ফাটল ধরবে কেন?

এতক্ষণ পরে শ্রাবণী একটু ঝুঁকে এসে সুদর্শনের একটা হাত ছুঁয়ে বলল, সত্যি কথাটা বলব? বিয়ের পর দু'-এক বছর তো ইউফোরিয়াতে কেটে যায়। তারপর দেখলাম, তোমাদের বাড়িতে কেউ রবীন্দ্রনাথের গান পছন্দ করে না। টিভিতে রবীন্দ্রসংগীত হলে বন্ধ করে দেয়। আমার বেডরুমে বসে ক্যাসেট বাজালেও তোমার বোনেরা ঠাট্টা ইয়ারকি করে। তুমি তো একেবারেই সহ্য করতে পারো না।

সুদর্শন বলল, আই মাস্ট অ্যাডমিট, রবীন্দ্রসংগীত আমার কাছে প্যানপ্যানানি মনে হয়। নিদার ক্লাসিকাল, নর মডার্ন। ইভন দা ফোক টিউনস আর অ্যাডালটারেটেড। যাই হোক, ইটস আ ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি। তোমার আর আমার গানের রুচি আলাদা হতেই পারে! আমি তো তোমাকে রবীন্দ্রসংগীত শুনতে বারণ করিনি। তুমি বেডরুমে বসে শুনতেই পারতে। আমি অন্য গান শুনতাম। আই প্রেফার ওয়েস্টার্ন মিউজিক।

আমি ঘরে বসে রবীন্দ্রসংগীত শুনলে, তুমি মাঝে মাঝে নাক দিয়ে একটা শব্দ করতে।

হোয়াট? নাক দিয়ে শব্দ মানে!

তুমি মীরাবাইয়ের কথা জানো নিশ্চয়ই? আমি যদিও তাঁর তুলনায় ধারেকাছেই আসি না। তবু আমার মনে হত, যে পরিবারে রবীন্দ্রনাথের সম্মান নেই, সেখানে আমার থাকাটাই তো আমার প্রিয় মানুষকে, মানে, আমার স্বামীর চেয়েও, আমার সারা জীবনের প্রেমিকের অপমান সহ্য করা।

শ্রাবণী, আমি তোমাকে ডিভোর্স করিনি। তুমিই আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে। সেটা কি শুধু এই ফ্লিমজি কারণে? রবীন্দ্রসংগীত!

সুদর্শন, এক একটা সত্যি কথা বলতে গিয়ে আমার বুক কাঁপে। মনে হয়, না বলাই ভালো। বলব?

বলো।

তুমি এক একবার রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে অবজ্ঞার ভাব দেখাতে, কিংবা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অশ্লীল হিউমার করতে, শান্তিনিকেতনের সেই রানি নামের পরিচারিকাটিকে নিয়ে গল্পটা, অমনি আমার ভ্যাজাইনাটা শুকিয়ে যেত। তোমার সঙ্গে মিলনের ব্যাপারটা কেমন তখন ভয়ের মনে হত।

মোড়া থেকে নেমে এসে, হাঁটু গেড়ে বসে সুদর্শন বলল, আই অ্যাপোলোজাইস। সেই জন্যই শেষের দিকে তোমাকে মনে হত কোল্ড। আমি কারণটা বুঝতে পারিনি। প্রথম দিকে তুমি এত ওয়ার্ম আর অ্যাগ্রেসিভ ছিলে! তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেন একটা ভূত? একজন ডেড পোয়েট? আই অ্যাম সরি। এখন থেকে আমি ভালো করে রবীন্দ্রসংগীত বুঝবার চেষ্টা করব। আই গিভ ইউ মাই ওয়ার্ড। আমি অন্য মানুষ হয়ে যাব।

কেন?

তার মানে?

এতদিন বাদে তুমি তোমার গানের রুচি বদলাবে! রবীন্দ্রনাথকে বুঝবে! বেশ তো। কিন্তু আমাকে ফিরিয়ে নিতে চাইছ কেন? আমি একটা সাধারণ মেয়ে, তোমার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারিনি, তুমি তো অন্য কোনও মেয়েকে ...

আই ওয়ান্ট ইউ!

হোয়াই!

বিকজ, মানে, আমি তোমাকে ত্যাগ করিনি। তুমিই নিজের ইচ্ছেয়, আমাদের একটা মেয়ে আছে, এখন আবার কেন আমরা একসঙ্গে থাকতে পারব না? কোর্টে যখন মামলা চলছিল, তখন আমার ইগো খুব স্ট্রং ছিল, তাই হয়তো কিছু খারাপ কথা বলেছি। কিন্তু শ্রাবণী, সেসব কথা সত্যি না। আমি এখনও তোমাকে, একটা পুরনো, হ্যাকনিড শব্দই ব্যবহার করছি, তোমাকে ভালোবাসি। এসো, আবার আমরা একসঙ্গে জীবন শুরু করি।

তা সম্ভব নয়, সুদর্শন।

কেন সম্ভব নয়?

সাধারণত কী হয়, স্বামী তার স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করে, স্ত্রীকে সম্মান দেয় না, তারপর ডিভোর্স হয়। তুমি আমার ওপর তা করোনি। আমি নিজেই তোমাকে ছেড়ে চলে এসেছি। তাতে তোমার মেল ইগোতে লেগেছে। লাগতেই পারে! অন্যরাও এটা ওসকাবে। যাই হোক, এখন আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ দু'দিন বাদেই তুমি আর আমি আবার দু'জনের স্বরূপ ধরব। আমি তোমার আন্তরিকতায় অবিশ্বাস করছি না। কিন্তু আমার আপত্তিটা অনেক গভীর। আমি তোমার সম্পর্কে শারীরিক আকর্ষণ একেবারে হারিয়ে ফেলেছি। এই যে তুমি আমার সামনে বসে আছ, এখন আমি যদি তোমাকে একটু চুমু খাই, দেখবে ঠোঁট একেবারে ঠান্ডা।

চুমু ব্যাপারটা আমিও ভেবেছিলাম। এখন তুমি বলার পর আর খেতে ইচ্ছে করছে না। শ্রাবণী, আমি এই সেপ্টেম্বরে জার্মানি চলে যাচ্ছি।

সেই কথাটাই বলতে এসেছিলে?

তোমাকেও নিয়ে যেতে এসেছিলাম। লাইপজিগ ইউনিভার্সিটিতে ওরা স্বামী-স্ত্রী ও একটা বাচ্চার অ্যাকোমোডেশন দিতে রাজি। আমি মিঠুর লেখাপড়ার কথা ভেবেই ...

সুদর্শন, তোমার মনে আছে তো, মাত্র দশ বছর বয়েসে আমি মা-বাবার সঙ্গে ইংলন্ডে গিয়েছিলাম। আর আমার ওসব দেশে যেতে ইচ্ছে করে না। মিঠুকেও আমি অন্তত স্কুল বয়েসটা এ-দেশেই পড়াতে চাই।

ঠিক আছে। বুঝলাম। এবার কি আমার বন্ধুর সঙ্গে একটু কথা বলবে? অমিত আমার বিজনেস পার্টনার, অ্যান্ড আ গুড সোল। শুধু দুটো কথা বলবে তোমাকে!

শ্রাবণী উঠে দাঁড়িয়ে করুণভাবে বলল, কেন তোমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে হবে? তুমি আমাকে আর কষ্ট দিয়ো না।

সুদর্শন বলল, কষ্টের কী আছে! ও তোমাকে অনেস্টলি একটা প্রস্তাব দেবে। তুমি তোমার মতামত জানাবে।

শ্রাবণী বলল, অনেক কথা শোনার পর মনে হয়, না শুনলে কত ভালো হত! না মানলেও মনে গেঁথে যায়। মনের মধ্যে একটা কাঁটা ফুটে থাকে।

সুদর্শন বলল, তবু চলো, প্লিজ, দু-তিন মিনিট। আমি কথা দিচ্ছি, নাটকীয় কিছু হবে না!

আট

হেমকান্তি জানেন না, এ-বাস কোথায় যাবে। তাঁর নিজেরও কোনও গন্তব্যের কথা মনে নেই। উঠে পড়েছেন একটা দোতলা বাসে, একেবারে সামনের কাচের কাছে একটা জায়গা পেয়েছেন।

বাড়িতে পরার মতন একটা বড় ঘেরের পাজামা আর একটা ইস্ত্রিহীন পাঞ্জাবি গায়ে। জুতোহীন পা। তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় কেউ তাঁকে দেখেনি।

তাঁর মানসিক অবস্থা আগের চেয়েও খারাপ।

সেদিন মঞ্চে বসে পেছনের সারিতে আফতাবকে দেখার পর তিনি যে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, তারপর তিনি আবার ফিরে যান নার্সিংহোমের দিনগুলিতে। অনেক কিছুই ফের লুপ্ত হয়ে গেছে স্মৃতি থেকে।

একজন চিকিৎসক এসে ওষুধপত্র দিয়েছেন বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু কাজ হয়নি, এখন অনেক কথাই তিনি বলতে পারেন না, ঝিল্লি, টিটো, জয়ীকেও চিনতে পারেন না। নিজের ঘরটাও তাঁর অচেনা।

কেন তিনি বাড়ি থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে বড়রাস্তায় বাসে উঠেছেন, তাও তিনি জানেন না।

এখন মধ্যদুপুর, বাসে তেমন ভিড় নেই। হেমকান্তির একমাত্র শারীরিক বোধ আছে, খিদে। কিন্তু খিদে পেলে কী করতে হয়, সে-বোধটাও আপাতত উহ্য।

যে-শহরে হেমকান্তি জন্মেছেন, জীবনের অনেকগুলি বছর কাটিয়েছেন, এখন সেই শহরের পথের দৃশ্যও তাঁর অপরিচিত। এ যেন এক নতুন দেশ ভ্রমণ।

অনেকখানি স্মৃতিহারা হলেও হেমকান্তি এখন কী চিন্তা করছেন? জন্মান্ধ আর বোবা-কালারা কী চিন্তা করে তা ঠিক জানা যায় না। বদ্ধ উন্মাদদের মনের গতি-প্রকৃতির কথাই বা কে বলতে পারে! হেমকান্তি এর কোনওটাই নন। কয়েকটা দৃশ্য তাঁর মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে, তার সঙ্গে ঘটমান বর্তমানের কোনও সম্পর্ক নেই অবশ্য।

একটা রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চে বসে আছেন হেমকান্তি। তাঁর বাঁ পায়ের গোড়ালিতে অসহ্য ব্যথা। পাজামার অনেকটাই রক্তে চটচটে। তিনি

মাথা নেড়ে নেড়ে কষ্ট সহ্য করার চেষ্টা করছেন। একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা থমকে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে।

ওই পর্যন্তই। মহিলাটি কী বললেন, তা জানার জন্য হেমকান্তি মাথা ঠুকতেও রাজি আছেন। কিন্তু দৃশ্যটা অকস্মাৎ ওখানেই শেষ।

দ্বিতীয় দৃশ্যটি কলকাতার এক বস্তির। টিপিটিপি বৃষ্টিতে কাদামাখা সরু পথ, গলায় লাল রুমাল বাঁধা, গেঞ্জি আর প্যান্ট পরা একটা লোক রিভলভার হাতে নিয়ে ছুটে গেল। হেমকান্তি নিজে সেখানে নেই, এটা একটা সিনেমার দৃশ্যও হতে পারে।

আর কিছুই মনে নেই, এই দৃশ্য দুটির মর্মও দুর্বোধ্য, তবু, হেমকান্তি কিছুতেই এ-দৃশ্য দুটি হারাতে চান না। তিনি ক্যাসেট রেকর্ডার রি-ওয়াইন্ড করার মতন, এই দৃশ্য দুটিই দেখছেন বারবার।

বাসটা যাচ্ছে চৌরঙ্গি দিয়ে, এক-দিকে হর্ম্যসারি, অন্যদিকে ময়দান। ফাঁকা আকাশে অনেক চিল উড়ছে। ময়দানে এক পাল ভেড়া, তাদের গায়ে লাল লাল ছোপ।

একসময় কনডাক্টর এসে টিকিট চাইলেন।

হেমকান্তি টিকিট কথাটার মানে ভুলে গেছেন। তিনি লোকটির মুখের দিকে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

দু'-তিনবার একই কথা বলার পর লোকটি অধৈর্য হয়ে বললেন, কই দাদা, পয়সা বার করুন!

পয়সা কথাটা কিন্তু হেমকান্তি বুঝলেন।

মানবসভ্যতার অনেকখানিই জুড়ে আছে পয়সা নামে বস্তুটি নিয়ে নানান উত্থান-পতন, তাই জিন-বাহিত স্মৃতিতে এই শব্দটি সহজে মুছে যায় না। পাগলরাও পয়সা বোঝে বোধহয়।

ইনস্টিংক্ট চালিত হয়ে হেমকান্তি পকেটে হাত দিলেন। দুটি পকেটই ফাঁকা।

হেমকান্তি বিড়বিড় করে কী যেন বললেন।

কনডাক্টরটি ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী দাদা, কী বললেন?

হেমকান্তি উত্তর দেবার মতন কথা খুঁজে পাচ্ছেন না। পকেট থেকে বার করে আনলেন হাত, মাথা নাড়লেন দু'দিকে।

কনডাক্টরটি বুঝতে পেরে বললেন, পয়সা নেই? না থাকতেই পারে।

সবসময় পকেটে পয়সা রাখতেই হবে, এমন মাথার দিব্যি কেউ দেয়নি। কিন্তু খালি পকেটে কি বাসে চাপতে হয়? অবশ্য, অনেকেই ভাবে, সরকারি সম্পত্তি মানে মামাবাড়ির ব্যাপার, সেখানে পয়সা লাগবে কেন? কিন্তু আজকাল মামাবাড়ি যে বড্ড কড়া হয়েছে, ভাগনেদের আর খাতির করছে না।

অন্য যাত্রীরা বেশ উপভোগ করছে কনডাক্টরের এই বাগ্মিতা।

তিনি সবার দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আবার বললেন, কিন্তু এসব তো চ্যাংড়া ছেলেরা করে। দাদার তো বেশ বয়েস হয়েছে। দেখে মনে হয় ...। রেলের বিনা টিকিটের যাত্রীদের পুলিশে ধরিয়ে দেবার নিয়ম আছে। ট্রামে-বাসে তো আর তা নেই। থাকা উচিত ছিল কি না, আপনারাই বলুন! আমরা বড়জোর বাস থেকে নামিয়ে দিতে পারি। নামুন, সামনের স্টপেই নেমে পড়ুন। বিনা পয়সায় অনেক হাওয়া খেয়েছেন।

হেমকান্তির পাশের বয়স্ক যাত্রীটি নম্র স্বরে বললেন, পয়সা আনতে ভুলে গেছেন? কোথায় যাবেন বলুন। আমি টিকিটটা কেটে দিচ্ছি।

হেমকান্তি কোনও উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর একটা বন্য প্রাণীর মতন সামনের কিছুই গ্রাহ্য না করে দ্রুত নেমে গেলেন নীচে। একটা লাল বাতির কাছে থেমে আছে বাস, তিনি নেমে পড়লেন রাস্তায়। বাসটা চলন্ত হলেও বোধহয় তিনি লাফিয়ে নামতেন।

কল্পনার দৃশ্যে দেখেছিলেন পায়ে ব্যথা, পাজামা রক্তে ভেজা, এখন সেটাই যেন বাস্তব। তিনি হাঁটতে লাগলেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

হেমকান্তি নেমেছেন লিন্ডসে স্ট্রিটের মুখে, রাস্তা পেরিয়ে হাঁটতে লাগলেন সোজা। তারপর কখনও ডাইনে, কখনও বাঁয়ে, কোনও ঠিক নেই। ভাগলপুর থেকে একটা মোষকে এনে এরকম জায়গায় ছেড়ে দিলেও তো সে এরকমভাবেই যাবে। হেমকান্তির কোনও পথের দিশা নেই। ভবানীপুরের বাড়িতেও তিনি ফিরতে পারবেন না, যাওয়ার ভাড়া নেই তো বটেই, সেই বাড়ির কথাও মনে নেই তাঁর।

এ-রাস্তা সে-রাস্তা ঘুরে হেমকান্তি একসময় এসে উপস্থিত হলেন ওয়েলিংটনের মোড়ে। তাঁর মুখে কোনও ভয়ের চিহ্ন নেই, যেন এভাবে ঘুরে বেড়ানোই স্বাভাবিক। উদরে খিদের আগুন ঝিলিক দিচ্ছে মাঝে মাঝে, তাও তিনি গ্রাহ্য করছেন না।

এ এক এমনই শহর, যেখানে সম্পূর্ণ অচেনা কোনও লোকও হঠাৎ কোথাও থেকে উদয় হয়ে কিছু কথা বলতে চায়। বয়েস বোঝা যায় না এমন একজন প্যাংলা লোক হেমকান্তির পাশ ঘেঁষে চলতে চলতে বলল, ফিফটি ফিফটি, চলবে? কাছেই ঘর আছে।

হেমকান্তি কিছুই বুঝলেন না।

লোকটি বলল, পঁচিশ পার্সেন্ট অ্যাডভান্স। বেশি বৃষ্টি হলে আমার লস। আর লোডশেডিং হলে ফ্রি।

অনেক সুস্থ, সাধারণ লোকই এসব বোঝে না, হেমকান্তি তো একেবারেই অক্ষম।

প্যাংলা লোকটি আরও কিছু বলত, এমন সময় উলটোদিকের এক গাড়িবারান্দা থেকে ততোধিক একজন প্যাংলা লোক তাকে কী বলে যেন ডাকল। সে লোকটির মুখ খুশিতে জ্বলজ্বল করছে।

হেমকান্তি ওয়েলিংটন ছেড়ে এগোতে লাগলেন মৌলালির দিকে।

এখানে একবার অবচেতনের কথা তুলতেই হয়।

স্মৃতিভ্রষ্ট হেমকান্তি কোথায় যাবেন, তার কোনও ঠিক নেই। কনডাক্টর নামিয়ে না দিলে তিনি শ্যামবাজার চলে যেতে পারতেন। বিনা উদ্দেশ্যে হাঁটতে হাঁটতে ওয়েলিংটনের মোড়ে এসে মৌলালির বদলে কলেজ স্ট্রিটের দিকেও যাওয়া স্বাভাবিক ছিল। গণেশ অ্যাভিনিউ দিয়ে বেঁকে যাওয়াও অস্বাভাবিক কিছু ছিল না।

তাঁর মন যে কোনও দিঙ্‌নির্দেশ করছে না, তা একশো ভাগ ঠিক। তবু তিনি গেলেন মৌলালির দিকে। হঠাৎ একসময় বাঁ দিকের একটা গলিতে ঢুকেই প্রথম বাড়িটার দরজার সামনে দাঁড়ালেন। তিনি বিনা উদ্দেশ্যে ঘুরছেন, অথচ এখানে আসারই যেন কথা ছিল।

বাড়িটা বেশ প্রাচীন। বাইরের দেওয়াল পলেস্তারা খসা। কলিংবেল নেই।

হেমকান্তি দরজায় কড়া নাড়লেন।

একটু পরেই দরজা খুললেন একজন মহিলা। তেমন কিছু বয়েস নয়, কিন্তু কোনও সাজ-পরিচর্যা নেই, একটা মলিন শাড়ি পরা। ব্লাউজের নীচে বক্ষবন্ধনী নেই, কিঞ্চিৎ স্থূলতার দিকেই শরীরটা যাচ্ছে।

দরজা খোলার পর অপরিচয়ের চিহ্ন ফুটল না তাঁর মুখে। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন, হেম?

হেমকান্তির ঠোঁট কাঁপছে। প্রথমে তিনি কিছু বলতে পারলেন না। যেন সমস্ত সত্তা মুচড়ে তিনি ফিরিয়ে আনতে চাইছেন স্মৃতিকে।

মহিলা আবার বললেন, হেম!

হেমকান্তি এবার খুব কাতরভাবে বললেন, দমো, দমো, দময়ন্তী?

মহিলা বললেন, হ্যাঁ। মনে পড়েছে? এসো ...

একটা সরু পথের দু'পাশে বন্ধ দরজা। তারপর একটা চাতাল।

কোনাকুনি সেই চাতালটা পেরিয়ে এক চিলতে একটা বারান্দা, একটা খোলা দরজা, এক পাশে একটা তোলা উনুন, নিবন্ত।

ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। প্রথমে হেমকান্তি কিছুই দেখতে পেলেন না।

উত্তর ও মধ্য কলকাতার কিছু কিছু বাড়ির একতলার ঘর এরকমই, আলো-হাওয়ার কিছুই ঢোকে না। তবু এরকম ঘর বানানো হত কেন? সম্ভবত ভৃত্যদের জন্য, যাদের ওসবের প্রয়োজন নেই। এখন সেই ভৃত্যতন্ত্রের অবসান হয়ে গেছে।

অন্ধকারের মধ্য থেকে একজন কেউ গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, কে এসেছে?

দময়ন্তী নাম্নী মহিলা বললেন, দ্যাখো তো চিনতে পারো কি না!

হেমকান্তিকে তিনি বললেন, সাবধান, চৌকাঠ আছে, হোঁচট খেয়ো না।

হেমকান্তির হাত ধরে তিনি তাকে ভেতরে নিয়ে এলেন।

হেমকান্তি এবার কোনওক্রমে দেখলেন, খাটের ওপর পাশ ফিরে শুয়ে আছে এক ব্যক্তির আদল। মুখ, চোখ কিছুই বোঝা যায় না।

সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দয়মন্তী বললেন, হেম, তুমি ওই খাটের ওপরেই বসো। চেয়ার টেয়ার কিছু নেই।

শুয়ে-থাকা পুরুষটি বেশ লম্বা, লুঙ্গি পরা, খালি গা, বুকের খাঁচাটি স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ নাক, চশমার একটা ডাঁটি সুতো দিয়ে বাঁধা।

একটা জীবন্ত কঙ্কালের মতন আস্তে আস্তে উঠে বসে তিনি বললেন, হেম! তুই এখানে কী করে এলি? এ-বাড়ি চিনলি কী করে?

দময়ন্তী বললেন, ওর খালি পা, কী যেন হয়েছে, উসকোখুসকো চেহারা...

লোকটি বললেন, হয়েছে, হয়েছে, ওর অনেক কিছু হয়েছে, আমি জানি।

বিছানায় নিজের পাশে চাপড় মেরে বললেন, বস, এখানে বস। তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে।

দময়ন্তী নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

লোকটি বললেন, ক'দিন ধরে শরীরটা খুব খারাপ হয়েছে, বুঝলি! শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। টিবি ফিবি কিছু নয়, হার্টও ঠিক আছে, শুধু লাংসেই কিছু একটা, তবু তো স্মোকিং ছাড়তে পারিনি, নিজের ওপরেই এত রাগ হয়।

তিনি বালিশের তলা থেকে একটা বিড়ির কৌটো আর দেশলাই বার করলেন।

দময়ন্তী বললেন, এখন বিড়ি ধরিয়ো না, বিশ্ব। তিনটে বেজে গেছে। তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে বলে খাবার দিইনি। এখন দিচ্ছি, কথা বলতে বলতে খেয়ে নাও!

বিশ্বদেব তবু একটা বিড়ি ধরিয়ে বললেন, ঠিক আছে, দাও।

ঘরের এক কোণ থেকে দময়ন্তী একটা প্লেট নিয়ে এলেন, তাতে চারখানা রুটি, আর খানিকটা ঢ্যাঁড়শের তরকারি।

প্লেটটা এক হাতে নিয়ে বিশ্বদেব বললেন, কাঁচা লঙ্কা দিলে না? নেই? আচারও নেই? ঠিক আছে! তোমার জন্য আর রুটি আছে তো?

দময়ন্তী বললেন, আগেই আমি খেয়ে নিয়েছি।

বিশ্বদেব বললেন, উঁহুঁ, বিশ্বাস হচ্ছে না। পতিব্রতা নারী কি স্বামীর আগে খায়? আর রুটি নেই, তাই না?

দময়ন্তী বললেন, পতিব্রতা! আমি অতক্ষণ খিদে সহ্য করতে পারি না।

বিশ্বদেব হা হা করে হেসে উঠলেন, এরকম অসুস্থ চেহারা, তবু তাঁর গলার আওয়াজটা বেশ গমগমে। অনেকটা সত্যজিৎ রায়ের মতন।

তিনি বললেন, তুমি খিদে সহ্য করতে পারো না? আমি জানি না? মুখ দেখে বুঝতে পারছি, কিছুই মুখে দাওনি। এইখান থেকেই নাও। হেমের সামনে লজ্জা করে কী হবে? নাও! না হলে আমি প্লেটটা ছুড়ে ফেলে দেব!

বিড়িটা মেঝেতেই ফেলে, বিশ্বদেব একটা রুটির আধখানা ছিঁড়ে, একটু তরকারি মাখিয়ে এগিয়ে দিলেন দময়ন্তীর দিকে।

দময়ন্তী বললেন, হেম, তুমি খেয়ে এসেছ?

বিশ্বদেব বললেন, আরে ও বড়লোকের ছেলে, লাঞ্চের আগে সুপ খায়। ও এতক্ষণ না খেয়ে থাকবে কেন? জানিস হেম, যখন অল্প বয়েস ছিল, জঙ্গলে-পাহাড়ে ঘুরতাম, মাঝে মাঝেই তো খাওয়া হত না, কিছুই কষ্ট হত না। খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, তবু ভুলে যেতাম খেয়ে নিতে। আর এখন, বয়েস

বাড়ার এই দোষ, সকালে উঠেই মনে হয়, আজ কী খাব? ঠিকমতন খাবার জুটবে তো?

দময়ন্তী বললেন, আমরা কি ভদ্রতা-সভ্যতা একেবারে ভুলে গেছি? হেম দাঁড়িয়ে আছে, ওকে কিছু অফার করা হয়নি, নিজেরা খেয়ে যাচ্ছি রাক্ষসের মতন। ওকে অন্য কিছুও ...

বিশ্বদেব আবার হেসে বললেন, কী অফার করবে? রাজভোগ? আইসক্রিম? নে হেম, তুইও এক টুকরো রুটি খা। ভাগাভাগি করে হয়ে যাবে।

হেমকান্তি লোলুপভাবে প্লেটটার দিকে তাকাচ্ছিলেন। বিশ্বদেব তাঁকে ডাকতেই তিনি এগিয়ে এসে রুটি ছেঁড়ায় হাত লাগালেন।

চারখানা রুটি, তিনজনের খিদে। প্রায় চোখের নিমেষে শেষ হয়ে গেল।

বিশ্বদেব আঙুল চাটতে চাটতে বললেন, ভিন্ডির তরকারিটা বেড়ে হয়েছিল। আর নেই, না?

দময়ন্তী দু'দিকে মাথা নাড়লেন।

বিশ্বদেব বললেন, শেষ। এই শেষ কথাটার মানে জানিস হেম? শেষ মানে, একেবারে শেষ। আজ রাত্তিরে আমরা কী খাব তার ঠিক নেই। সম্ভবত কিছুই জুটবে না। এরকম স্টার্ভেশন আগে কখনও ফেস করিনি। কত মানুষ না খেয়ে থাকে, এবার আমাদেরও সেই অভিজ্ঞতা হচ্ছে। কিন্তু আমি এই অভিজ্ঞতা চাই না। এটা সে বয়েস না। জানি, এখন ঠিক মতন খেতে না পেলে আয়ু কমে যাবে হু হু করে। মরতে কে চায়? এই মধ্যবয়সেই বেঁচে থাকার ব্যাকুলতাটা বাড়ে। তোর কাছে টাকাপয়সা কিছু আছে তো, আজ ধার দিয়ে যা।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, আমি একাই বকবক করে যাচ্ছি। তুই কিছু বলছিস না কেন?

দময়ন্তী বললেন, এসে অবধি ও একটাও কথা বলেনি।

জল গড়িয়ে পড়ছে হেমকান্তির দু'চোখ দিয়ে।

খুব ঝড়ের সময় যেমন চিৎকার করে কথা বললেও শোনা যায় না, তেমনই বুকের মধ্যে তোলপাড়। হেমকান্তি সব কিছুই অনুভব করছেন, বিশ্বদেব ও দময়ন্তীকে চিনতেও পেরেছেন, তবু প্রকাশ করতে পারছেন না কিছু। ভাষা হারিয়ে গেছে।

বিশ্বদেব বললেন, এ কী রে, কেঁদে ফেললি কেন! অ্যাঃ! পুরুষমানুষের কান্না আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না। চোখ মুছে ফেল।

দময়ন্তী বলল, কেন, কেন, পুরুষমানুষেরা কাঁদতে পারবে না কেন? কান্নার আবার মেয়ে আর পুরুষ কী!

বিশ্বদেব হালকাভাবে বললেন, আমাদের অবস্থা দেখে ওর এমন কষ্ট হচ্ছে যে ওর একেবারে চোখে জল এসে গেল? এরকম শস্তা সেন্টিমেন্ট আমার বন্ধুদের মানায় না। আমি সেই ছেলেবেলার পর... কখনও কেঁদেছি বলে মনেই পড়ে না।

দময়ন্তী বললেন, সেটা এমন কিছু গুণের কথা নয়। ওই জন্যই তোমার ভেতরটা এমন শুকনো, রসকষহীন। যেসব পুরুষ কাঁদতে পারে, তারা ভালোবাসতেও পারে। তোমার মতন নয়।

বিশ্বদেব কৃত্রিম বিস্ময়ে অনেকখানি ভুরু তুলে বললেন, আমি ভালোবাসতে পারি না? এতখানি জীবন তো এই ভালোবাসার চক্করেই কেটে গেল। এই যে তোমাকে নিয়ে ফেঁসে গেছি।

দময়ন্তী বললেন, তুমি ফেঁসে গেছ, না আমি?

বিশ্বদেব বললেন, তুমি আমাকে ছেড়ে কেটে পড়তে পারতে ঠিকই। তাতে তোমার অনেক সুবিধে হত, ঝাড়া হাত-পা থাকতে পারতে। কিন্তু যেতে পারোনি কেন? আমি যে ভালোবাসার নাইলন সুতো দিয়ে তোমাকে বেঁধে রেখেছি!

মাথা দোলাতে দোলাতে কথা বলতে বলতে নিজের এই রসিকতায় হা হা করে হেসে উঠলেন বিশ্বদেব।

বিছানার চাদরেই এঁটো হাতটা মুছতে গেলে দময়ন্তী বললেন, এই, এই, ও কী করছো? উঠে হাত ধুয়ে নাও!

এ-নির্দেশে পাত্তা না দিয়ে বিশ্বদেব বললেন, যে-টুকু খাবার দিলে মাই ডিয়ার, ওতে আর ফর্মালি হাত ধোওয়া টোওয়া পোষায় না।

তিনি আবার বিড়ি ধরিয়ে কাশলেন দু'বার।

দময়ন্তী একটা ভিজে গামছা এনে হেমকান্তির ডান হাতটা মুছিয়ে দিলেন। তারপর নরমভাবে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী হয়েছে, হেম?

উত্তর দেবার শক্তি নেই হেমকান্তির। তাঁর দু'চোখ দিয়ে জলের ধারা থামছে না।

দময়ন্তী তাঁর আঁচল দিয়ে হেমকান্তির চোখ মুছে দিতে লাগলেন।

বিশ্বদেব বললেন, যদি একটা বাচ্চা ছেলে হত, তা হলে তোমার এই আঁচল

দিয়ে মুছে দেওয়া বেশ একটা মধুর দৃশ্য হত, কিন্তু এত বড় একটা ধেড়ে লোক, তাকে এইভাবে, যাই বলো, ব্যাপারটা খুব ভালগার লাগছে। কী হল লোকটার? কথা বলছে না কেন?

দময়ন্তী বললেন, ওর নিশ্চয়ই কিছু একটা কষ্ট হচ্ছে!

বিশ্বদেব বললেন, অনেককাল দেখা নেই, হঠাৎ এসে হাজির। ও আমাদের এই বাড়ি চিনলই বা কী করে? আগে কখনও আসেনি।

দময়ন্তী বললেন, একবার এসেছিল। আমরা যখন এই ঘরটা ভাড়া নিই, সেই প্রথম দিনে হেম এসেছিল সুকৃতি চ্যাটার্জির সঙ্গে। আমাদের এই বিছানার চাদরটা হেমই কিনে এনেছিল।

বিশ্বদেব বললেন, সে-ও তো বছর দু'-এক আগে, আমার মনে নেই। এসব চাদরটাদর দেওয়ার কথা মেয়েরাই মনে রাখে। তা আজ হঠাৎ আবার এল, পথ ভুলে নাকি? আমাদের কাছে ওর আসবার তো কোনও কারণ নেই।

তারপর গলা চড়িয়ে হুংকার দিয়ে তিনি বললেন, এই তোর কী হয়েছে রে শুয়ার? বাক্যি হরে গেছে নাকি?

তিনি তাঁর শিরাবহুল হাতের পাঞ্জা ও লম্বা লম্বা আঙুল দিয়ে জোরে এক থাপ্পড় কষালেন হেমকান্তির গালে।

দময়ন্তী হেমকান্তিকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বললেন, এই এই, কী করছ! ডোন্ট বি সো ক্যাড, বিহেভ ইয়োরসেলফ!

বিশ্বদেব তবু বিরক্তভাবে বললেন, আমি স্ট্রেট ফরোয়ার্ড মানুষ। আমার বেশিক্ষণ ন্যাকামি সহ্য হয় না। কিংবা ও কি পাগল হয়ে গেছে? শুনিনি তো কারও কাছে।

দময়ন্তী বললেন, কার কাছে শুনবে? কেউ কি আসে আর তোমার কাছে? তোমার কথাবার্তা কেউ সহ্য করতে পারে না। তোমার জিভই তোমার শত্রু।

বিশ্বদেব বললেন, যদি সত্যিই পাগল হয়ে গিয়ে থাকে, এখন আমরা ওকে সামলাব কী করে! আমরা মরছি নিজেদের জ্বালায়।

চড় খেয়ে কিন্তু হেমকান্তির চোখে আর জল আসেনি। কাতরভাবে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বিশ্বদেবের দিকে।

বিশ্বদেব জিজ্ঞেস করলেন, কী রে হেম, তুই হঠাৎ চলে এলি, আমাদের জন্য কোনও খবর আছে?

হেমকান্তি এবার দু'দিকে মাথা নাড়লেন।

বিশ্বদেব আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুই নিজে নিজেই এসেছিস, না কেউ তোকে পাঠিয়েছে?

আবার দু'দিকে মাথা নাড়লেন হেমকান্তি।

বিশ্বদেব বললেন, আমার কথা তো বুঝতে পারছে মনে হয়। কিন্তু মুখে কোনও শব্দ নেই। পাগলরাও তো এক-এক সময় খুব বকবক করে। ও কোথায় থাকে, তাও তো আমরা জানি না।

দময়ন্তী বলল, আমি শুনেছি, ও বোসদাদের পাড়াতেই কোথাও থাকে। ভবানীপুরের দিকে।

মুখ বিকৃত করে বিশ্বদেব বললেন, বোসদা! নাম শুনলেই গা জ্বলে যায়। ফুল অফ কনসিট। যাই হোক, এখানে তো ওকে রাখা যাবে না, তুমি ভবানীপুরে ওকে পৌঁছে দিয়ে এসো। বাসভাড়া কোথায় পাবে? কী রে হেম, তোর কাছে টাকাকড়ি আছে তো?

পূর্ববৎ মাথা নাড়লেন হেমকান্তি।

বিশ্বদেব বললেন, এ যে দেখছি সব কথাতেই দু'দিকে মাথা নাড়ে। হাবা হয়ে গেছে। আমি কিন্তু বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারব না। দময়ন্তী, তুমি ওর পকেট সার্চ করে দেখো, টাকাপয়সা কী আছে!

দময়ন্তীর পক্ষে একজন পুরুষের পকেটে হাত ঢোকানো সম্ভব নয়। তাঁর সহবত অন্যরকম।

তিনি বললেন, এখন থাক না, আমি সন্ধের পর...

বিশ্বদেব নিজেই ঝুঁকে পড়ে হেমকান্তির দু'পকেট খুঁজলেন। একটা কাগজের টুকরো পর্যন্ত নেই।

বিশ্বদেব বললেন, ও বড়লোকের ছেলে, কিছু টাকাকড়ি না নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে, তা হলে কি সত্যিই পাগল? এ তো মহা ফাঁপরে পড়া গেল। সন্ধে পর্যন্ত এখানে, তারপরেই বা তুমি কী করবে?

দময়ন্তী বললেন, সন্ধের পর আজ নির্ঘাত টাকা পাব।

বিশ্বদেব বললেন, সে গুড়ে বালি। আজ কী বার, বিষ্যুদবার না? বিজনেসম্যানরা বিষ্যুদবার ঘর থেকে টাকা বার করে না।

হেমকান্তির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, জানিস, দময়ন্তী এক বাড়িতে টিউশনি করে, দুটি মেয়েকে ফিজিক্স আর অঙ্ক পড়ায়। আট শো টাকা পায় কিন্তু এমন কঞ্জুষ, মাসের এগারো তারিখ হয়ে গেল, আমি বলেছি, ও ছাতার

মাথা কাজ ছেড়ে দিতে! আমরা এখন গরিব হয়ে গেছি বটে, ভিখিরি তো নই! রোজ সন্ধেবেলা দময়ন্তী বেরিয়ে যায়, আমি পাখির ছানার মতন হা-পিত্যেশ করে বসে থাকি। রোজই ও খালি হাতে ফেরে!

দময়ন্তী চাপা ঠোঁটে হেসে বললেন, আমাকে ঠিক সময় মাইনে দেয় না বটে, কিন্তু প্রত্যেকদিন চা বিস্কুট খেতে দেয়! সেইটুকু অন্তত আমার লাভ!

বিশ্বদেবও হেসে বললেন, হ্যাঁ, তুমি চা খেয়ে ফেরো, আর আমি শালা...স্ত্রীর রোজগারের ওপর নির্ভরশীল স্বামী, টিপিক্যাল পঞ্চাশ বছর আগেকার বাংলা ছোটগল্প...নাঃ, এবার আমাকে একটা কিছু করতেই হচ্ছে!

খাট থেকে নেমে দাঁড়ালেন বিশ্বদেব। তাঁর লম্বা শরীরের খাঁচাটা আরও প্রকট হল।

ঘরের কোণের আলনা থেকে একটা পাঞ্জাবি নিয়ে গায়ে চড়িয়ে বললেন, আমি বেরুচ্ছি।

দময়ন্তী বললেন, কোথায় যাবে? কয়েকদিন আগেই তো কাশতে কাশতে রাস্তায় বসে পড়েছিলে।

বিশ্বদেব বললেন, একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে না? আজ রাত্তিরে মাটন বিরিয়ানি খেতে চাই। সঙ্গে কয়েক ঢোক হুইস্কি। এত দারিদ্র্য ফারিদ্র আর সহ্য হচ্ছে না। এনাফ ইজ এনাফ। আমি ঠিক টাকা জোগাড় করে আনব।

তারপর তিনি হেমকান্তির থুতনি ধরে বললেন, এর মধ্যে তুই আবার ভাগ বসাতে এলি কেন ভাই? এত তো সামলাতে পারব না! চল, তোকে মৌলালির মোড়ে ছেড়ে দিয়ে আসি। রাস্তার পাগলকে অন্য কেউ না কেউ সাহায্য করবে আশা করি। চল...

দময়ন্তী দৃঢ়ভাবে বললেন, না, তুমি এখন কোথাও যাবে না। শুয়ে থাকো, আমি কাশির ওষুধ দিচ্ছি। হেমও শুয়ে থাকুক। বিকেলের পর দেখা যাবে।

বিশ্বদেব বললেন, আজও তুমি আমায় না খাইয়ে রাখবে? পারব না, আমি আর পারব না।

দময়ন্তী বললেন, টিউশনির বাড়িতে যদি আজও টাকা না দেয়, আমি ঋতেনদার কাছে যাব। কিছু টাকা পাওয়া যাবে ঠিকই।

বিশ্বদেব ভুরু কুঁচকে দময়ন্তীর দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে বললেন, ঋতেন? তুমি তার সঙ্গে শোবে। আই সাপোজ আই শুড নট মাইন্ড?

দময়ন্তী বললেন, বোকার মতন কথা বোলো না। শুতে হবে কেন?

বিশ্বদেব বললেন, ঋতেন তোমার বহুদিনের প্রেমিক না? এখনও ছুঁক ছুঁক করে। অবশ্য এক-আধবার অন্য কারও সঙ্গে শুলে কী-ই বা আসে যায়!

দময়ন্তী বললেন, পুরনো প্রেমিকের কাছে গিয়ে প্রথমেই যদি টাকা চাওয়া যায়, অমনি তার প্রেম টেম শুকিয়ে যায়। শরীর ঠান্ডা হয়ে যায়। টাকা দিয়ে ওসব করা তো বাজারের মেয়েদের মতন, তাতে জয়ের আনন্দ নেই। ঋতেনদা আমাকে আর ছুঁতেই চাইবে না।

তবু টাকা দেবে?

হ্যাঁ, দেবে। খানিকটা গুটিয়ে যাবে। আমি এক হাজার টাকা চাইলে বলবে, অত তো নেই, দুশো নিয়ে যাও। আমি বলব আমার পাঁচশো টাকা খুবই দরকার ঋতেনদা। তার থেকে আর কমাবেন না। তা ছাড়া, আমি তো ধার হিসেবে চাইব, দান তো নয়।

আমরা ছেলেবেলায় কারও কাছে কিছু ধার করলে বলতাম, শোধ দিই বা না দিই কথায় ঠিক রাখব!

আমি এ পর্যন্ত যার কাছে ধার করেছি, তার প্রতিটি পাইপয়সা পর্যন্ত শোধ দেব একদিন না একদিন। ঠিকই দেব।

তুমি, তুমি সত্যি সত্যি ঋতেনের কাছে গিয়ে মুখ ফুটে টাকা চাইবে, অ্যাম আই টু বিলিভ ইট? তুমি পারবে না। এটা তোমার নেচারে নেই।

মানুষের নেচারও তো বদলায়! আজ আমি আগেই ঠিক করে রেখেছি, এই একটা জায়গা থেকে শিয়োর কিছু টাকা পাওয়া যাবে।

অল রাইট। তুমি চেষ্টা করে দেখো, আমিও বেরুচ্ছি। জয়ব্রত আমাকে একবার কিছু অনুবাদের কাজ অফার করেছিল। বিজ্ঞাপনের বাংলা কপির ইংরেজি, বাজে কাজ, আগে রাজি হইনি! আজ গিয়ে বলব, কিছু অ্যাডভান্স দাও। দু'জনেই যদি কিছু পাই, তা হলে রাত্তিরে... তার আগে এই পাগলের কিছু ব্যবস্থা করো প্লিজ। ওকে এখানে রাখা যাবে না। ছোটবেলা থেকে আমি পাগল সহ্য করতে পারি না।

হেমকান্তির কাঁধে একটা হাত রেখে দময়ন্তী বললেন, ওরকম বোলো না। হেম আমাদের কী চমৎকার বন্ধু ছিল। একসময় আমরা একসঙ্গে কত আনন্দ করেছি, সেই জঙ্গলের মধ্যে...

ওসব পুরনো কথা বাদ দাও। আমাদের বাঁচতে হবে বর্তমান নিয়ে।

এই যে হেম এখানে দাঁড়িয়ে আছে, এটাও তো বর্তমান। যতদিন না ওকে

বাড়িতে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা যায়, ততদিন ও আমাদের কাছেই থাকবে। বেড়াল পার করার মতন ওকে মৌলালির মোড়ে ছেড়ে দিয়ে আসার কথা তুমি উচ্চারণ করলে কী করে!

যতদিন মানে! রাত্তিরে থাকবে কোথায়? এই তো একটা মাত্র বিছানা। তাতে তিনজন...

সেটা এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। আমি না হয় মেঝেতে শোব। হেমের এইরকম অবস্থা দেখে আমারই কান্না পাচ্ছে।

এইসময় অকস্মাৎ ঠোঁট ফাঁক করে হেমকান্তি বলে উঠলেন, আমি...

ওঁরা দু'জনেই চমকে উঠলেন এবং ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে রইলেন হেমকান্তির মুখের দিকে।

যেন অনেক চেষ্টার পর সার্থক হয়ে তিনি এরপর বললেন, আমি হেমকান্তি...

এটুকু বলার পরই তাঁর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যেন এটাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বার্তা। তাঁর অস্তিত্বের শীর্ষদণ্ড। পাহাড়চূড়ায় দাঁড়িয়েও বলা যায়, আমি হেমকান্তি!

ক্ষণিক বিরক্তি গোপন করে বিশ্বদেব বললেন, তুই হেমকান্তি, হ্যাঁ, আমরা তো প্রথম থেকেই তোকে চিনতে পেরেছি। তোর ঘি-দুধ খাওয়া চেহারাটা তো একই আছে। এই তো মুখে কথা ফুটেছে। এতক্ষণ চুপ করে ছিলি কেন? শোন, হেম, আমরা জানতে চাইছি, তুই এতদিন পর এই অবস্থায় আমাদের কাছে হঠাৎ এলি কেন? কিছু খবর দিতে এসেছিস?

মাথা নাড়ার বদলে হেমকান্তি এবার মুখে বললেন, জানি না।

তারপরই আবার বললেন, আফতাব। আফতাব আহমেদ।

বিশ্বদেব দময়ন্তীর দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সে আবার কে?

দময়ন্তীও একটুখানি চিন্তা করে বললেন, আফতাবদা? যে-আফতাবদা আমাদের ট্রেনিং দিতেন একসময়। তুমি তো ওঁর কাছেই শুটিং শিখেছিলে কয়েক মাস।

বিশ্বদেব বললেন, সেই আফতাব? সে কি আহমেদ না আফতাব রসুল? যাই হোক, সে তো মারা গেছে শুনেছি, বছর দু'-এক আগে। হঠাৎ তার কথা কেন!

দময়ন্তী বললেন, হেম, আমরা আফতাবদাকে চিনতাম। সারাণ্ডা ফরেস্টে যিনি শুটিং শেখাতে আসতেন। তাঁর কথা বলছ কেন?

হেমকান্তি কপালের মাঝখানে একটা আঙুল টিপে ধরে একটা একটা অক্ষর উচ্চারণ করে জিজ্ঞেস করলেন, সে-টা কো-থা-য় গে-ল?

বিশ্বদেব জিজ্ঞেস করলেন, সেটা মানে কী?

হেমকান্তি আবার বললেন, সেটা...

দময়ন্তী জিজ্ঞেস করলেন, আমরা বুঝতে পারছি না হেম। আর একটু স্পষ্ট করে বলো।

এবারে হেমকান্তি দময়ন্তীর একটা হাত ধরে ব্যাকুলভাবে বললেন, পারছি না। দময়ন্তী, আমি পাগল হয়ে যাইনি, পাগল হয়ে যাইনি, পাগল হয়ে যাইনি। আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি, হারিয়ে ফেলেছি, হারিয়ে ফেলেছি! আমাকে ফিরিয়ে আনো।

নয়

সপ্তাহে পাঁচ দিন জয়ী চন্দননগরে একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যায়।

যাওয়া-আসায় অনেকটা সময় খরচ হয়, তবু কাজটা তার ভালো লাগে। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ধরলেও তাকে বেশি ভিড় সহ্য করতে হয় না। সকালবেলা উলটো দিক থেকেই গাদাগাদি করে মানুষ আসে। ফেরার সময়েও অনেকটা তাই।

চন্দননগরের কিছু যাত্রীর সঙ্গে তার মুখচেনা হয়ে গেছে। কিন্তু কেউই তার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা করে না। অনেকেই তাকে যেন কিছুটা ভয় পায়।

কিশোরী বয়স থেকেই সব মেয়েকে পুরুষরা নানাভাবে উত্যক্ত করে। কিন্তু জয়ীকে তা সহ্য করতে হয়নি প্রায়। পুরুষরা মেয়েদের ওপর আধিপত্য করতে চায় এই আদিম ধারণায়, তাদের তুলনায় মেয়েদের শারীরিক শক্তি কম। তারপর সভ্যতা কতদূর গড়িয়ে এসেছে, কতদিন থেকে মেয়েরা পুরুষদের চেয়েও অধিক গুণপনার পরিচয় দিয়েছে, তবু পুরুষদের মাথায় সেই শারীরিক শক্তির ব্যবধানের কথা রয়ে গেছে। বলাৎকার, যৌন

নিপীড়নের মূলে তো তাই। তথাকথিত কিছু কিছু সভ্য শিক্ষিত মানুষও স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে।

সাধারণ বঙ্গনারীদের তুলনায় জয়ীর শরীর যে-হেতু অনেকটাই বড়, তাই অনেক পুরুষই তাকে সম কিংবা বেশি শক্তিমান মনে করে। সেইজন্যই তারা কু-মতলবে কাছে আসে না, আবার কেউ তার হৃদয়ের কাছে পৌঁছোবার জন্যও আবেদন জানায় না।

ট্রেনের কামরায় যখন সে বসে থাকে, অনেকেই ফিরে ফিরে তাকায় তার দিকে। আশেপাশের অনেক পুরুষের তুলনাতেও তার মাথা উঁচু। সে তেমন কিছু রূপসি না হলেও মুখখানিতে মাধুর্য আছে। আর সে থাকে সবসময় ফিটফাট, শাড়ি নিভাঁজ, কাঁধের কাছে একছিটেও ময়লা থাকার উপায় নেই, কখনও তার মুখে ঘামের ফোঁটা দেখা যায় না।

চেহারার তুলনায় জয়ীর কণ্ঠস্বর নরম। বস্তুত সে ভালোই গান জানে।

চন্দননগর স্টেশনের বাইরে বাঁধা রিকশাওয়ালা তাকে নিয়ে যায় প্রতিদিন। জয়ীদের প্রতিষ্ঠানটি স্কুলও না, কলেজও নয়, তবু স্থানীয় মানুষ কলেজই বলে। কলেজের সিলেবাস পড়ানো হয় না এখানে, তেমন বাঁধাধরা কিছুই নেই। নানা বিষয়ে সরকারি উচ্চপদের পরীক্ষার্থীরা, এমনকী বিদেশ গমনেচ্ছু ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারও এখানে আসে কথা বলা শিখতে। ইংরেজি ভাষায় অবশ্যই, কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়, কোনও একটা বিষয়ে দশ মিনিট, পনেরো মিনিট গুছিয়ে, যুক্তিসিদ্ধভাবে বলাও শিক্ষণীয়। এ ছাড়া নানাবিধ সামাজিক আচার-আচরণ, অচেনা পরিবেশে নিজেকে আস্তে আস্তে প্রতিষ্ঠিত করার কিছু কিছু রীতিও আলোচিত হয়। মাত্র তিন মাসের কোর্স। শিক্ষার্থীদের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে, তবে বলাই বাহুল্য, এরা প্রধানত উচ্চবিত্ত সমাজের। বাঙালি-অবাঙালির কোনও প্রভেদ নেই। বরং বাঙালিই অর্ধেকেরও কম।

একশোর বেশি শিক্ষার্থী নেওয়া হয় না, শিক্ষক চার জন। জয়ী শিক্ষক নয়, সে প্রিন্সিপাল, কখনও ইচ্ছে হলে দু'-একটা ক্লাস নেয়। পরিচালনা ব্যবস্থার খুঁটিনাটি নিয়েই তাকে ব্যস্ত থাকতে হয় অধিকাংশ সময়। প্রতিদিনই দুটি বাথরুম সে নিজে একবার পরিদর্শন করে। বাথরুমের কোনওরকম অপরিচ্ছন্নতা তার সহ্য হয় না।

শিক্ষকদের মধ্যে দু'জন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলা, একজন রিটায়ার্ড আই এ এস অফিসার আর চতুর্থজন, হারুদা, তিনিই সবচেয়ে আকর্ষণীয় মানুষ।

তিনি কত দেশ যে ঘুরেছেন তার ঠিক নেই। জার্মানি থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছিলেন, তারপর কোথাও এক জায়গায় স্থির থাকতে পারেননি। অনেকগুলি ভাষা শিখেছেন বলে অনেক দেশেই জীবিকার ব্যবস্থা করে ফেলতে পারেন। আমেরিকা, কানাডা, এমনকী আর্জেন্টিনাতেও ছিলেন কিছুদিন। তারপর এই চন্দননগরে যে কেন আস্তানা নিয়েছেন তা বোঝা যায় না। এখানে তাঁর নিজস্ব বাড়ি-ঘরও নেই। আবার কোনদিন হঠাৎ তিনি এখান থেকে উধাও হয়ে যাবেন, তা বলা যায় না।

ছেলেমেয়েরা প্রায় প্রথম দিন থেকেই হারুদাকে পছন্দ করে ফেলে। আবার তাঁর নামে অভিযোগও আসে। ক্লাসরুমে ধূমপানের প্রশ্নই নেই, তার জন্য আলাদা একটি কক্ষ বরাদ্দ আছে, তবু হারুদা ক্লাসে ঢুকেই একটা চুরুট ধরাবেন।

ইদানীং তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ধূমপায়ীর সংখ্যা খুবই কমে গেছে। সবাই স্বাস্থ্যসচেতন। তবু তুলনামূলকভাবে মেয়েরাই এখনও অনেকে সিগারেট টানে, পশ্চিমি দেশগুলির অনুসরণে। আবার অনেক ছেলে এমন চরম জায়গায় পৌঁছে গেছে যে ধোঁয়ার গন্ধই সহ্য করতে পারে না। প্যাসিভ স্মোকিংয়ের আতঙ্কও আছে। দু'-একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, স্যার, আপনার পেছনের দেওয়ালে লেখা আছে, স্মোকিং ইজ প্রহিবিটেড!

হারুদা পেছন দিকে ঘাড় না ঘুরিয়েই বলেন, তুমি ভুল বললে, লেখা আছে স্মোকিং সিগারেট ইজ প্রহিবিটেড। চুরুট কিংবা বিড়ি সম্পর্কে নিষেধ নেই। তুমি জানো কি, আমেরিকায় সিগারেট স্মোকারদের ইনশিয়োরেন্সের প্রিমিয়াম অনেক বেশি হয়, কারণ সেখানে ধরেই নেওয়া হয় যে সিগারেট খেলে তাড়াতাড়ি মারা যাবে। কিন্তু সিগার কিংবা চুরুট সম্পর্কে সেটা খাটে না। যাই হোক, তুমি যখন বলছ, তোমার সম্মানার্থে আমি আর এক টান দিয়েই নিভিয়ে দিচ্ছি, কেমন?

কোর্স শুরু হবার এক মাসের মধ্যেই কোনও না কোনও ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, স্যার, আপনি চুরুট খেতে পারেন, আমাদের অসুবিধে হবে না।

বারোটা থেকে চারটে, এই সময়সীমার ভিতর কমপাউন্ডের মধ্যে সবাই ইংরেজিতে কথা বলবে, এটাই অলিখিত নিয়ম। ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের মধ্যেও অন্য কোনও ভাষা বলে না। একমাত্র হারুদাই বহু ভাষাবিদ হয়েও যখন তখন বাংলায় ইয়ারকি-ঠাট্টা শুরু করেন। তার মধ্যে এমন কিছু কিছু শব্দও থাকে, যা ভদ্রসমাজে অনুচ্চার্য।

একজন শিক্ষক ডিনার টেবিলের সহবত শেখান। কাঁটা-চামচ ছুরি ধরা, ন্যাপকিন দিয়ে কীভাবে ঠোঁট মুছতে হয়, ফর্মাল ডিনারে ন্যাপকিন দিয়ে কপালের ঘাম মোছা কেন নিষিদ্ধ, বাঁ হাতে কাঁটা থাকলে তা সোজা দিক করে কেন খাবার তোলা যাবে না ইত্যাদি।

সেরকম একটি ক্লাসের পর এসে ঢুকলেন হারুদা।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, শোনো বালক-বালিকাগণ, এইমাত্র মিস মার্গট যা শিখিয়ে গেলেন, তা একেবারে নিখুঁত। ভালো করে মনে রাখবে। প্র্যাকটিস করবে। বাপ-মায়ের সঙ্গে খেতে বসেও চামচ দিয়ে স্যুপ খাওয়ার সময় একটুও শব্দ করবে না। বাট...

একটু থেমে, নাটকীয় বিরতি নিয়ে তিনি বললেন, বাট, কেউ যদি ডান হাতের বদলে বাঁ হাতে ছুরি ধরে আর ডান হাতে কাঁটা, তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? সে যদি ল্যাটা, মানে লেফট হ্যান্ডার হয়?

অনেকেই হেসে উঠল।

হারুদা আবার বললেন, কখনও যদি ছুরি-কাঁটার বদলে হাত দিয়ে খাওয়াই সুবিধাজনক হয়, তবে হাত ব্যবহার করলে ক্ষতি কী? চাইনিজ নুডলস হাত দিয়ে খাওয়া যায় না, কিন্তু মুরগির ঠ্যাং হাত দিয়েই তো ভালো ম্যানেজ করা যায়। আমি বহু ফাইভ স্টার হোটেলেও হাত দিয়ে খেয়েছি। কোনও অসুবিধে হয়নি। তবে হাড় চিবিয়ো না। ওটা দেখলে সাহেব-মেমরা আঁতকে ওঠে। হাড় চিবুতে খুব ইচ্ছে করলে, সেটা নিজের বাড়িতে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, হাত আর আঙুল, এ সম্পর্কে শেক্সপিয়ারই তো বলেছেন, দাই ফিঙ্গারস, সো এলিগান্ট, মাচ ইউজফুল দ্যান ফর্কস অ্যান্ড নাইভস। মনে আছে তো? শেক্সপিয়ারের কোন নাটকে এটা আছে বলো তো?

ছাত্র-ছাত্রীরা নীরব, ধ্যানস্থ। এরা প্রায় সবাই ভালো ছাত্র, শেক্সপিয়ারও যথেষ্ট পড়েছে। তবু এখন হাতড়াচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে।

মৃদু মৃদু হাসছেন হারুদা। তাঁর গায়ের রং পাকা বাঁশের মতন। মুখের চামড়ায় অনেক ভাঁজ, মনে হয় তাঁর বয়েসের গাছপাথর নেই। কিন্তু যাকে বলে অ্যাজিলিটি, তা আছে যথেষ্ট। চোখ দুটিতে প্রায়ই দুষ্টুমি ঝিলিক মারে। এটাই যেন তাঁর জীবন উপভোগের প্রধান অঙ্গ।

একটু পরেই তিনি আবার বললেন, থাক, বেশি ভাবতে হবে না। এটা কোনও নাটকে নেই, এরকম কথা শেক্সপিয়র কখনও লেখেননি। তোমরা

যখন স্কুল-কলেজে পড়েছ, তখন রচনার মধ্যে এরকম শেক্সপিয়ার কিংবা রবি ঠাকুরের কোটেশন বানিয়ে ধাপ্পা দাওনি? এমন কোন মাস্টার আছেন যিনি পুরো রবীন্দ্রনাথ কিংবা পুরো শেক্সপিয়ার পড়েছেন যে ধরতে পারবেন? আঙুলের ওই কথাটা আমি পড়েছি সৈয়দ মুজতবা আলির একটা লেখায়।

অনেক জ্ঞানী-গুণী শিক্ষকের চেয়েও হারুদার মতন এমন ইয়ারকি-প্রবণ মানুষকেই ছাত্র-ছাত্রীরা বেশি পছন্দ করে।

জয়ীর অফিসঘরটি ছোট কিন্তু সুদৃশ্য। তিন দিকের দেওয়ালে সাতখানি বাঁধানো ছবি, সবই বিখ্যাত শিল্পীদের ছবির প্রিন্ট, এদেশি ও বিদেশি। জয়ীর কাছে এরকম আরও প্রিন্ট কিংবা পোস্টার আছে, সে মাঝে মাঝে বদলে দেয়।

এক কোণের একটা টেবিলে একটা কম্পিউটার, কিন্তু জয়ীর সামনের টেবিলটি সবসময় ফাঁকা থাকে। কোনওরকম ফাইলপত্র এলেই সে সঙ্গে সঙ্গে দেখেটেখে বিদায় করে দেয়। টেবিলে কোনও কিছু জমিয়ে রাখা সে পছন্দ করে না। তার সমস্ত জীবনটাই যেন নিখুঁত পরিচ্ছন্নতার সাধনা। তবে মাঝে মাঝেই যে এটা বাতিকের পর্যায়ে পড়ে, সেটা জয়ী নিজেই বোঝে না।

তুই কবে সিগারেট ছাড়বি?

পথে-ঘাটে জয়ী সিগারেট খায় না, ট্রেনেও প্রশ্নই নেই, সেইজন্য, এখানে নিজের অফিসঘরে ঢুকে সে প্রথমেই একটি সিগারেট ধরায়। আর প্রতিদিনই তাকে বকুনি দেয় বিষ্ণুপ্রিয়া।

এই মেয়েটি জয়ীর প্রেসিডেন্সি কলেজের সহপাঠিনী। মণিপুরের মেয়ে, কিন্তু বাবার চাকরিসূত্রে কলকাতায় থেকেছে অনেকদিন। জয়ীর সঙ্গে তার আপাতত কোনও মিলই নেই, না চেহারায়, না স্বভাবে। উচ্চতায় বেশ হ্রস্ব, সবসময় ভিতু ভিতু ভাব, যে-কোনও ঘরে ঢুকেই আগে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নেয়, কিন্তু প্রয়োজনে সে খুবই হিংস্র হতে পারে।

বিষ্ণুপ্রিয়াই জয়ীকে টেনে এনেছে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। দু'জনে সমান অংশীদার। দু'জনেরই উপার্জন বেশ ভাল।

এই চন্দননগরেই গঙ্গার ধারে একটি সুদৃশ্য মনোরম বাড়িতে বিষ্ণুপ্রিয়া একাই থাকে। অবশ্য দাস-দাসী আছে। এটা তার স্বামীর বাড়ি।

প্রিয়ব্রতর সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়ার পরিচয় হয়েছিল ব্লুমিংটন, ইন্ডিয়ানায়। প্রিয়ব্রত ইঞ্জিনিয়ার, বিষ্ণুপ্রিয়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্রী। একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে, কী ছিল বিধাতার মনে।

বিদেশে আসার সময় বিষ্ণুপ্রিয়ার মা পইপই করে বলে দিয়েছিলেন, তুই যদি কোনও মণিপুরী ছেলে ছাড়া আর কারওকে বিয়ে করিস, কোনও সাহেব কিংবা মুসলমান কিংবা হিন্দু বাঙালি, তা হলে আমি আর তোর মুখ দেখব না!

মায়ের এ কী অবুঝ দাবি, আমেরিকায় উপযুক্ত মণিপুরী পাত্র পাওয়া কি সহজ কথা! কিছু মণিপুরী ছাত্র নানা শহরে ছড়িয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই কম। বিষ্ণুপ্রিয়া যে-রকম রক্ষণশীল পরিবেশে বর্ধিত হয়েছে, বিবাহ-পূর্ব যৌন সম্পর্ক তার কাছে অকল্পনীয়। অথচ এইসব পশ্চিমি দেশে কৌমার্য শব্দটাই এখন অলীকের পর্যায়ে পড়ে। দু'-তিন সন্ধে আলাপের পরিণতি বিছানায়। বিষ্ণুপ্রিয়া কঠোরভাবে নিজেকে সংযত রেখেছে, যদিও একটি থাইল্যান্ডের যুবক তাকে প্রলুব্ধ করার অনেক চেষ্টা করেছিল। অবশেষে শিকাগোতে এক মণিপুরী তরুণ নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে তার পরিচয় হল বটে, কিন্তু দেশে তার স্ত্রী আছে।

সেবারই এই বন্ধুর গাড়িতে শিকাগো থেকে দল মিলে ফেরা হচ্ছিল ইন্ডিয়ানায়। পথে হল দুর্ঘটনা। সেই সময় গাড়ি চালাচ্ছিল প্রিয়ব্রত। সে নিজে ছাড়া আর কেউ গুরুতর জখম হয়নি। প্রিয়ব্রত এগারো দিন হাসপাতালে ছিল, তারপর বাড়িতে এসেও শয্যাবন্দি। তখন প্রতিদিন বিষ্ণুপ্রিয়া তাকে দেখতে গেছে। আগে মুখচেনা ছিল মাত্র, এইরকম সময়েই পরস্পরকে অনেক ভালোভাবে জানা যায়।

বিষ্ণুপ্রিয়া মাকে লিখে জানিয়েছিল যে এই মানুষটি বাঙালি হলেও ওদের পরিবার নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। এদেশে দশ বছর আছে, তবু প্রিয়ব্রত গোস্বামী মাছ-মাংস খায় না। মা ততদিনে আর্থারাইটিসে কাবু, মনটাও দুর্বল হয়ে গেছে।

ওদের বিবাহিত জীবন সাড়ে সাত বছর। বিষ্ণুপ্রিয়ার ডাকনাম ছিল প্রিয়া। সুতরাং এই দম্পতি প্রিয় আর প্রিয়া, শুনতে ভালো লাগে না। তখন থেকে বিষ্ণুপ্রিয়া নাম বদলে হল মণিকা, এখন এই নামেই তাকে সবাই চেনে। পুরনো বন্ধুরা কেউ কেউ প্রিয়া বলেও ডাকে।

প্রিয়ব্রত ছিল দুর্ঘটনা-প্রবণ। ছোটখাটো অ্যাকসিডেন্ট তার লেগেই থাকত, এমনকী সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় অকারণে হোঁচট খেয়ে মাথা ফাটিয়েছে একবার। অফিসের কাজে প্রায়ই তাকে বিভিন্ন শহরে ছোটাছুটি করতে হয়। মণিকা তার স্বামীকে একলা গাড়ি চালিয়ে দূরে কোথাও যেতে দিতে চায় না। নিউইয়র্ক থেকে বাল্টিমোর যাবার পথে এক বিমান দুর্ঘটনায় প্রিয়ব্রত তার

জীবনের বাকি সব দুর্ঘটনার ইতি ঘটিয়ে দিল। খবরটা যখন প্রথম আসে টেলিফোনে, মণিকা তখন তার তিন বছরের ছেলেকে ঘুম পাড়ানোর জন্য, 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি, আহা-হা-হা-হা' গানটা শোনাচ্ছিল।

এসব দেশে সবসময় তাড়াহুড়ো, শোক নিয়ে বিরলে থাকারও উপায় নেই, টাকাপয়সা সামলাবার জন্য ব্যস্ত থাকতেই হয়। প্রিয়ব্রত চলে গিয়ে তার স্ত্রীকে প্রচুর ডলারের উত্তরাধিকারিণী করে দিয়ে গেল। বিমান কোম্পানি, ইনশিয়োরেন্স, চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুর জন্য অফিসের ক্ষতিপূরণ, সব মিলিয়ে বিপুল অর্থ। এই অর্থ যথাস্থানে সংলগ্ন করার জন্য প্রচুর মাথা ঘামাতে হয়, এবং অন্য কেউ যাতে বেশি মাথা না ঘামায়, সেদিকেও নজর রাখতে হয়। ব্লুমিংটনে ওদের নিজেদের বাড়িটারও ঋণের কিস্তি শোধ হয়ে গেছে।

এ ছাড়াও চন্দননগরে নানান পারিবারিক সম্পত্তির মধ্যে প্রিয়ব্রত একটি বাড়ির উত্তরাধিকারী। বিয়ের পর দু'বার মণিকা সে-বাড়িতে থেকে এসেছে। সে জানে, ওই বাড়ির প্রতি নজর না দিলে পাঁচ ভূতে সেটা দখল করে নেবে। অত সুন্দর বাড়িটা বিক্রি করে দিতেও ইচ্ছে করে না।

একটা সিদ্ধান্ত নেবার জন্য মাস চারেক সময় নিল মণিকা। ছেলে যদি আরও বড় হয়, তা হলে সে আর দেশে যেতে চাইবে না। বরং কয়েকটা বছর দেশের ধুলোবালি, আলো-বাতাস গায়ে মেখে এসে এখানে লেখাপড়া শেখার সুযোগ নিতে পারবে। জন্মসূত্রে নাগরিক, তার এখানে যখন তখন আসার কোনও সমস্যাই নেই। বাবা নেই, মায়ের তখন ক্যান্সার, শেষ কয়েকটা মাস মায়ের সঙ্গেই কাটাতে চাইল মণিকা। মাকে নিয়ে সে এই চন্দননগরের বাড়িতে উঠল। আর ফেরা হয়নি।

মণিকার অর্থচিন্তা নেই, কিন্তু সে লেখাপড়া শিখেছে, শুধু শুধু বসে থাকবে কেন? মা চলে গেছেন এর মধ্যে, ছেলে অর্ণব পড়ছে কনভেন্ট স্কুলে। তাই নিজেও সে কিছু একটা করার জন্য ভাবী অফিসারদের শিক্ষানবিশির এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছে, কলেজের বান্ধবী জয়ীকে ডেকে এনেছে এটা চালাবার জন্য।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে জয়ী বলল, বল, এই শনি আর রবিবার কী করলি?

মণিকা বলল, বিশেষ কিছু না। তোকে কতবার বলি উইক এন্ডটা এখানে

আমার সঙ্গে কাটাতে... কলকাতায় তোর কোনও বয়ফ্রেন্ড আছে? আমাকে বলিস না কেন? শোন, হারুদা আবার একটা কাণ্ড ঘটিয়েছেন।

আবার কী হল!

সঙ্ঘমিত্রা নামের মেয়েটি, গত সপ্তাহে এরা সবাই মিলে একটা মিউজিক ফেস্ট করেছিল, তাতে সংঘমিত্রা গান গেয়েছিল, মনে আছে?

অপূর্ব গান গায়। অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্তর গান এত ভালো, ইদানীং আর কারও গলায় শুনিনি। মেয়েটির চেহারাও ভারী মিষ্টি।

ভালো গান গায়, সেটা তার একস্ট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটি। সংঘমিত্রা আই এফ এস-এ চান্স পেয়েছে। ওরা থাকে শ্রীরামপুর, হারুদা এই শনিবার ওদের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন।

কয়েক মুহূর্ত ভুরু কুঁচকে থেকে জয়ী বলল, স্টুডেন্টদের কারও বাড়িতে যাওয়া কি অপরাধ? সোসালাইজ তো করা যেতেই পারে।

মণিকা বলল, বাড়িতে যাওয়ার জন্য নয়, হারুদা সঙ্ঘমিত্রার বাবাকে গিয়ে বলেছেন, আপনার মেয়েকে আমাদের ওই ঘোড়ার ডিমের ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে দিন। ওর ফরেন সার্ভিসেও যোগ দেবার দরকার নেই। ও মেয়ে তো একটা সংগীত-প্রতিভা। ও আরও ভালো করে গানের চর্চা করুক। আই এ এস, আই এফ এস তো অনেকই হয়। কিন্তু এমন গানের ট্যালেন্ট ক'জনের থাকে? উগান্ডা কিংবা কাজাকিস্তানে প্রথম পোস্টিং হবে, সেখানে গানের চর্চার কোনও সুযোগই থাকবে না। এখানে থাকলে ও মেয়ে একদিন না একদিন নাম করবেই, আর গানের জগতে নাম করতে পারলে তার রোজগার ওইসব সরকারি চাকরি থেকে মোটেই কম নয়!

হারুদা যে এইসব বলেছেন, তুই জানলি কী করে! মনে হচ্ছে যেন তুই মুখস্থ বলছিস!

সংঘমিত্রার বাবা আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। অনেকক্ষণ এই কথাই বললেন।

জয়ী ঠোঁট টিপে হেসে বলল, হারুদা কিন্তু খুব একটা ভুল কিছু বলেননি। এইভাবে আমাদের দেশের অনেকের চাকরির মোহে অন্য দিকের ট্যালেন্ট নষ্ট হয়ে যায়।

তুই কী বলছিস জয়ী! আমাদেরই একজন ট্রেনার বলবে, এটা ঘোড়ার ডিমের ইস্কুল? কাট হিম আউট! ওঁকে আজই নোটিশ ধরিয়ে দে।

হারুদাকে হটিয়ে দিতে চাস?

অফ কোর্স। এসব আমি সহ্য করব না।

শোন প্রিয়া, এটা আমেরিকা নয়। এখানে হুট করে কারওকে চাকরি ছাড়ানো যায় না। যদিও হারুদা এ-চাকরির তোয়াক্কা করেন না জানি, তবু...

গিভ হিম থ্রি মানথ্‌স নোটিশ। অর থ্রি মানথ্‌স স্যালারি অ্যান্ড আস্‌ক হিম টু কুইট ফ্রম টুডে।

আগে আমি হারুদার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমি তোর মতন এত রুথলেস হতে পারব না।

ঠিক আছে, বংশীকে বলে রাখছি। হারুদা আসামাত্রই যেন তোর কাছে পাঠিয়ে দেয়। আর একটা কথা, একজন ভদ্রলোক এসে বসে আছেন, তাঁর মেয়েকে এখানে দিতে চান। খুব অনুরোধ করছেন। তোর সঙ্গে দেখা করতে চান।

কিন্তু আমরা তো বিজ্ঞাপনে বলেছি, ব্রোশিওরেও আছে যে মোট একশো জনের বেশি ক্যান্ডিডেট নেব না। এখন ঠিক একশো জন। তা ছাড়া সেশন শুরু হয়ে গেছে এক মাস আগে। আমার সঙ্গে তো দেখা করার দরকার নেই। উই মাস্ট স্টিক টু আওয়ার প্রিন্সিপল। ভদ্রলোককে তিন মাস পরে আসতে বল।

উনি বলছেন, তোকে চেনেন। একবার কথা বলবেন। আমাদের একটি স্টুডেন্ট তিন সপ্তাহ আসছে না...

ঠিক আছে, পাঠিয়ে দে। ভবিষ্যতে তুই এইসব পেরেন্টদের সঙ্গে নিজে কথাই বলবি না।

জয়ী দরজার দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রতিষ্ঠানটির এরই মধ্যে এমন সুনাম হয়েছে যে অভিভাবকরা এসে ধরাধরি শুরু করেছেন। মণিকা তাতেই খুশি। টাকাপয়সা তার যথেষ্ট আছে, তবু এটা একটা উদ্যোগের সার্থকতা। কোনও পুরুষের সাহায্যের দরকার হয়নি, দুটি নারীর সংগঠন।

এইসময় বেজে উঠল টেলিফোন।

ওদিককার কণ্ঠস্বর শুনেই ভুরু উঠে গেল জয়ীর। ঝিল্লি? ও মেয়েটা তো পারতপক্ষে জয়ীর সঙ্গে কথাই বলতে চায় না, সিঁড়িতে ওঠা-নামার সময় দেখা হয়, ওর সঙ্গে জয়ীর কোনও বিবাদ নেই, ওপরতলার কারও সঙ্গেই তার

বিবাদ নেই। মনোমালিন্য তার বাবার সঙ্গে, তবু মুখোমুখি পড়ে গেলেও ঝিল্লি তার চোখ দুটো শূন্য করে রাখে।

সেই ঝিল্লি তাকে টেলিফোন করবে কেন?

ঝিল্লি বলল, এসময় আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি, আপনার ওখানকার ফোন নম্বরও আমার কাছে ছিল না, শেষ পর্যন্ত মানসীদির কাছ থেকে...

জয়ী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে সেটা আগে বলো তো? বাড়িতে কারও কোনও বিপদ... আমার মায়ের শরীরটা খারাপ দেখে এসেছি।

ঝিল্লি বলল, না, না, আপনার মা ভাল আছেন। বিপদ মানে কী, আজ সকাল থেকে স্যারকে, মানে আপনার ছোটকাকাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কখন গেলেন, কোথায় গেলেন, কিছুই জানিয়ে যাননি। আপনি শুনেছেন নিশ্চয়ই, সেই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের দিন থেকে, সেই যে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন, তারপর থেকে ওঁর অবস্থা আবার বেশ খারাপ হয়ে গেল। আগে তো অনেকটা ইমপ্রুভ করেছিলেন, এখন আবার, প্রায় কিছুই মনে করতে পারেন না, এই অবস্থায় একা একা রাস্তায়...

জয়ীর মুখটা রাগে রক্তাভ হয়ে গেল।

সে বলল, তোমরা নজর রাখতে পারলে না? এমনি এমনি বেরিয়েই বা যাবে কেন? ঠিক সময় চা-কফি দেওয়া হয়েছিল?

ঝিল্লি বলল, কফি দিয়েছিলাম, খাননি, পড়েই আছে। টিটোদা বাড়িতে নেই। জামসেদপুর গেছে। রত্নেশকাকা পুনায় গেছেন কোনও কাজে। মেজবাবু বিশেষ পাত্তাই দিলেন না।

জয়ী বলল, উনি ঠিকানা মনে করতে পারেন না। রাস্তায় বেরিয়ে হারিয়ে গেলে... গাড়ি চাপাও পড়তে পারেন! তুমি হঠাৎ আমাকে ফোন করলে কেন?

ঝিল্লি বলল, আর কাকে করব?

জয়ী বলল, পুলিশে খবর দাও। আমি কি কলকাতা শহরের রাস্তায় রাস্তায় তাঁকে খুঁজে বেড়াব নাকি!

ঝিল্লি বলল, আমার ভুল হয়েছে। আপনাকে এইসময় বিরক্ত করার জন্য আমি দুঃখিত। আমি ভেবেছিলাম...

জয়ী ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী ভেবেছিলে? তুমিই বলেছিলে না ছোটকাকার কফিতে আমি বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলাম?

ঝিল্লি একটুও দ্বিধা না করে বলল, হ্যাঁ, একবার আমি এরকম ভেবেছিলাম।

কিন্তু সেটা আমার ভুল হয়েছিল। আই অ্যাপোলোজাইস। আপনাদের দোতলাটা ওঁর শত্রুপক্ষের জায়গা। কিন্তু আপনি শত্রুপক্ষ নন। সত্যি আমার ভুল হয়েছিল।

জয়ী বলল, আজ আবার কী ভেবেছিলে?

ঝিল্লি বলল, আপনি একবার বলেছিলেন, স্যারকে চন্দননগরে নিয়ে যাবেন, তাই ভাবলাম, আজ যদি... এটাও আমার ভুল নিশ্চয়ই?

জয়ী বলল, অফ কোর্স। যাই হোক, আমি এখন ব্যস্ত আছি। তুমি পুলিশে একটা খবর দিয়ে দেখো।

অভিভাবকটি দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, জয়ী ফোন রেখে দিয়ে বলল, আসুন, প্লিজ টেক আ চেয়ার।

সকলের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করাই এ সংস্থার রীতি। জয়ী কিন্তু এ ভদ্রলোকের সঙ্গে তেমন ব্যবহার করতে পারল না, তার মুখখানা কঠোর হয়ে আছে। দু'-চার কথায় সে ভদ্রলোককে বিদায় করে দিল, কিছুতেই রাজি হল না তাঁর মেয়েকে নিতে। যদিও একটি ছাত্রীর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে আগামী মাসে, এই পাকা খবর নিয়ে তিনি এসেছেন।

এবার হারুদা।

হারুদার পাগলাটে স্বভাব জয়ী বেশ পছন্দই করে। মাঝে মাঝে দু'জনের মধ্যে হাস্যপরিহাস বিনিময় হয়। আজ জয়ীর মুখে হাসি নেই।

একটা চেয়ারে এলিয়ে বসে হারুদা বললেন, আজ মেমসাহেবের ম্যাজাজ ভাল নাই। মুখখানা বেগুনভাজার মতন। তোমারে কি আগে কেউ কইছে যে উপর আর নীচের ঠোঁট সরলরেখায় থাকলে মেয়েদের পুরুষালি দেখায়। সেইজন্য, সব্বসময় একটু ঢেউ খেলিয়ে রাখতে হয়।

জয়ী বলল, হারুদা, আপনাকে আমি কেন্ন ডেকেছি, তা আপনি জানেন? আমাদের এখানকার কাজ যদি আপনার পছন্দ না হয়, তা হলে আপনি যে-কোনও দিন ছেড়ে দিতে পারেন। নো ওবলিগেশন।

হারুদা কৃত্রিম ভয়ের ভঙ্গি করে বললেন, ওরে বাবা, প্রথমেই এই। এ কী রণচণ্ডী মূর্তি। তুমি আমার চাকরি খাইতে চাও! তাইলে আমার দুইবেলা ডাইল-ভাত জোটবে কী করে?

জয়ী বলল, হারুদা, আমরা ভালো করেই জানি, আপনি এসব ছোটখাটো চাকরির পরোয়া করেন না। আপনার ইউ এস সিটিজেনশিপ। আমরা আমাদের এই

ছোট্ট প্রতিষ্ঠানে ডিসিপ্লিন মেনটেন করতে চাই। ডিসিপ্লিনই আমাদের অ্যাসেট। আপনার ক্ষেত্রে তাও খানিকটা রিল্যাক্স করা হয়, বাট ইউ কান্ট ক্রস ইয়োর লিমিট। আপনি সঙ্ঘমিত্রার বাড়িতে গিয়ে বলে এসেছেন, ও যেন আমাদের ইনস্টিটিউশন ছেড়ে দেয়! মণিকা এটা মোটেই পছন্দ করেনি।

হারুদা বললেন, মণিকা পছন্দ করে নাই? আর তুমি? তোমারও সেটা অপছন্দ?

কয়েক মুহূর্ত মাত্র দ্বিধা করে জয়ী বলল, হ্যাঁ। মণিকার সঙ্গে আমার কোনও বিষয়েই মতভেদ হয় না।

হারুদা নিরীহভাবে জিজ্ঞেস করল, তোমাগো দুই জনের মেনস্ট্রুরেশনের ডেটও কি এক?

মণিকার সঙ্গে জয়ীর তফাত এই যে, এ ধরনের কথা শুনলে মণিকা প্রথমে একটুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থাকত, তারপর এমনই চিৎকার ও চেঁচামেচি শুরু করে দিতে যে তা প্রায় হিস্টিরিয়ার পর্যায়ে চলে যেত, তাকে সামলানোই দায় হত তখন।

জয়ীর ক্ষেত্রে সেরকম কিছু হল না।

সে শান্তভাবে বলল, ভেরি স্মার্ট, এহ্? হোয়াই দা হেল আর ইউ ওয়েস্টিং ইয়োর ট্যালেন্ট হিয়ার?

এবার টেবিলের ওপর একটা বিরাশি সিক্কার ঘুসি মেরে বজ্রকণ্ঠে হারুদা বললেন, শাট আপ! আমার কতখানি ট্যালেন্ট আছে বা না আছে, তা তোমরা কী বুঝবা?

জয়ী বলল, প্লিজ, ডোন্ট শাউট।

সঙ্গে সঙ্গে গলা নামিয়ে হারুদা বললেন, আমাকে বেশি ঘাঁটাইয়ো না জয়ী। তাইলে আমি ছাত্রছাত্রীগো খ্যাপামু, স্ট্রাইক লাগাইয়া দিমু, সে ট্যালেন্ট আমার আছে। লাগাতার স্ট্রাইকে তোমাগো এই ছাতারমাথা ইস্কুলের বারোটা বাইজ্যা যাবো গা! তাই চাও?

জয়ী বলল, আমার সবচেয়ে অসহ্য লাগে কী বলুন তো! যখন আপনি জোর করে বাঙাল ভাষা বলেন। ওটা আপনাকে মানায় না। হারুদা, আমার মনে হয়, আমরা এ বিষয়ে কাল আবার কথা বলব। আজ আমরা দু'জনেই উত্তেজিত হয়ে পড়েছি।

একগাল হেসে হারুদা বললেন, আমি উত্তেজিত হইনি, তুমি হয়েছ। আমার তো সবটাই অভিনয়। তোমার আজ কী হয়েছে? কোনও দিনই আমার

সঙ্গে এই সুরে কথা বলোনি। কীসে তোমার এমন মেজাজ খারাপ হল? তোমার মোবাইল ফোনে কোনও খারাপ বার্তা পেয়েছ? রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়নি?

জয়ী তবু স্বাভাবিক হতে পারল না।

সে নীরসভাবে বলল, আপনার সঙ্গে কোনও ব্যক্তিগত কথা বলার জন্য আপনাকে ডাকিনি।

জানি। তুমি কোনও ব্যাপারে আমাকে রেপ্রিমান্ড করতে চাও। গো অ্যাহেড। কালকের জন্য ফেলে রেখে লাভ কী?

না, রেপ্রিমান্ড নয়, আমার ততটা যোগ্যতা নেই। আপনি আমাদের এই ইনস্টিটিউট সম্পর্কে যেসব বদনাম ছড়াচ্ছেন, তার জন্য একটা এক্সপ্লানেশন নিশ্চয়ই দাবি করতে পারি।

দেখো জয়ী। মেয়েদের স্বভাব আমি ভালোভাবেই জানি। আমার কাছে কৈফিয়ত চাওয়া মানে, আমি যাই-ই বলি, তোমরা আগে থেকেই বিচার করে ফেলো। তোমরা অন্যদের মতামতের মূল্য দাও না। অটোক্র্যাট হিসেবে মেয়েদের খুব ভালো মানায়। নিশ্চয়ই আমার শাস্তিও ঠিক হয়ে আছে। সেটা কী, বলেই ফেলো না, চক্ষুলজ্জার কী আছে?

মেয়েদের সম্পর্কে আপনি এত কিছু জেনে ফেলেছেন, সেইজন্যই বুঝি আপনার ভাগ্যে কোনও মেয়ে জোটেনি?

কোনও মেয়ের মুখে 'মেয়ে জোটেনি' শুনতে ভালো লাগে না। এতে মনে হয় মেয়েরা যেন অবজেক্ট! 'কোনও মেয়ের ভালোবাসা' বললে ঠিক ঠিক হত। হ্যাঁ পাইনি বটে। কত হাজার বছর ধরে নাকি সাধনা করতে হয়!

হারুদা, এসব চালাক চালাক কথা শোনার সময় নেই আমার। আমি ব্যস্ত আছি। কাল কথা হবে। নাও, প্লিজ লিভ মি অ্যালোন।

আড়মোড়া ভেঙে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হারুদা বললেন, তার মানে আজ রিপ্রিভ। ঝুলে রইল কাল পর্যন্ত। চিয়ার আপ, জয়ী। তোমার এত খারাপ মুখের চেহারা আমি আগে কখনও দেখিনি। অথচ হাসিমুখে তুমি সো ডিজায়ারেবল!

জয়ী তবু মুখখানা কঠোর করে রইল।

হারুদা বেরিয়ে যেতেই জয়ী ঢুকে পড়ল তার নিজস্ব বাথরুমে। ছোট, তবু পরিচ্ছন্নতার আদর্শস্বরূপ। বলাই বাহুল্য, অন্য কেউ সেটা ব্যবহার করে না।

দেওয়ালের আয়নায় সে দেখল, তার মুখখানা সত্যিই থমথমে। তার দুই ভুরুতে ঝিলিক দিচ্ছে ক্রোধ।

হারুদার সঙ্গে এতটা খারাপ ব্যবহার না করলেও চলত। আগের ভদ্রলোকটিকেও সে কোনও কথাই বলতে দেয়নি। প্রথমেই তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে, বুঝিয়ে বলার ধৈর্যও ছিল না। লোকটিকে প্রায় তাড়িয়েই দেওয়া হয়েছে।

কেন এমন মেজাজ খারাপ হয়ে আছে তার?

ঝিল্লির টেলিফোন। মেয়েটা কোনওদিন তার সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না, আজ কেন তাকেই ওই খবর দিতে গেল?

হেমকান্তি লাহিড়ী হারিয়ে গেছে। বেশ হয়েছে! ওই বাড়িতে কেউ থাকতে পারে, তাও একজন মানসিকভাবে দুর্বল রোগী? একটা ভালো কথা বলার মানুষ নেই। অথচ ওই ধরনের অসুস্থ মানুষের যা সবচেয়ে বেশি দরকার, তা কোনও ওষুধ নয়, সহানুভূতির সাহচর্য।

জয়ী কী করছে? তার বাবা এমন একটা ক্যারেক্টার, সব সময় উগ্রচণ্ডী, প্রত্যেক দিন মনে করিয়ে দেবে, তুই হেমকে প্রশ্রয় দিবি না! কফি করে খাওয়াবি না! দোতলায় ডেকে বসাবি না, ওকে দেখলেই আমার গা জ্বলে যায়। নিজের ছোট ভাইয়ের ওপর কোনও মানুষের এমন রাগ থাকতে পারে? শুধু সম্পত্তির লোভে?

আর ওঁদের মেজদাদাটিও তো আর এক পদের। দু'বেলা এক ঘণ্টা-দেড় ঘণ্টা ধরে পুজো করবেন, অথচ মুখে একটা ভালো কথা নেই। জয়ী একদিন শুনতে পেয়েছে, মেজবাবু হেমকান্তিকে ধমক দিয়ে বলছেন, হেম, তুই কক্ষনও পাখা বন্ধ করিস না কেন রে? পাখা খুলতে শিখেছিস, তাতে তো কখনও ভুল হয় না, বন্ধ যে করতে হয়, তা জানিস না?

পাখা বন্ধ করার মতন সামান্য ব্যাপার নিয়ে কেউ একজন অসুস্থ মানুষকে এভাবে কথা বলে! ওই কথাটাই তো অন্যভাবে নরম করে বুঝিয়ে বলা যায়। আর একদিন বলেছিল, তুই বাথরুমে খবরের কাগজ ফেলে আসিস। আর কেউ পড়বে না? পয়সা দিয়ে তো কিনি আমিই! কালকেও তুই এক থালা ভাত... একটুও মুখে দিলি না। অন্ন নষ্ট করলে বাড়িতে অলক্ষ্মী আসে।

ছিঃ, এইভাবে পয়সার কথা বলাটাই অরুচিকর।

এই দুটো দাদা মিলেই ছোট ভাইটাকে আরও পাগল করে দেবে।

জয়ীর ধারণা, তার বাবা আর ওপরতলার মেজবাবু, এঁরাই আসলে অসুস্থ, এঁরাই আসলে পাগল। ওঁদের তুলনায় হেমকান্তি যথেষ্ট ভালো মানুষ। তাঁর স্মৃতি অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে সাময়িকভাবে, কিন্তু তিনি তো কারওকে একটাও খারাপ কথা বলেন না। নিজের দুর্বলতার জন্য অপরাধীর ভাব করে থাকেন। এক-এক সময় ওঁকে দেখলে এত মায়া লাগে!

টিটো নিজের কেরিয়ার নিয়ে ব্যস্ত। সে সারাক্ষণ একজন অসুস্থ মানুষকে নিয়ে পড়ে থাকবেই বা কেন। খেলার জন্য তাকে প্রায়ই বাইরে যেতে হয়। আর ওই যে মেয়েটা, ঝিল্লি, ও-ই বা কতটুকু সেবা করতে পারে, ওর কি কোনও ট্রেনিং আছে? তা ছাড়া ওই মেয়েটার নিশ্চয়ই অন্য কিছু ধান্দা আছে, যখন-তখন হুটহাট করে বাড়ির বাইরে চলে যায়, এজন্য বকুনি খায় মেজবাবুর কাছে। একদিন জয়ী দেখেছিল, ঝিল্লি গাঙ্গুরামের দোকান থেকে মিষ্টি কিনল এক বাক্স, বাদাম-সন্দেশ, সে জয়ীকে লক্ষই করেনি, মিষ্টি কেনার পর সে বাড়ি ফেরার বদলে একটা বাসে চেপে চলে গেল দক্ষিণের দিকে। জয়ীর একটু খটকা লেগেছিল, ওই মেয়েটার নাকি বিশ্বসংসারে আর কেউ নেই, তা হলে ও যায় কোথায়?

কোথায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছেন হেমকান্তি?

সেদিনের সেই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের দিন কিছু একটা হ্যালুসিনেশন দেখেছিলেন সম্ভবত, তাতে আবার অনেকটা সেট ব্যাক হয়েছে। কী যে দেখেছিলেন, তা অনেক প্রশ্ন করেও বুঝতে পারেনি জয়ী। মনে হচ্ছিল, উনি কারওকে খুঁজছেন। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারছেন না। ভাষাও হারিয়ে ফেলেছেন। এটাই বেশি বিপজ্জনক। ভাষা হারিয়ে ফেললে স্মৃতি ফিরে পাবেন কী করে?

এই ব্যাপারে জয়ীর যেটুকু বিদ্যে আছে, তা প্রয়োগ করারও তো বেশি সময় পায় না সে। সে জোর করে ওপরের তলায় যায়, কিন্তু হেমকান্তির ঘরে গেলে অন্য কেউ না-কেউ তখন ঘরে থাকবেই। সে টের পায় অপছন্দের নিশ্বাসের গন্ধ। ঝিল্লি তার সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না। এমন ভাব দেখায় যেন হেমকান্তি তারই সম্পত্তি। আর মেজবাবু কোমরে হাত দিয়ে গ্যাঁট হয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন যে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেন, এই শত্রুপক্ষের মেয়েটা এত ঘনঘন আসে কেন? কী চায়?

উঃ, এই বুড়োগুলো কিছুতেই স্বার্থচিন্তা ভুলতে পারে না। আর কতদিন

বাঁচবে ঠিক নেই, তবু অন্যায়ভাবে আঁকড়ে ধরতে চায় অনেক কিছু। অথচ এই বয়েসেই তো ছাড়তে শিখতে হয়। পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে আস্তে আস্তে মুক্তি নিতে হয় অনেক জাগতিক বিষয় থেকে।

মেজবাবু যে দু'-তিন ঘণ্টা পুজো-আচ্চা করেন, তাতে কী লাভ হয়! সংস্কৃত শ্লোকগুলির মানে বোঝেন? মন যদি পরিষ্কার না হয়, মানুষের প্রতি দয়া-মায়া-স্নেহের বিকাশ না হয়, তা হলে এইসব অধ্যাত্মচর্চা তো অর্থহীন। এইসব মানুষই ধর্ম ব্যাপারটা সম্পর্কেই অভক্তি এনে দেয়।

পথ চেনেন না, ঠিকানা মনে রাখতে পারেন না, এই অবস্থায় হেমকান্তিকে বাড়ির বাইরে যেতে দেওয়াটাই এক চরম অপরাধ। ওঁকে সর্বক্ষণ চোখে চোখে রাখার কথা। কিন্তু কে যে দায়িত্ব নেবে? পয়সা খরচ করে একজন নার্স রাখার কথাও কেউ ভাবে না। আজ যদি লোকটা রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়ে মারা যায়, কেউ কি ওর জন্য এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলবে? অন্তত দু'জন ভাববে, যাক, আপদ গেছে, বাঁচা গেছে! এমনই অপদার্থ যে আত্মহত্যা করতে গিয়েও সাকসেসফুল হয় না।

বাথরুমের আয়নার সামনে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে জয়ী?

এর মধ্যে দু'বার টেলিফোন বেজেছে, সে ভ্রূক্ষেপ করেনি। এখন কেউ ডাকছে তার নাম ধরে। তাও সে সাড়া দিল না।

সে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, রাস্তার মাঝখানে চিত হয়ে শুয়ে আছেন হেমকান্তি। সারা শরীর রক্তাক্ত। থেমে গেছে সব ট্রাম-বাস, কিছু কিছু মানুষ ভিড় করে দেখছে এই এক অপরিচিত ব্যক্তির লাশ। সেই লাশের চোখ দুটি খোলা।

এবার দরজায় কেউ দুম দুম করে ধাক্কা দিল।

অকারণে কমোডের ফ্ল্যাশ টেনে দরজা খুলে বেরিয়ে এল জয়ী। তাকে দেখে চমকে উঠে মণিকা জিজ্ঞেস করল, এ কী জয়ী, কী হয়েছে?

জয়ীর দু'চোখে অশ্রুধারা।

ভাঙা গলায় সে বলল, প্রিয়া, আমার বাড়ি থেকে একটা খারাপ খবর এসেছে। আমাকে এক্ষুনি চলে যেতে হবে।

মণিকা জয়ীর বাহু ছুঁয়ে বলল, কী হয়েছে? কী হয়েছে?

জয়ী বলল, পরে বলব।

হাতব্যাগটা তুলে নিয়ে সে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

দশ

ঠিক সন্ধের মুখটায় বাড়ির দরজার সামনে সমবয়স্ক দু'জন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছেন বোসদা, একটা ট্যাক্সি এসে থামল সেখানে।

দরজা খুলে নেমে দাঁড়িয়ে দময়ন্তী বিনা ভূমিকায় বললেন, বোসদা, হেম লাহিড়ীর বাড়ি এখানেই কাছাকাছি কোথাও না?

বোসদা শুধু অবিশ্বাস মেশানো বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, দময়ন্তী?

দময়ন্তী বললেন, ট্যাক্সিতে রয়েছে হেম। ঘুমিয়ে পড়েছে। নিজের বাড়ি কোথায় তা বলতে পারে না। আপনি একটা কিছু ব্যবস্থা করবেন?

বোসদা এবার বললেন, কী ব্যবস্থা?

দমযন্তী বললেন, হেমের মাথাটা একেবারেই ঠিক নেই। কী করে যেন আমাদের ওখানে গিয়ে পৌঁছেছিল। কিন্তু আমাদের কাছে রাত্তিরে থাকার অসুবিধে আছে।

বোসদা নির্লিপ্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কাছে গিয়েছিল? কেন?

দময়ন্তী বললেন, তা তো জানি না। ও কিছুই গুছিয়ে বলতে পারে না। আমি শুনেছিলাম, আপনার বাড়ির কাছাকাছি ওর বাড়ি।

বোসদা আবার বললেন, তোমাদের সঙ্গে কি ইদানীং ওর যোগাযোগ ছিল? দেখা হত মাঝে মাঝে?

দময়ন্তী বললেন, না। অনেকদিন পর... আপনি প্লিজ ট্যাক্সিভাড়াটা মিটিয়ে দেবেন? আমার কাছে টাকা নেই!

বোসদা বললেন, ট্যাক্সিভাড়া আমি মেটাব? তুমি আমার ভরসায় এসেছ?

দময়ন্তী বললেন, বাসে করে আনাই উচিত ছিল। কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে, ও প্রায়ই এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছিল, আমি হাত ধরে সামলাতে পারিনি, তাই ট্যাক্সিতে...

বোসদা বললেন, আমি যদি এখন বাড়িতে না থাকতাম, অন্য কেউ তোমাকে চেনে না, তা হলে ভাড়া...

দময়ন্তীর কণ্ঠে একটুও বিনয় বা দৈন্যের ভাব নেই। সে পরিষ্কারভাবে বলল, তা হলে চেনাশুনো অন্য দু'-একজনের কাছে যেতাম। কেউ না-কেউ নিশ্চয়ই দিয়ে দিত।

বোসদা আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন, এই রাস্তার ওই যে শেষ বাড়িটা দেখছ, তিনতলা, ওটাই হেমের বাড়ি। ওখানে গিয়ে দেখো, কেউ যদি টাকা দিয়ে ওকে ছাড়িয়ে নেয়। আমি হেমের দায়িত্ব নিতে যাব কেন?

দময়ন্তী সেদিকে একবার তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে।

আর কোনও বিদায়বাক্য না বলে সে উঠে পড়ল ট্যাক্সিতে।

সেটা স্টার্ট দেবার পর বোসদা দ্বিতীয় চিন্তায় বললেন, দাঁড়াও। হেমকে এখানেই নামিয়ে দাও, আমি ভাড়া মিটিয়ে দিচ্ছি।

তিনি পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিয়ে পার্স বার করলেন।

হেমকান্তি অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। দময়ন্তী তাঁর দু'গালে ছোট ছোট চাপড় মেরে বলতে লাগলেন, হেম, ওঠো, ওঠো। তোমার বাড়ি এসে গেছে।

অন্যদের সাহায্য না নিয়ে দময়ন্তীই তাঁকে ধরে ধরে নামালেন।

তিনি নিজে আর ট্যাক্সিতে উঠলেন না। বোসদাকে কিছু না বলে তিনি হেমকান্তিকে বললেন, চলি হেম, ভালো থেকো। আবার দেখা হবে।

মুখ সোজা করে তিনি হেঁটে চলে গেলেন বড় রাস্তার দিকে।

বোসদার সঙ্গে কথা বলছিলেন যে দু'জন ব্যক্তি, তাঁদের মধ্যে একজন অন্তত জানেন, একসময় এই দময়ন্তীর সঙ্গে বোসদার তুই-তুই সম্পর্ক ছিল। চার-পাঁচজন মিলে এক ঘরে রাত্রি যাপনও করতে হয়েছে মাঝে মাঝে, তার মধ্যে বোসদা আর দময়ন্তী দু'জনেই থাকতেন। সে সম্পর্কের কোনও চিহ্নই বোঝা গেল না এখন।

সেই ব্যক্তিটির নাম গৌতম ধর। অন্য জন সুশোভন রায়।

এতক্ষণ চুপ করে থেকে গৌতম ধর বললেন, বোসদা, তুমি দময়ন্তীকে একবার ভেতরে গিয়ে বসতেও বললে না?

বোসদার বদলে সুশোভন বললেন, বললেই বা কী হত? ও রিফিউজ করত। আমাদের তো রেকগনাইজই করল না। যেন আমরা ওর অচেনা।

হেমকান্তি একটু একটু দুলছেন।

বোসদা তাঁকে সোজাভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী রে হেম, তুই একা একা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলি? কেন রে?

হেমকান্তি ভালোভাবে চোখ মেলে বললেন, ভোমরা?

বোসদা স্পষ্টত উৎফুল্ল হয়ে বললেন, এই তো আমার ডাকনাম তোর মনে পড়েছে। এবার আস্তে আস্তে অন্য কথাও মনে পড়বে।

হেমকান্তি একটা শিশুর মতো বলে উঠলেন, আমার অসুখ করেছে। আমি কথা বলতে পারি না। কষ্ট হয়।

এই কথাগুলি কিন্তু একেবারে স্পষ্ট। বোসদা বেশ বিস্মিত হয়েছেন। ব্লাড ডোনেশান ক্যাম্পের পরদিন বোসদা হেমকান্তিকে তাঁদের বাড়িতে দেখতে গিয়েছিলেন। তখন অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। চোখ-মুখে দারুণ আর্তি, তবু মুখ দিয়ে কোনও শব্দই উচ্চারণ করতে পারছিলেন না হেমকান্তি।

আগে বোসদার সন্দেহ ছিল, হেমকান্তির এই কিছুই মনে না থাকার ব্যাপারটা ভান। বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু সেদিন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এতখানি ভান করার মতন অভিনেতা হেমকান্তি নন!

বোসদা বললেন, হেম, তুই অসুস্থ এটা যখন তুই নিজে বুঝতে পেরেছিস, সেটা খুব ভালো লক্ষণ। এবার তোর কষ্ট কমে যাবে।

সুশোভন বলল, আমরা কি ভেতরে গিয়ে আর এক কাপ চা খেতে পারি?

বোসদা বললেন, চলো। আয় হেম।

বসবার ঘরটি বেশ প্রশস্ত। অন্তত পনেরো-ষোলোজন এঁটে যায়। খুব একটা সাজানো-গোছানো নয়, নানা রকম চেয়ার ও ছোট ছোট টেবিল ছড়ানো। তিনখানি আলমারি ভরতি বই। বসবার ঘরে সাধারণত কেউ বই রাখে না, কারণ অতিথিরা অনেক বই পড়তে নিয়ে গিয়ে আর ফেরত দেয় না। এখানে আলমারিগুলি বইতে ঠাসা ও তালা দেওয়া। মুখ-মিষ্টি বই-চোরদের যে কীভাবে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে তা কে জানে!

ভেতর বাড়িতে চা পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে বোসদা এসে বসলেন হেমকান্তির পাশে।

হেমকান্তি জিজ্ঞেস করলেন, আমি এই বাড়িতে থাকি?

সকাল-দুপুরে হেমকান্তির মুখ দিয়ে কোনও কথাই বেরুচ্ছিল না, এখন যেন কোথাও একটা জট ছাড়িয়ে গেছে, সব কথাই বলতে পারছেন। কিন্তু কথাগুলি কিছুটা আলগা আলগা, ঠিক যেন বিশ্বাসের জোর নেই।

বোসদা বললেন, না, হেম। এটা ভোমরার বাড়ি। তোর বাড়ি কাছেই। তুই গৌতম আর সুশোভনকে চিনতে পারছিস তো?

হ্যাঁ কিংবা না, না বলে হেমকান্তি শুধু আপন মনে উচ্চারণ করলেন, গৌতম আর সুশোভন। আমি হেমকান্তি।

গৌতম ঈষৎ হেসে বললেন, গ্ল্যাড টু মিট ইউ।

সুশোভন জিজ্ঞেস করলেন, বোসদা, ওর চিকিৎসা ঠিকমতন হচ্ছে তো?

বোসদা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, ওর বাড়ি থেকে ডাক্তার টাক্তার দেখাচ্ছে নিশ্চয়ই। আমি ঠিক খোঁজ রাখি না। ওদের তো টাকাপয়সার অভাব নেই।

গৌতম বললেন, এইসব অসুখে শুধু টাকাপয়সা থাকলেই... শক থেরাপি হয়েছে কি? তারও আফটার কেয়ার দরকার, সেটাই আসল।

সুশোভন বললেন, শক থেরাপি গুলি মারো। ওর যেটা দরকার, ওকে সামনে বসিয়ে আমরা কয়েকজন হাজারটা প্রশ্ন করব, করতেই থাকব, তাতে একসময় ঠিক ওর আসল সত্তাটা বেরিয়ে আসবে।

বোসদা বললেন, তার এখনও সময় আসেনি। কোয়েশ্চেন-আনসার সেশন আমরা করব ঠিকই, তার আগে ওর মানসিক অবস্থাটা আর একটু স্টেব্‌ল হোক।

সুশোভন অধৈর্যের মতন বললেন, আর কতদিন অপেক্ষা করব? শোনো, আমি ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, আই অ্যাম কনভিনস্‌ড, বরুণদাকে ও নিজে খুন করেছে, কিংবা সেই খুনের সাক্ষী ছিল। অ্যান্ড দা মানি...। সেদিন বরুণদার স্মরণ-সভায় ওকে বক্তৃতার জন্য দাঁড় করিয়ে ঠিক ট্র্যাপে ফেলা হয়েছিল। নিশ্চয়ই ট্রুথটা বেরিয়ে আসত। কিন্তু ও কী রকম চাল চালাল দেখলে? ওসব অজ্ঞান হওয়া টওয়া তো স্রেফ নাটক। আমরা ছেলেমানুষ, কিছু বুঝি না?

সুশোভন গলা চড়ালেও গৌতম শান্তভাবে বললেন, ছেলেমানুষির ব্যাপারটা খুবই সাবজেকটিভ। অনেক প্রাজ্ঞ, বিবেচক ব্যক্তিও মাঝে মাঝে যুক্তিহীন, ছেলেমানুষের চেয়েও বেশি ছেলেমানুষি করে ফেলেন। আর নাটক মানেই সবসময় মিথ্যে নয়। কিছু কিছু আকস্মিক ঘটনাকেও নাটকীয় মনে হয়। ধরা যাক বোসদার মতন মানুষ যদি হঠাৎ তার বউকে ছুরি মেরে খুন করে, সেটা নাটক নয়?

বোসদা হেসে বললেন, আমার আবার বউ কোথায় পেলি?

গৌতম বললেন, তোমার বউ নেই বলেই তো উদাহরণটা তোমার নামে দিলাম।

সুশোভন বললেন, তোমরা ব্যাপারটা হালকা করে ফেলছ।

গৌতম মৃদু ধমকের সুরে বললেন, মাঝে মাঝে হালকা হতে শেখ, সুশোভন। তোর দোষই তো এই। তুই সবসময় ওভার সিরিয়াস! ওই জন্য তোর মুখখানাও দিনদিন চোয়াড়ে হয়ে যাচ্ছে। তুই হেমকান্তির নামে যে

অ্যালিগেশন দিলি, তার সারকামস্টান্‌শিয়াল এভিডেন্স আগে পাওয়া দরকার। ওকেও উত্তর দেবার জন্য তৈরি হতে হবে, সে সময় দিতে হবে। ও যে তৈরি নয় এখন, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। বোসদা, তোমার কী ধারণা, ও ইচ্ছে করে জড়ভরত সেজে আছে?

বোসদা জোরে দু'দিকে ঘাড় নেড়ে বললেন, না। ও সত্যিই অসুস্থ। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, ওর নামে সুশোভন যে অভিযোগ দিল, তার কোনও সারবত্তা নেই। আমি মানুষ চিনি। হয়তো কিছু কিছু তথ্য ওর কাছ থেকে পাওয়া যেত।

হেমকান্তি একবার এর দিকে, আর একবার ওর দিকে তাকিয়ে সব শুনে যাচ্ছেন। যেন এসব কথা অন্য কারও সম্পর্কে। তাঁর মুখে একটিও রেখা ফুটছে না।

একজন কাজের লোক একটা গোল ট্রে-তে সাজিয়ে নিয়ে এল চার কাপ চা আর কিছু বিস্কুট। সে সবার সামনে সামনে চায়ের কাপ দিচ্ছে, তারই মধ্যে সুশোভন চেঁচিয়ে বলল, বাট হোয়ার ইজ দা মানি?

গৌতম রূঢ়ভাবে বললেন, শাট আপ!

হেমকান্তি হ্যাংলার মতন দু'হাত দিয়ে সবকটা বিস্কুট তুলে নিলেন, তারপরই আবার নামিয়ে রেখে অন্যদের দিকে তাকিয়ে অপরাধীর ভঙ্গিতে বললেন, আমার খুব খিদে পেয়েছে, খাব?

বোসদা বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খা।

গৌতম বললেন, আহা রে। খুবই খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই। দময়ন্তী কিছু খাওয়ায়নি সারাদিন?

সুশোভন মুখখানা গোঁজ করে আছেন, তার দিকে চেয়ে গৌতম জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে সুশোভন, তুই বিক্রম আচার্য নামে একটি ছেলেকে চিনিস?

সুশোভন দু'দিকে মাথা নাড়লেন।

গৌতম বললেন, তুই তো অল্প বয়েসি অনেক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করিস। তাই জিজ্ঞেস করলাম। এ ছেলেটি একটা কলেজে পার্টটাইম লেকচারারের কাজ করত, প্রিন্সিপালের সঙ্গে কীসব কথা কাটাকাটির জন্য চাকরি গেছে। আপাতত বেকার, কিছু লেখালেখি করে। মোস্ট প্রোবাবলি কোনও একটা মাওবাদী দলের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। জঙ্গলে যায় মাঝে মাঝে। তবে বেশির ভাগ সময় শহরেই থেকে লিঙ্কম্যানের

কাজ করে। পুলিশ ওর পেছনে লেগেছে, আমরাও খোঁজখবর নিচ্ছি। পুলিশ ওকে তুলে নেবার আগেই আমরা একবার ওর সঙ্গে মিট করতে চাই।

বোসদা জিজ্ঞেস করলেন, কেন, ওকে নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার কী আছে?

গৌতম বললেন, ওর অন্য অ্যাক্টিভিটি নিয়ে আমাদের কোনও আগ্রহ নেই। কিন্তু শুনেছি, ওই বিক্রম আচার্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে গত তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের লেফট মুভমেন্টের ওপর রিসার্চ করছে, উইথ স্পেশাল এমফ্যাসিস অন পুরুলিয়া চ্যাপ্টার। ও কতটুকু ইতিহাস জোগাড় করেছে, তা আমাদের জানা দরকার। হয়তো বরুণ ঘোষ দস্তিদারের খুন সম্পর্কে ও কিছু তথ্য দিতে পারবে।

সুশোভন জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেটি কি আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেছে?

গৌতম বললেন, না, এখনও যায়নি। যত দূর জানি, বাঘা যতীনের দিকে থাকে।

সুশোভন বললেন, ঠিক আছে, আমি ওর সন্ধান বের করে ফেলব।

গৌতম বললেন, দ্যাখ তো, যত তাড়াতাড়ি পারিস। ওকে ডেকে ওর সঙ্গে আমরা কথা বলব।

সুশোভন বললেন, পুরুলিয়ার ওপর বেশি জোর দিচ্ছে কেন? হোয়াই নট বীরভূম অ্যান্ড মেদিনীপুর? গোড়ার দিকে তো পুরুলিয়ার তেমন কিছু ইম্পর্ট্যান্স ছিল না!

গৌতম বললেন, তোর কি মনে আছে, দুয়ারসিনিতে একজন স্কুলমাস্টার পুলিশের তাড়া খেয়ে মিস্টিরিয়াসলি একেবারে উধাও হয়ে যায়? পুলিশের রিপোর্টে কোথাও তার মৃত্যুর কথা লেখা নেই, কিন্তু তার কোনও সন্ধানই আর পাওয়া গেল না, এমনকী ডেড বডিও মেলেনি। এখনও আনট্রেসেব্‌ল। এই বিক্রম আচার্য সেই স্কুলমাস্টারের ছেলে।

সুশোভন এই ঘটনাটা জানেন না, কিন্তু বোসদা চমকে উঠলেন।

অস্ফুট স্বরে বললেন, দুয়ারসিনির কার্তিক আচার্য? তাঁর সঙ্গে আমার দু'-তিনবার দেখা হয়েছে, আমি তাঁর বাড়িতেও গেছি। তাঁর ছেলে এত বড় হয়ে গেছে? সময় কী দ্রুত দৌড়োচ্ছে!

হেমকান্তি এই আলোচনায় কোনওরকম মনোযোগ না দিয়ে একটার পর একটা বিস্কুট খেতে খেতে সব শেষ করলেন।

বোসদা তার দিকে ফিরে বললেন, হেম, তুই কি কখনও কার্তিক আচার্যকে মিট করেছিলি?

হেমকান্তি অন্যমনস্কভাবে দু'দিকে মাথা নাড়লেন।

বোসদা আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোর দুয়ারসিনির কথা মনে আছে?

হেমকান্তি আবার সেরকম।

এবার সুশোভন তির্যকভাবে জিজ্ঞেস করলেন, হেমকান্তি লাহিড়ীর কি তার বাপ-মায়ের কথা মনে আছে? নাকি তাও হজম?

গৌতম তাঁকে বকুনি দিয়ে বললেন, সুশোভন!

হেমকান্তি কোনও উত্তর দিলেন না।

বোসদা বললেন, ওঃ হো, হেম, তোর ভাইঝি আমার কাছে খোঁজ নিতে এসেছিল। তাকে তো একটা খবর দেওয়া উচিত।

তিনি উঠে গেলেন টেলিফোনের কাছে।

গৌতম হেমকান্তির দিকে খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, হেম, আমাকে তুমি চিনতে পারছ না বুঝতে পারছি। কিন্তু একসময় আমরা একসঙ্গে অনেক জায়গায় গেছি। দু'-একটা ঘটনা বললে তোমার মনে পড়েও যেতে পারে। বলব?

হেমকান্তি ওঁর মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে রইলেন।

গৌতম বললেন, ট্রেন থেকে নেমে আমরা চারটে সাইকেল রিকশা ধরলাম। তুমি, আমি, বোসদা, ইন্দ্রনাথ, সক্রেটিস, দময়ন্তী, কার্ল মার্ক্স আর দীপান্বিতা। মিনিট পনেরোর মধ্যেই পৌঁছে গেলাম সমুদ্রের ধারে। মনে আছে? একটু পরেই আর একটা সাইকেল রিকশায় এসে পৌঁছে গেলেন অ্যারিস্টট্ল, সঙ্গে তাঁর একটি অল্পবয়েসি ছাত্র। সেই ছাত্রটির কথা মনে পড়ছে, সে-ই তো আলেকজান্ডার দা গ্রেট হয় পরে। তখন খুব দুরন্ত ছিল। দীপান্বিতার একটা পোষা বাঁদর ছিল, ছোট, এইটুকু, সেটা সবসময় ওর কাঁধে বসে থাকত আর আঁচলটা জড়াত মাথায়। মনে পড়ছে?

টেলিফোন সেরে এসে বোসদা কাছে দাঁড়িয়ে এই গল্প শুনছেন।

গৌতম বলতে লাগলেন, তোমার সঙ্গে যে দময়ন্তীর প্রেম ছিল আগে থেকেই, তা আমরা জানতাম। কিন্তু কার্ল মার্ক্স তো জানতেন না। ওঁর একটু একটু হিংসে হয়েছিল। দময়ন্তীকে তখন ফাটাফাটি দেখতে। কার্ল মার্ক্স মাঝরাত্তিরে দাড়ি কামাবার পর তোমাকে ডেকে তুলে বললেন, আগে দাস

ক্যাপিটাল পড়ো, নইলে তুমি প্রেমের কিছুই বুঝবে না। তখন তুমি কী বলেছিলে, মনে আছে? তুমি চেঁচিয়ে বলেছিলে, পড়ব মানে? পাতার পর পাতা মুখস্থ বলে দিতে পারি। তাই শুনে সক্রেটিস বললেন, এই কলোকিয়ামে গ্রিক ছাড়া অন্য কোনও ভাষা চলবে না!

সুশোভন শ্লেষের সঙ্গে বললেন, গৌতম ভাবছে, হেমকে জড়িয়ে একটা গাঁজাখুরি গল্প ফাঁদলে ও নিশ্চয়ই হঠাৎ প্রতিবাদ করে উঠবে। তাতেই ফিরে আসবে স্মৃতি! হাঃ! অ্যামেচারিশ! ওর তো কোনও রি-অ্যাকশনই হচ্ছে না।

বোসদা হাসতে হাসতে বললেন, তোর কল্পনার দৌড় আছে বটে। দীপান্বিতার কাঁধে বাঁদর। দীপান্বিতা শুনলে—

গৌতম বললেন, আমরা কলেজজীবনে একটা খেলা খেলতাম। একজন কেউ প্রশ্ন করবে, তার সম্পূর্ণ একটা মিথ্যে উত্তর দিতে হবে। শুধু মিথ্যে নয়, একেবারে অসম্ভব। সেটাই আসল। যেমন, রাম কার ছেলে? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হবে, ভীষ্মর। গোলাপ ফুল কোন দেশ থেকে এসেছে? সমুদ্রের তলা থেকে! সরস্বতীর হাতে কী থাকে? কাস্তে আর হাতুড়ি!

সুশোভন বললেন, গৌতম ধর কার নাম? হ্যামলেটের ছেলের নাম। চলো, এবার বাড়ি যাই।

গৌতম ওকে পাত্তা না দিয়ে বললেন, খুব তাড়াতাড়ি এই যে একটা মিথ্যে, একটা অবাস্তবকে তৈরি করা, এতে কল্পনাশক্তি অনেক শার্প হয়। সত্যের একই বর্ণ কিন্তু মিথ্যের বহু বর্ণচ্ছটা। আমার ওই গল্প শুনে হেমকান্তি প্রতিবাদ করবে তা আশা করিনি। তবে ওর কল্পনাশক্তি যদি উসকে যায়, নিজেও কল্পনা শুরু করে, সেটাই আসল দরকার। কী, হেম, কেমন লাগল?

হেমকান্তি বললেন, বেশ তো। আর কিছু খাবার।

তখনই দরজা ঠেলে ঢুকল জয়ী। তার হাতে একটা সাদা খাম।

ভেতরে এসে খামটা বোসদার পাশে রেখে বলল, বোসদা, এই আপনার ট্যাক্সিভাড়া। থ্যাঙ্কস। চলো, ফুলকাকা।

বোসদা বললেন, ওর বোধহয় খুব খিদে লেগেছে। বাড়িতে নিয়ে আগেই কিছু খেতে দিয়ো। একটা ভাল সাইন দেখছি, জয়ী। সেদিনের তুলনায় আজ অনেক স্পষ্ট কথা বলতে পারছে।

জয়ী বলল, ওঁর কেসটা তো অ্যালঝাইমারস নয়। টেম্পোরারি ব্লকেড। ডাক্তারদের মতে, আচ্ছা থাক, এ নিয়ে পরে কথা বলব।

বোসদা বললেন, একটু দাঁড়াও জয়ী। ডাক্তাররা কী বলছেন একটু শুনতে চাই।

গৌতম বললেন, আমরাও ইন্টরেস্টেড। আমাদের সঙ্গে তো অনেক দিনের চেনা।

জয়ী বলল, মানুষের ব্রেনের একটা অংশকে বলে হিপপোক্যামপাস, অনেক স্মৃতি, অনেক তথ্য এখানে জমা থাকে। আবার অনেক অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার বাতিলও হয়ে যায়। হঠাৎ কোনও কারণে এই অংশটা আর সক্রিয় থাকে না, মানে, অ্যাক্টিভিটি বন্ধ হয়ে যায়। আবার ফিরেও আসে, কখনও খুব কুইকলি, কখনও অনেকটা সময় নেয়। তবে, হঠাৎ ফিরে আসার চেয়ে আস্তে আস্তে ফিরে আসাই বেশি হেল্পফুল, নইলে আবার কোনও শক পেলে আগের জায়গায়... যেমন হয়েছিল সেদিন সকালে... তার আগে তো অনেকটা ইমপ্রুভ করেছিলেন।

বোসদা বললেন, জয়ী, সেদিন সকালে কীসের জন্য ও শক পেয়েছিল বলতে পারো? কেউ তো গন্ডগোল করেনি, ওকে কিছু বলেওনি।

জয়ী ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, আমি তা কী করে বলব, আমি কি সেখানে উপস্থিত ছিলাম? আপনারা ঠিকমতন যত্ন নেননি নিশ্চয়ই! আফটার অল উনি তখনও বেশ অসুস্থ ছিলেন, অনেক ওষুধ খাচ্ছেন, সেই অবস্থায় ওঁকে বক্তৃতা দেওয়ানোর জন্য মঞ্চে তোলা কি উচিত হয়েছে আপনাদের? সার্টেনলি নট!

জয়ীর ধমক খেয়ে বোসদার মতন মানুষও খানিকটা মিনমিন করে বললেন, হয়তো তাই। আমাদের ভুল হয়েছে। ঠিক বুঝতে পারিনি।

জয়ী হেমকান্তির এক হাত ধরে বলল, এসো ফুলকাকা। বাইরে এসে হাঁটতে হাঁটতে সে বলল, বাড়িতে দু'জন পুলিশ বসে আছে। তোমাকে কিছু জিজ্ঞেসাবাদ করবে।

হেমকান্তি বললেন, পুলিশ?

জয়ী বলল, হ্যাঁ, তোমার জন্য আমি ডি সি ডি ডি-কে ফোন করেছিলাম, উনি আমার চেনা। সারা শহর পুলিশ তোমার খোঁজে তোলপাড় করে ফেলেছে। তুমি যা পারবে উত্তর দেবে, না পারলে বলবে, জানি না, মনে নেই।

একটু থেমে সে আবার বলল, উফ্, আমার বাবাটা কী হিপোক্রিট। পুলিশের সামনে এমনভাবে কথা বলল, যেন ছোট ভাইয়ের জন্য সবসময় কষ্টে তার বুক ফাটছে! এমন বাবাদের নিয়ে আর পারা যায় না!

বাড়ির সদর খোলাই রেখে গিয়েছিল জয়ী। বৈঠকখানায় কেউ নেই, অন্ধকার। পুলিশ নিশ্চয়ই ওপরে।

হেমকান্তির দু'কাঁধে হাত দিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে জয়ী বলল, উঃ, ফুলকাকা, তুমি আজ কী করেছ? এরকমভাবে রাস্তায় বেরিয়ে ... যদি কোনও অ্যাকসিডেন্ট হত? চন্দননগর থেকে ফেরার সময় সারাটা ট্রেনে আমি কেঁদেছি! ক্যান ইউ বিট ইট, আমি জীবনে কাঁদি না! সবাই জানে, এই সুজয়া নামের মেয়েটা কঠিন, বদমেজাজি, লোককে বকাবকি করি, কোনও পুরুষের সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা হয় না, সেই আমিই লোকজনের সামনে কাঁদতে কাঁদতে... আজ আমি বুঝতে পারলাম, তোমার স্থান আমার জীবনে কতখানি। আর আমি তোমাকে ছাড়ছি না!

সে হেমকান্তির বুকে মাথা রাখল।

এগারো

জানলা খোলা শিয়রের কাছে, তাই ভোরের প্রথম আলো পড়ল হেমকান্তির চোখে। তখনও সূর্য দেখা যায় না। তাই আলোর রং নীলাভ।

চোখ মেলে আরও একটু সময় শুয়ে থেকে তারপর তিনি উঠে বসলেন।

দুই ভুরুর মধ্যে মনঃসংযোগ করতেই তাঁর মনে পড়ল, জয়ী তাঁকে ছাদে যেতে বলেছিল।

যেন একটা তরল কিছুর মতন আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল তাঁর সারা শরীরে। মনে পড়েছে! হ্যাঁ, কাল সন্ধের পর জয়ী তাঁকে যা যা বলেছিল, সব তাঁর মনে আছে। অন্ধকার বৈঠকখানায় তাঁর বুকে মাথা রেখে কেঁদেছিল জয়ী। মনে আছে। বোসদার বাড়িতে আরও কারা যেন ছিল, নাম মনে নেই। কিন্তু মুখ মনে আছে। বোসদার ডাকনাম ভোমরা, মনে আছে। দময়ন্তীর কথা, অনেকটা অস্পষ্ট, তবু একটু একটু মনে পড়ে।

এতে তো আনন্দ হবেই। কেননা, তার আগের দিনগুলি একেবারে অন্ধকার।

হেমকান্তি মনে করার চেষ্টা করলেন, কাল সকালে তিনি কী খেয়েছিলেন? অনেক চেষ্টা করেও মনে আনতে পারলেন না। শুধু তাই-ই নয়, মানুষের

জাগ্রত জীবনটা তো সর্বক্ষণই চলচ্চিত্র, কিন্তু হেমকান্তি মাঝে মাঝে চোখের সামনে শুধু স্থিরচিত্র দেখতে পান। তিনতলার বারান্দা, এক দিক দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে, এক পাশে কয়েকটা জুতো। এ দৃশ্যের কোনও মর্ম নেই, তবু কাল সকালের কথা ভাবতে গিয়ে এই দৃশ্যটাই দেখছেন।

খাট থেকে নেমে, বাথরুমে গিয়ে যথাযথভাবে দাঁত মাজলেন। অন্যান্য প্রাকৃতিক কর্ম সেরে তিনি বেরিয়ে এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়ালেন। এবার কী যেন? ছাদে যে যেতে হবে, তা ভুলে গেছেন এরই মধ্যে।

অনেকদিন পর তিনি বললেন, রি-কল! রি-কল! কোথায় গেলে? ফিরে এসো!

কয়েকবার এরকম করতেই বিদ্যুৎ ঝলকের মতন চকিতে ফিরে এল, জয়ী, জয়ী, ভোর, ছাদ...

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েও ফিরে এলেন। ড্রয়ার খুলে বার করলেন চশমা। বেশ কয়েকদিন এই চশমা ব্যবহার করেননি। চশমাটা যে ড্রয়ারেই ছিল, তা মনে রইল কী করে?

ছাদের দরজাটার খিল খোলা, কিন্তু জয়ী এখনও আসেনি।

অল্প অল্প মেঘ ছড়ানো-ছিটানো আকাশ। স্নিগ্ধ হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে যায়। পাশের পুকুরটা ও গাছপালা নতুন আলোয় সবে জেগে উঠছে। একটা কোনও পাখি ডাকছে, এই ডাক হেমকান্তি চেনেন না। মাথার ওপর ঝটাপট করে উড়ে গেল একঝাঁক পায়রা।

নীল স্ট্রাইপ পাজামা ও একই রঙের জামা তাঁর গায়ে। কিছু না ভেবে তিনি বুকের বোতামগুলো খুলে ফেললেন।

কার্নিশে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আচম্বিতে তিনি বলতে লাগলেন,

কী গাহিবে, কী শুনাবে! বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ! স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে!
মহাবিশ্ব জীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে
ছুটিতে হবে

ছুটিতে হবে
সত্যেরে করি ধ্রুবতারা।

মস্তকে পড়িবে ঝরি
মস্তকে পড়িবে ঝরি
মস্তকে পড়িবে ঝরি ...

তারপরেই পেছন ফিরে তিনি দেখলেন, কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জয়ী।

জয়ী বলল, বাঃ! তুমি কী বলছিলে?

হেমকান্তি হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, কিছু বলছিলাম?

তুমি কোনও কবিতা আবৃত্তি করছিলে। কার কবিতা?

কবিতা আবৃত্তি করছিলাম? কিছু মনে নেই তো!

মনে হল রবীন্দ্রনাথের কবিতা। কোন কবিতাটা তা ঠিক বুঝতে পারিনি। আর একবার বলো তো।

আমি যে কিছু বলছিলাম, সেটাই যে মনে পড়ছে না জয়ী?

নেভার মাইন্ড। আস্তে আস্তে সব মনে পড়বে। আজ থেকে আমি তোমার ভার নেব। তোমার চিকিৎসাও করব আমি।

তলার নিচু ছাদটায় যাবার জন্য দুটি চওড়া সিঁড়ি, সেখানে বসে পড়ে জয়ী তার পাশের জায়গাটা চাপড়ে বলল, এখানে এসে বসো।

হলুদ রঙের একটা ঢোলা ম্যাক্সি পরে আছে জয়ী। তার শরীরে কোনও অলংকার নেই। শুধু হাত-পায়ের নখগুলিতে লাল পালিশ। গাঢ় চোখ দুটি এমন টানাটানা যেন মনে হয় কাজল লাগানো, তা নয় অবশ্য।

কাঁধের ব্যাগ থেকে সে একটা কালো রঙের মোটা ডায়েরি, একটা আপেল ও একটা কলম বার করল।

ডায়েরিটা তুলে জিজ্ঞেস করল, এটা কী?

হেমকান্তি বললেন, বই।

ঠিক বই নয়। ডায়েরি। তাও মোটামুটি ঠিক আছে। এটা?

কলম।

গুড। আর এই জিনিসটা?

আপেল।

গুড। অ্যান অ্যাপ্‌ল আ ডে, কিপস দা ডক্টর অ্যাওয়ে! এর মানে জানো?

আপেল খেলে অসুখ সেরে যায়। তাই না?

ভুল। এর মানে হল, রোজ যদি তোমার ডাক্তারকে একটা করে আপেল ছুড়ে মারো, তা হলে ডাক্তার ভয়ে আর আসবে না! অসুখ হলে আপেল খেতে হবে, এটা সাহেবদের একটা বাজে গুজব। আপেলের চেয়ে পেয়ারার খাদ্যগুণ অনেক বেশি। যাই হোক, তুমি এটা খেতে পারো।

জয়ী হেমকান্তির হাতে আপেলটা ধরিয়ে দিল, তিনি সেটা ধরে বসে রইলেন।

জয়ী ডায়েরিটা খুলে পাতা উলটে উলটে এক জায়গায় থামল। সে পাতার একটি ছবি দেখিয়ে বলল, এটা দেখো, খুব ভালো করে দেখো। খানিকটা বাদে এই ছবিটা তোমাকে আঁকতে হবে মন থেকে।

ডায়েরিটা বন্ধ করে জয়ী বলল, আগে সাধারণভাবে কয়েকটা কথা বলি। মানুষ নানা কারণে স্মৃতি হারিয়ে ফেলে। বার্ধক্যে তো হয়ই। আমার দিদিমা আমাদেরও চিনতে পারতেন না শেষের দিকে। দুপুরে কিছু খেয়েছেন কি না তা ভুলে যেতেন বিকেলে। কিন্তু কুড়ি-পঁচিশ বছর আগের কিছু কিছু ঘটনা বেশ বলতে পারতেন। তোমার তো সে অবস্থা নয়, তত বয়েসও হয়নি। তোমার সব স্মৃতি ফিরে আসতেও পারে। অন্তত কিছু কিছু স্মৃতি আমি উদ্ধার করে দেব। এবারে আমি সাত-আটটা শব্দ বলব, অ্যাট র‍্যান্‌ডম, তুমি সেগুলো মনে রেখে রিপিট করার চেষ্টা করবে! সবগুলো পারবে না। তবু কত পারসেন্ট রাইট হয়, সেটাই দেখতে হবে। শোনো, দ্রৌপদী, নিমপাতা, ইলিশমাছ, মুর্শিদাবাদ, ছোটমাসি, রিভলবার, সুবর্ণরেখা, শেষের কবিতা, আমি! কটা হল, ন'টা! এবার তুমি বলো!

হেমকান্তি মোট চারটি সঠিক বলতে পারলেন, তাও বেশ কিছুটা সময় নিয়ে।

জয়ী খুশি হয়ে বলল, গুড! যথেষ্ট ভালো হয়েছে। আজ সারাদিন এই শব্দগুলো মনে করবার চেষ্টা করবে। দেখবে, পটপট করে এক একটা মনে পড়ে যাবে। আর একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, তুমি প্রথমেই বললে, আমি। তার মানে, তোমার নিজের ওপর কনফিডেন্স ফিরে আসছে। আমি প্রথম দিনেই তোমার ব্রেনকে বেশি খাটাব না। তুমি আর একটু কাছ ঘেঁষে বসো,

আমার গায়ের সঙ্গে তোমার গা লেগে থাক। কিছু মনে কোরো না।

হেমকান্তি বললেন, তাতে কী হবে?

জয়ী বলল, একটা সত্যি কথা ডাক্তাররাও মুখ ফুটে স্বীকার করতে চান না। এই চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ হল শারীরিক স্পর্শ। আরও স্পষ্ট করে বললে, যৌনসুখ। তা অনেক রকমের হয়। কোনও মেয়ের সঙ্গে খুব কাছাকাছি বসে কথা বলা, আঙুলে আঙুল ছোঁওয়া। সাহেবরা এই টাচকে বলে ভিটামিন টি। খুব ইমপর্ট্যান্ট। যখন নার্সিংহোমে ছিলে, নার্সরা তোমাকে চান করিয়ে দিয়েছে, গা-মাথা মুছিয়ে দিয়েছে, কখনও হয়তো হাত বুলিয়ে দিয়েছে বুকে, তাতেই কিছুটা সেকসুয়াল প্লেজার পাওয়া যায়। পুরুষ রুগিরা লেডি ডাক্তারের চিকিৎসায় তাড়াতাড়ি ফল পায়ও এইজন্য।

তুমি আমার লেডি ডাক্তার!

আমার সবচেয়ে কী ভাল লাগছে জানো ফুলকাকা। তুমি এই যে ভাষা ফিরে পেয়েছ। মাঝখানে তো কথাই বলতে পারতে না। ভাষা না থাকলে কমিউনিকেট করাই যায় না। কিছুক্ষণ পর এগজাসপারেটিং লাগে। বাড়িতে ফিরে আসার পর তোমাকে কেউ টাচ করে? ওই ঝিল্লি মেয়েটা তোমাকে স্নানটান করিয়ে দেয়?

আমি নিজেই পারি।

মাথা টিপে দেওয়া, কিংবা বুকে হাত বুলিয়ে দেওয়া, এসবও করে না?

না।

ও মেয়েটা বোধহয় অন্য কারও সঙ্গে প্রেম করে। তা করুক। তুমি মাঝে মাঝে ওকে জড়িয়ে ধরলে পারো। স্নেহ স্নেহ ভাব করে ধরবে। বাংলা সিনেমায় নায়িকার বাবারা যেমন জড়িয়ে ধরে। এক ভদ্রলোক লিখেছিলেন, সুচিত্রা সেনকে উত্তমকুমার যতবার জড়িয়ে ধরেছে, তার চেয়েও বেশি জড়াজড়ি করেছে বাবা হিসেবে ছবি বিশ্বাস।

ও মেয়েটা আসলে কে?

ঝিল্লি? ও মেজবাবুর শ্যালিকার মেয়ে। শ্যালিকা কাকে বলে জানো তো?

জানতাম নিশ্চয়ই আগে।

মেজবাবুর স্ত্রী, তোমার মেজবউদি ভারতীকে মনে আছে তো?

না।

বেশ। মনে পড়বে কখনও। সেই ভারতীর বোনের নাম আরতি। তার স্বামী

বীরেশ্বর দত্ত বিখ্যাত মাতাল আর উড়নচণ্ডী। তোমার মেজদার ঠিক উলটো। তোমার মেজদা, মানে আমার মেজজ্যাঠাটা তো হাড় কঞ্জুষ! যাই হোক, বীরেশ্বর দত্ত ভারতী আর আরতি আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাচ্ছিল ধানবাদ একটা মারুতি ভ্যানে গাদাগাদি করে। আসানসোলের কাছে একটা দারুণ ট্র্যাজিক ব্যাপার হয়। রাত্তিরে ড্রাইভ করছিল, পেটে কতটা মদ ছিল কে জানে, একটা ট্রাকের সঙ্গে হেড অন কলিশন। একসঙ্গে সব শেষ। আরতির দুটি ছেলেমেয়ে ছিল, ভারতীরও এক ছেলে, কেউ হাসপাতাল পর্যন্তও বাঁচেনি। শুধু বীরেশ্বর মৃত্যুর সঙ্গে লড়েছিল আরও তিন দিন। বেঁচে গেল শুধু আরতি-বীরেশ্বরের বড় মেয়ে এই ঝিল্লি, সে যায়নি ওই গাড়িতে, তার তখন পরীক্ষা ছিল। আর মেজবাবুর এক নাতি, তার নাম সোম, সে ছিল মামারবাড়িতে।

হেমকান্তি বললেন, ইস! আমি তখন কোথায়?

জয়ী বলল, নিরুদ্দেশে। তোমার খবর কেউ জানত না, কেউ মাথাও ঘামাত না। এক রাতে ঝিল্লি ওর মা-বাবা, ভাই-বোনদের হারায়। শুধু তাই নয়, এর পর জানা গেল, ওর বাবা শেয়ার মার্কেটে কীসব করত, বাজারে প্রচণ্ড ধার, বাড়িটাও বন্ধক দেওয়া। ঝিল্লি কোথায় যাবে, মেজবাবু তাকে এ-বাড়িতে আশ্রয় দিলেন। শুনেছি মেয়েটা পড়াশুনোয় ভালো ছিল, কনভেন্টে পড়ত। কিন্তু আর কন্টিনিউ করল না। কে পড়াবে? মেজবাবু তো কিপটে, পয়সা খরচ হবে বলে ওকে আর জোর করে পড়ালেনও না। ঝিল্লি এমনি রয়ে গেছে এখানে। তবে মেয়েটার খুব আত্মসম্মান জ্ঞান আছে। নেহাত আশ্রিতা হয়ে থাকতে চায় না, এ-বাড়ির অনেক কাজও করে।

হেমকান্তি বললেন, দাঁড়াও, মনে পড়েছে, অজ... অজা... অজাজু... অযোনি... অযোনিসম্ভূতা, অযোনিসম্ভূতা... এই কথাটার মানে কী?

বাবাঃ, দারুণ একটা শক্ত কথা বলে ফেলেছ তো। কিপ ইট আপ। ওই কথাটার মানে হচ্ছে, যে নারী অন্য কোনও নারীর গর্ভে জন্মায়নি।

তা কি সম্ভব?

কাব্যসাহিত্যে সম্ভব। যেমন ধরো, রামায়ণের সীতা। তার মা কে? কেউ না। সে মাটি থেকে এসেছে, লাঙলের ফলায় রাজা জনক তাকে পেয়েছিলেন। দ্রৌপদীও তো তাই। রামায়ণ আর মহাভারত, দুটো মহাকাব্যের নায়িকাই অযোনিসম্ভূতা। দ্রৌপদীও যজ্ঞের আগুন থেকে উঠে এসেছে, তাই তার আর এক নাম যাজ্ঞসেনী।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই নাম। ওই নাম ওর।

কার, ঝিল্লির? ওর ভাল নাম যাজ্ঞসেনী? হতেও পারে। দুঃখের বিষয়, মেয়েটা আমাকে পছন্দ করে না, তাই ওর সঙ্গে আমার ঠিক ভাব হল না। আমি যে তোমার কাছে আসি, তাও ও পছন্দ করে না বুঝতে পারি। তবে, ফুলকাকা, তোমার তিনতলার লোকরা যাই মনে করুক, আমি এখন থেকে প্রত্যেক দিন সকালে তোমার সঙ্গে ছাদে এসে বসব। সবচেয়ে ভাল হত, যদি তোমাকে দোতলায় নিয়ে যাওয়া যেত, আমার মা তোমাকে পছন্দ করে, কিন্তু আমার বাবা, উফ্, ইমপসিব্‌ল! আমি কী ঠিক করেছিলাম জানো, বাবার ওরকম ব্যবহার আর সহ্য করব না, এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। চন্দননগরে গিয়ে থাকব। এখন তো আর তোমাকে ফেলে যাওয়া হবে না। যেদিন তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে, সেদিনই আমি কেটে পড়ব এ-বাড়ি থেকে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে, ডায়েরিটার পাতা ওলটাতে ওলটাতে জয়ী আবার জিজ্ঞেস করল, ফুলকাকা, তুমি ছবি আঁকতে পারতে কখনও?

হেমকান্তি হেসে বললেন, কী জানি!

জয়ী বলল, আমি তোমাকে কখনও আঁকতে দেখিনি। তবে, একটু-আধটু আঁকার হাত সবারই থাকে। তোমাকে আমি যে-ছবিটা দেখিয়েছিলাম, এবার সেটা আঁকতে হবে। ভালো আঁকা হবে কি না, তা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। কতটুকু মনে আছে, তাই-ই দেখতে চাই। মানুষ ছিল না বাঘ-সিংহর মুখ! কিছু কি লেখা ছিল, বাংলা না ইংরিজিতে? নাও, চেষ্টা করো।

ডায়েরিটা নিয়ে হেমকান্তি বললেন, আশ্চর্য, একটু আগেই তো দেখলাম, তবু কিছুই মনে পড়ছে না।

জয়ী বলল, ট্রাই। ড্র এনিথিং!

কলমটা হাতে নিয়ে হেমকান্তি সাদা পৃষ্ঠাটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আপন মনে বললেন, আমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম, এখন বেঁচে আছি। এই বেঁচে থাকাটা কতটা ওয়ার্থহোয়াইল? এ জীবন নিয়ে আমি কী করব?

জয়ী বলল, সমস্ত বেঁচে থাকাই ওয়ার্থহোয়াইল। মানুষ সারাজীবন ধরেই তার জীবনের গৌরব খুঁজে বেড়ায়। এ বিষয়ে আমরা পরে কথা বলব। তুমি ছবিটা আঁকো।

হেমকান্তি একটা সরলরেখা টানলেন। খানিকটা জায়গা ছেড়ে তলায় আর

একটা। সেই সাবলীল রেখা দেখেই বোঝা যায়, তাঁর ছবির শিক্ষা আছে।

কয়েক টানে আঁকলেন একটি মেয়ের মুখ, তবে তা অন্য দিকে। মাঝখানে একটা দাগ টেনে আর একটা পাশে ফুটিয়ে তুললেন একটা ডানামেলা পাখি।

ছবি শেষ হল না, তার আগেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। উঠে এল ঝিল্লি।

সে বলল, কফি দিতে গিয়েছিলাম, ঘরে নেই দেখে...। কফি এখানে নিয়ে আসব?

জয়ী বলল, তাই নিয়ে এসো।

ঝিল্লি জিজ্ঞেস করল, তুমিও খাবে তো?

জয়ী বলল, না। দাঁড়াও।

ঝোলা ব্যাগ থেকে মোবাইল ফোনটা বার করে সময় দেখে সে বলল, ওরে বাবা, এর মধ্যে সওয়া সাতটা বেজে গেছে? আমার আর সময় নেই, আমাকে তৈরি হয়ে নিতে হবে।

ডায়েরির সেই পাতাটা ছিঁড়ে বলল, ফুলকাকা, এটা নিয়ে যাও, সারাদিনে যখন খুশি আঁকার চেষ্টা করো। কাল সকালে আমি আবার দেখব। এখন তুমি নিজের ঘরে যাও।

তারপর ঝিল্লির দিকে পুরোপুরি ফিরে সে জিজ্ঞেস করল, ঝিল্লি, সকালবেলা ওঁকে কী খেতে দাও?

ঝিল্লি বলল, ডিমসেদ্ধ, টোস্ট, কফি। এক এক দিন লুচি-আলুরদম।

জয়ী বলল, ভুল খাবার। নো, নো, আই মিন, ওসব খেতে চাইলে খাবেন, তার সঙ্গে কিছু সাপলিমেন্টারি জিনিস দিতে হবে। তোমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। মানুষের মস্তিষ্ক যখন দুর্বল হয়ে যায়, তখন কিছু আলাদা ব্যবস্থা তো নিতেই হয়। মস্তিষ্কের প্রধান খাদ্য হচ্ছে অক্সিজেন আর গ্লুকোজ! অক্সিজেনের চাই হালকা ব্যায়াম, আর কিছু কিছু ফল গ্লুকোজ তৈরিতে সাহায্য করে। ওঁর তো ব্লাড সুগার নেই। সকালে কলা দিতে পারো। এখন খুব ভাল সফেদা পাওয়া যাচ্ছে, আনারস, পেয়ারা। ফল খেতে না চাইলেও জোর করবে। স্যালাড, শাক-সবজি, এতেও স্মৃতিশক্তি বাড়ায়। আর লুচির বদলে আটার রুটি।

ঝিল্লি বলল, ঠিক আছে, এসব দেবার চেষ্টা করব।

জয়ী বলল, আর একটা কাজ আছে। সারাদিনে একবার অন্তত ওঁর বুকে হাত বুলিয়ে দেবে। সারা গায়েই বিলিকাটা, সুড়সুড়ি দেওয়ার মতন করলে ভালো হয়। উনি আপত্তি করলেও... তুমি পারবে না?

তাতে কী হবে?

রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পাবে। মাঝে মাঝে সেটা খুব দরকার।

জয়ীদি, তুমি বুঝি ডাক্তার?

না ঝিল্লি, আমি ডাক্তার নই, সেটা তুমি ভালোই জানো। আমি কিছুদিন একটা ওল্ড এজ হোমে ভলেন্টিয়ারি সার্ভিস দিয়েছিলাম, তখন শখ করে এইসব শিখতাম।

কিন্তু উনি তো বুড়ো নন!

ঠিক বলেছ। উনি মোটেই বুড়ো নন। ইন ফ্যাক্ট পুরুষ মানুষের জীবনে এই একান্ন-বাহান্ন বছর বয়েসটা খুবই অ্যাকটিভ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সব ঠিকঠাক থাকে, এমনকী যৌবনের চেয়েও এই মধ্য বয়সটাই বেশি ভিরাইল থাকে। কিন্তু স্মৃতিশক্তি না থাকলে আস্তে আস্তে ভেজিটেবল হয়ে যাবে, তা আমরা কিছুতেই হতে দিতে পারি না। একজন শিক্ষিত, গুণী মানুষ, ওঁর এখনও অনেক কিছু দেবার আছে। যাই হোক, তুমি জিজ্ঞেস করছিলে, আমি ডাক্তার কি না। আমি তো কোনও ওষুধ দিচ্ছি না। সাধারণ কয়েকটা নিয়ম... তাতে তো ক্ষতি কিছু হবে না!

ঠিক আছে, আমি নীচে যাই। কফিটা গরম করতে হবে।

আর একটু দাঁড়াও, ঝিল্লি। জানি, তোমার পক্ষে সবসময় ওঁকে চোখে চোখে রাখা সম্ভব নয়। তোমার অন্য কাজ আছে, বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে বাইরে যাওয়া আছে, তবু একটা কিছু ব্যবস্থা যদি করা যায়, যাতে উনি হুট করে আবার একা একা রাস্তায় নেমে যেতে না পারেন...

হেমকান্তির দিকে ফিরে সে বলল, এই যে ফুলকাকা, তুমি শুনে রাখো, আবার যদি কোথাও চলে যাও, তা হলে পুলিশ দিয়ে তোমায় ধরে এনে পাগলাগারদে ভরে দেব। সারা জীবন পাগলদের সঙ্গে কাটাবে।

হেমকান্তি নিঃশব্দে হাসলেন।

জয়ী আবার ঝিল্লিকে বলল, যদি দরকার হয়, ওঁকে আরও কিছুদিন নার্সিংহোমে রাখা যেতে পারে। সে দায়িত্ব আমি নিতে পারি।

ঝিল্লি বলল, তার জন্য মেজবাবুর সঙ্গে কিংবা টিটোদার সঙ্গে কথা বলো।

উঠে দাঁড়িয়ে ঝিল্লির দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি মেলে জয়ী নরমভাবে বলল, ঝিল্লি, আমি যদি মেয়ে না হয়ে পুরুষ হতাম, তা হলে আমি নিশ্চয়ই তোমার প্রেমে পড়তাম। ইউ আর সাচ অ্যান অ্যাট্রাকটিভ গার্ল। কিন্তু যেহেতু আমরা

দু'জনেই মেয়ে, বয়েসেরও যথেষ্ট তফাত আছে, তাই আমরা তেমন ক্লোজ হতে পারলাম না।

মাটির দিকে চেয়ে নতমুখে ঝিল্লি বলল, তুমি আমাকে হারিয়ে দিলে।

ঠিক বুঝতে না পেরে জয়ী একটু ভুরু কুঁচকে বলল, তার মানে? তোমার সঙ্গে তো আমার অ্যাজ সাচ কোনও প্রতিযোগিতা নেই।

আর কিছুই না বলে ঝিল্লি নীচে নেমে গেল।

কয়েক মুহূর্ত কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জয়ী।

তারপর পুকুরটার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, দুটো পানকৌড়ি এসেছে। ছোটবেলা থেকে ওদের দেখছি। পানকৌড়িরা ঝিরকুট্টে কালো আর মাছরাঙাদের পালকে কত রকম রং। অথচ ওদের পেশা একই।

আবার সম্পূর্ণ প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে জয়ী আপন মনে বলল, হেলাফেলা সারাবেলা, এ কী খেলা আপন-সনে। তুমি বেশ আছ ফুলকাকা। হয়তো এই কর্কশ, হিংস্র বাস্তবে তোমার আর ফিরে না আসাই ভালো। আমরা কি ভুল করছি? যাই!

নিজের ঘরে ফিরে এসে হেমকান্তি দেখলেন, ছোট টেবিলের ওপর কফি ঢাকা দেওয়া আছে। আর দুটি ক্রিমক্র্যাকার।

কফিতে একটু চুমুক দিয়েই তিনি বইয়ের আলমারি থেকে একটা বই টেনে নিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা। কোনও এক সুধামাসি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। কোথায়, কত অতল অন্ধকারে হারিয়ে গেছেন সেই সুধামাসি।

ফরফর করে বইটার পাতা ওলটাতে লাগলেন হেমকান্তি। যা খুঁজছেন, তা খুঁজে পাচ্ছেন না।

প্রায় মিনিট পনেরো পরে, ততক্ষণে কফি শেষ হয়ে গেছে, এক জায়গায় তাঁর চোখ আটকে গেল।

> কী গাহিবে, কী শুনাবে। বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
> মিথ্যা আপনার দুঃখ।...

ছাদে একা দাঁড়িয়ে এই পঙ্‌ক্তিগুলি গড়গড় করে বলে যাচ্ছিলেন, জয়ীকে দেখে আবার ভুলে গেলেন। স্মৃতি-বিস্মৃতির এ কী খেলা! কেউ যেন রঙ্গ করছে তাঁকে নিয়ে।

বইটি বন্ধ করে তিনি চোখ বুজে বলতে লাগলেন :

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্ম রত
তুই শুধু ছিন্ন বাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূর বন গন্ধবহ মন্দ গতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি

হেমকান্তি ঠিক যেন মুখস্থ বলছেন না, যেন ভেতর থেকে একটা রেকর্ড বাজছে, তিনি শব্দগুলো অনুভব করছেন না, শব্দের ছবি দেখছেন না।

বারো-চোদ্দো লাইনের পরই থেমে গেলেন। অকস্মাৎ লোডশেডিংয়ে যেমন ক্যাসেট প্লেয়ার থেমে যায়।

চক্ষু বুজেই তিনি ফিসফিস করে বলতে লাগলেন, সুধামাসি, তুমি কোথায়? ফিরে এসো, ফিরে এসো, তোমার মুখখানা একবার দেখাও।

নেই। সুধামাসির মুখ নেই, কিন্তু চোখের ছায়াছবিতে ফুটে উঠল হেমকান্তির মায়ের মুখ। তরুণী অপরাজিতা, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। যথারীতি হাতে বই। তিনি গুনগুন করে একটা গান গাইছেন, কিন্তু সেই গানটা ঠিক শোনা যাচ্ছে না। অন্য একটা শব্দে ঢেকে যাচ্ছে সেই গান।

অন্য শব্দটি আসছে মেজবাবুর পুজোর ঘর থেকে। তিনি উঁচু গলায় সংস্কৃত মন্ত্র বলছিলেন, এখন গান গাইছেন :

আয় মন বেড়াতে যাবি, কালী
কল্পতরুর তলে বসে চারি ফল কুড়ায়ে খাবি
আয় মন বেড়াতে যাবি

স্মৃতির ছবি মুছে গেল, হেমকান্তি গান শুনতে লাগলেন। স্ত্রী-পুত্র দুর্ঘটনায় হারিয়ে গেছে শুনে মেজবাবুর প্রতি তাঁর মন কিছুটা নরম হয়েছে। এজন্যই হয়তো তিনি বদমেজাজে থাকেন। কাল রাত্তিরেও তিনি হেমকান্তিকে খুব বকাবকি করেছেন। বাড়িতে পুলিশ আসা তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না। সকালে বেরিয়ে গিয়েছিল হেম, সে আবার ফিরে এল কেন, এমন কথাও বলতে ছাড়েননি। তখন জয়ী বলেছিল, বাঃ, এটা তো ছোটকাকারও বাড়ি, উনি এখানে ফিরবেন না তো কোথায় ফিরবেন?

গলায় সুর আছে মেজবাবুর, গানটা শুনতে ভালোই লাগছে হেমকান্তির। চারি ফলের মানে বুঝতে পারছেন না। চার রকমের ফল? কল্পতরু নিশ্চয়ই কোনও গাছের নাম, এটাও অনেকটা অচেনা, অস্পষ্ট।

গানটা শেষ হবার পর হেমকান্তি আবার মায়ের ছবিটা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু স্মৃতির পট কি ইচ্ছেমতন পরিবর্তন করা যায়? চলচ্চিত্রের বদলে আবার স্থিরচিত্র। বারান্দা, সিঁড়ি, কয়েক পাটি জুতো। এরকম স্থিরচিত্রে আটকে যাওয়াটাই তাঁর এখন প্রধান সমস্যা। তিনি বিরক্ত বোধ করেন।

ঝিল্লির বদলে খাবার দিয়ে গেল সরমা।

হেমকান্তি তা স্পর্শ করলেন না।

জানলার দিকে তাকিয়ে রইলেন একটুক্ষণ, তারপর নিজেকেই দারুণ বিস্মিত করে তিনি একটা গান গেয়ে উঠলেন :

শ্যামল বরণী তোমার জন্যে
কত নদী বহে ফুল ফোটে অরণ্যে
খেতে সোনার প্লাবন খেলে যায়
জাগে ঘরে ঘরে কত না রাজকন্যে
রাজার কুমার দেয় জীবন অবহেলে
ওগো, তুমি বুঝি মোর বাংলা
আমার জীবনধন সাধের সাধনা
তোমায় কে দিয়েছে ব্যথা আমায় বলো না

হেমকান্তি ভুলেই গিয়েছিলেন যে তিনি গান গাইতে পারেন। একসময় গান শুনিয়ে মাতাতেন বন্ধুদের। গাইতে গাইতে ফিরে এল স্মৃতির চলচ্চিত্র। একটা গাছতলায় বসে চার-পাঁচজন মানুষ তাঁর গান শুনে চাপড় মেরে মেরে তাল দিচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন তাঁর খুব চেনা। কী নাম ওর? কী নাম?

বারো

বাস থেকে নেমে ঝিল্লি একটা সাইকেল রিকশা নিল।

অপরিসর রাস্তা, নানান বাঁক। কোথাও কোথাও দু'ভাগ হয়ে গেছে, ঝিল্লিকে নির্দেশ দিতে হচ্ছে অনবরত। এখন সে শাড়ি পরে আছে, কচিকলাপাতা রঙের, কপালে একটা সাদা টিপ।

জায়গাটার নাম গাঙ্গুলিবাগান। এককালে এখানে ছিল অধিকাংশই জলাভূমি, আর কিছু কিছু ধনী ব্যক্তির বাগানবাড়ি। তার পরে গজিয়ে উঠল বেশ কয়েকটি রিফিউজি কলোনি। অস্থায়ী ছাউনি, তারপর টালির ঘর, এখন অবশ্য অনেক বাড়িই পাকা হয়ে গেছে।

প্রধান রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে এলে এখনও কিছু ফাঁকা ফাঁকা জায়গা আছে। কোথাও তৈরি হচ্ছে নতুন বাড়ি। এখানকার রাস্তা কাঁচা।

এক জায়গায় কুমোরটুলির ক্ষুদ্র সংস্করণ। পর পর কয়েকটি চালাঘরে তৈরি হচ্ছে মাটির মূর্তি। অসমাপ্ত এক-মেটে, দো-মেটে। সারি সারি উলঙ্গ মৃন্ময়ী নারী।

ঝিল্লি সেখানে নামল রিকশা থেকে।

সত্যজিৎ রায়ের ফিল্মে এক কুমোরের চোখে ছিল নিকেলের চশমা। তিনি ঠিকই ধরেছিলেন। সব বয়স্ক কুমোরই বোধহয় নিকেলের চশমা পরে। এখানেও এক বৃদ্ধের চোখে সেই চশমা। তিনি এক মূর্তির হাতের আঙুল ঠিকঠাক করছিলেন, কঞ্চির বেড়া ঠেলে ঝিল্লিকে দেখে প্রথমে তিনি চোখ সংকুচিত করলেন, তারপর চিনতে পেরে বললেন, ভালো আছ তো মালক্ষ্মী?

লক্ষ্মী মেয়ের মতনই ঝিল্লি সেই বৃদ্ধের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, তুমি ভাল আছ, দাদু। কাশিটা কমেছে?

বৃদ্ধ বললেন, ওই আর কী! ওই কাশি শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে যাবে। যাও ভেতরে।

পেছন দিকে কয়েকটা টালির চালের ঘর। এই শিল্পীদের এখানেই সংসার।

একটা টিনের দরজায় কয়েকবার টক টক করার পর দরজা খুলে দিল এক যুবা। খুবই রোগা সে, মুখের মধ্যে প্রধান দ্রষ্টব্য তার খাড়া নাক আর মাথায় এত চুল যে কপালটা ছোট মনে হয়। হাফ হাতা গেঞ্জি আর পাজামা পরা, কোমরে একটা অ্যাপ্রন বাঁধা।

দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে সে বলল, এই, তোকে বলেছি না, সন্ধের পর আসবি না।

ঝিল্লি বলল, সর। সারাদিনে সময় পাই না।

যুবাটিকে ঠেলেই সে ভেতরে ঢুকে এল।

ঘরখানা খুব ছোট নয়, একটা কাঠের চৌকি এক পাশে। মাঝখানে একটা লেখার টেবিল ও দুটি চেয়ার, প্রচুর বই মেঝেতে গাদা করা। আর একটা টেবিলের ওপর গোটা সাতেক পুরুষের মুন্ডু, সবই সাদা রঙের। তার তলায় তাল তাল মাটি আর রঙের খুরি।

ঝিল্লি জিজ্ঞেস করল, এই সবগুলোই আজ তৈরি করলি?

সে বলল, অত সোজা না! এক দিনে সাতটা মুন্ডু, তা হলে বড়লোক হয়ে যেতাম। কাল রাত জাগতে হয়েছে, তার মধ্যে আবার শালা লোডশেডিং। এগুলো কার মুন্ডু বল তো?

ঝিল্লি বলল, কার্তিক ঠাকুর?

সে বলল, নবকাত্তিক! সামনেই বিশ্বকর্মা পুজো আসছে না? হেভি ডিমান্ড! আমার এই মুখগুলো গড়তে বেশ ভালো লাগে। কেন বল তো? এ কোনও ঠাকুর-দেবতা নয়। বিশ্বকর্মা তো মিস্তিরি। কারখানার মিস্তিরিরা এক মিস্তিরিকে পুজো করে।

হাতব্যাগ খুলে একটা ছোট্ট প্যাকেট বার করে ঝিল্লি বলল, তুই কাজুবাদাম খেতে চেয়েছিলি!

সে বলল, মোটেই খেতে চাইনি। সেদিন বলেছিলাম, নিউ আলিপুরে একটা টিউশনি করতে যেতাম, তারা মাইনে নিয়মিত দিত না, কিন্তু মাঝে মাঝে চায়ের সঙ্গে কাজুবাদাম খেতে দিত। এগুলোর তো অনেক দাম, তুই পয়সা পেলি কোথায়? তুই তো তোর মেসোর বাড়িতে বিনি পয়সায় বাঁদিগিরি করিস।

ঝিল্লি ফিক করে হেসে বলল, সংসার খরচের সব টাকা আমার কাছে থাকে। তার থেকে সরাই।

একখানা দারুণ শাড়ি পরেছিস দেখছি। তুই জামাকাপড় কিনিস কী দিয়ে?

তুই আমাকে কী ভাবিস বল তো বিক্রম? আমি প্রত্যেক মাসে এক হাজার টাকা হাতখরচ পাই। পুজোর সময় পোশাকের জন্য পাঁচ হাজার টাকা। তোর চেয়ে আমি ঢের বড়লোক।

আমার হাতে মাটি লেগে আছে। প্যাকেট ছিঁড়ে দুটো বাদাম আমার মুখে পুরে দে।

ঝিল্লি তাই করতেই বিক্রম তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমার মুখ থেকে তুই একটা নে।

সেই মাটি মাখা হাতই ঝিল্লির বুকে রেখে একটা প্রগাঢ় চুম্বন দিল বিক্রম।

তারপর গোটা চারেক বাদাম হাতে নিয়ে সে বলল, মাটি খেলে কোনও ক্ষতি হয় না। এই শালা মুন্ডুগুলো বানাতে এত সময় চলে যাচ্ছে যে লেখাপড়া করার সময়ই পাচ্ছি না।

ঝিল্লি বলল, তা হলে বানাস কেন?

বিক্রম বলল, এজন্য ওরা আমাকে খেতে দেয়। এগুলো আমি ভালো বানাতে পারি। গোটা ফিগার বানাবার অনেক ঝঞ্ঝাট, আমি শুধু মুন্ডু এক্সপার্ট। দেখবি যখন চোখ আঁকব, কী রকম খোলতাই হবে।

এর থেকে টিউশনি ভালো ছিল না?

উঞ্ছবৃত্তি! এ-কাজের সুবিধে বাড়ি থেকে বেরুতে হয় না। ছোটবেলায় শিখেছিলাম। তুই বাদাম খাওয়ালি মাইরি, এরপর চা না খেলে চলে? ওই জানলার দিয়ে রসকে রসকে বলে চেঁচা তো!

তুই ডাক।

বিক্রম বিকট গলায় সেইভাবে কারওকে আহ্বান জানাল।

তারপর ঝিল্লির কোমর দু'হাতে ধরে তার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলল, তুই আমার স্বপ্ন, না মায়া? না মতিভ্রম? যাবজ্জীবনের পুণ্যফলটা আর বলতে পারছি না। এই তো এই ক'টা বছরের জীবন, তার আবার পুণ্য! তুই কে?

ঝিল্লি বলল, আমি তোর মতিভ্রম।

বিক্রম বলল, বোস চেয়ারে। তোর পেশেন্টের খবর কী?

খুব উৎসাহের সঙ্গে ঝিল্লি বলল, খুব ভালো। সারপ্রাইজিং ইমপ্রুভমেন্ট। মাঝখানে তো কথা বলার ক্ষমতাই চলে গিয়েছিল, শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতেন। এখন গড়গড় করে কথা বলছেন। পুরনো সব কথা অবশ্য এখনও মনে করতে পারেন না।

আমি ওঁর সম্পর্কে আরও কিছু মেটেরিয়াল জোগাড় করেছি। যেমন, তুই কি জানিস, উনি কীভাবে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন?

না, কেউই জানে না। গলায় দড়িটড়ি দেননি। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। টিটো লোক ডেকে দরজা ভাঙে। কিছু বিষটিস খেয়েছিলেন বোধহয়।

কোনও সুইসাইড নোট ছিল?

না।

দিস ইজ আ মিস্ট্রি। শিক্ষিত ভদ্রলোকরা স্বেচ্ছায় মরতে চাইলে অন্যদের না জড়িয়ে কিছু একটা লিখেটিখে যান। নার্সিংহোমে উৎপল চ্যাটার্জি নামে একজন ডাক্তার ওঁর চিকিৎসা করেছিলেন। উনি আমার বন্ধু বিনায়কের জামাইবাবু। উৎপল চ্যাটার্জির সল্টলেকের বাড়িতে গিয়ে আমি ওঁর ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম। প্রথমে তো উনি কিছুই বলতে চাননি। ওঁদের প্রফেশনাল এথিক্‌সে বাধে। আমি অনেক করে বললাম, আমি একটা পিরিয়ড নিয়ে রিসার্চ করছি। সেখানে হেমকান্তি লাহিড়ী একজন ইমপর্ট্যান্ট ক্যারেক্টার। ইতিহাসের জন্যই এটা জানা দরকার। ওঁর নাম কোথাও থাকবে না, এই প্রমিজ করতে উনি শেষ পর্যন্ত মুখ খুললেন। তাতেও ঠিক মিস্ট্রি সল্‌ভড হয়নি। বিষ নয়, উনি খেয়েছিলেন ঘুমের ওষুধ। ডক্টর চ্যাটার্জির মতে, নব্বই থেকে একশোটা ভ্যালিয়াম ফাইভ। অতগুলো ট্যাবলেট কেউ একসঙ্গে খেতে পারে? জোগাড় করলেনই বা কী করে? এমন হতে পারে, ট্যাবলেটগুলো গুঁড়ো করা হয়েছিল, জলে গুলে খাওয়ানো হয়েছে। কেউ ওঁকে মারতে চেয়েছিল। কে হতে পারে?

ওই মানুষটার কোনও শত্রু থাকতে পারে বলে তো মনে হয় না।

আছে, আছে। আদর্শবাদের লড়াই, তার থেকে শত্রুতা। ওঁরা যে ধরনের পলিটিক্সে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তা ছড়িয়ে যায় অনেক কানাগলিতে। সেখান থেকে বেরুবার পথ না পেয়ে, সঙ্ঘবদ্ধতাই নষ্ট হয়ে যায়, ছোট ছোট ফ্যাক্‌শন, তারা পরস্পরের ঘোর শত্রু হয়ে ওঠে।

আমি এসব বুঝি না বিক্রম। অতগুলো ট্যাবলেটের গুঁড়ো জলে গুললে তাও তো অনেকখানি, কেউ কি জোর করে খাওয়াতে পারে? তা ছাড়া, ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল।

আরও কিছুদিন ওয়েট করা যাক। যদি হেমকান্তি নিজেই আসল ঘটনা মনে করতে পারেন। আরে, এখনও চা দিল না?

বিক্রম আবার উঠে চিৎকার করার আগেই দরজা ঠেলে ঢুকল একটা বাচ্চা ছেলে। ইজের পরা, খালি গা। দুটো সরু লম্বা গেলাসে লাল রঙের চা।

গেলাস দুটো রেখে হাত বাড়িয়ে সে বলল, পয়হা?

বিক্রম বলল, যা ভাগ! লিখে রাখতে বল।

ছেলেটি তবু দাঁড়িয়ে রইল। তার নাভিটা একটা পুঁটুলির মতন বাইরে বেরিয়ে আছে।

ঝিল্লি ব্যাগ খুলে তাকে দিল পাঁচটা টাকা।

বিক্রম বলল, ওকে এত পয়সা দিলি? ও কী করবে জানিস তো? এক্ষুনি বাকি পয়সায় হজমিগুলি খাবে। পেট ভরে খেতে পায় না, তার ওপর হজমিগুলি! নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে যাবে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বিক্রম বলল, আর একটা গাঁট হচ্ছে বরুণ ঘোষ দস্তিদারের মার্ডার। একটা গ্রুপ সেটা নিয়ে কেন এখনও লেগে আছে বুঝি না! সেটা তো সলভ্‌ড হয়ে গেছে। যে খুন করেছে, সে ধরাও পড়ে এখন জেল খাটছে। তবু শুধু শুধু হেমকান্তি লাহিড়ীকে নিয়ে টানাটানি কেন?

কে খুন করেছে?

নিরঞ্জন মাহাতো। ডেঞ্জারাস লোক, আরও দুটো মার্ডার চার্জ আছে ওর নামে, তাদের মধ্যে একজন পুলিশের এস.আই। পরপর তিনটে গুলি চালিয়েছিল নিরঞ্জন। দুটো বরুণ ঘোষ দস্তিদারকে ফুঁড়ে দেয়, আর আর একটা লাগে হেমকান্তিবাবুর পায়ে।

তুই একবার বলেছিলি, হেমকান্তি ছিলেন না বরুণ ঘোষ দস্তিদারের সঙ্গে। ওঁর জ্বর হয়েছিল বলে পুরুলিয়া সার্কিট হাউসে থেকে গিয়েছিলেন?

সেটা ভুল হয়েছিল। আমি পরে চেস করেছি। আসলে ওঁরা ছিলেন তিনজন। আর একজনের নাম অরিজিৎ সেনগুপ্ত। তাঁরই জ্বর হয়েছিল, তিনি বান্দোয়ান যাননি, পুরুলিয়ায় থেকে গিয়েছিলেন।

তৃতীয় জনের কথা এই প্রথম শুনলাম। বোসদা বলছিলেন এই দু'জনের কথা। আমাদের স্যারের তো কিছুই মনে নেই।

সে বেচারির কিছু দোষ নেই, আর এরা চাপ দিচ্ছে। বোসদা মানে উমাপতি বোস তো? গভীর জলের মাছ। আমি ওর সম্পর্কেও খোঁজখবর নিচ্ছি। যদি আর কিছুদিন জেলের বাইরে থাকতে পারি, তা হলে আমাদের এই আগের জেনারেশন সম্পর্কে অনেকখানি ডকুমেন্ট তৈরি করে ফেলতে পারব।

তোকে জেলে যেতে হবেই? পুলিশ তোর খোঁজ জানে?

লম্বা রোগা হাতখানা বাড়িয়ে ঝিল্লির গাল ছুঁয়ে বিক্রম বলল, মাই ডিয়ার,

জেলে যাওয়া আমাদের নিয়তি। কিছুদিন অন্তত জেলের কাঁকরমণি চালের ভাত না খেয়ে এলে দেশের কাজ করা যায় না। তবে খুব সম্ভবত পুলিশ এখনও আমাকে স্পট করেনি। আমি কাগজপত্রে লেখালেখি একেবারে বন্ধ করে দিয়েছি।

তা হলে আমিও তোর সঙ্গে জেলে যাব।

যেতে পারিস। তার আগে একটা-দুটো অ্যাকশনে যেতে হবে। তুই ও-বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারবি?

এনি ডে।

বেশ, আগে ট্রেনিং নিতে হবে কিন্তু। সময় হলে বলব। ওই বরুণ ঘোষ দস্তিদারের কেসটা স্টাডি করে আমার এখনও একটা খটকা যায়নি। বরুণদা শট ডেড। হেমকান্তি লাহিড়ী অনেকদিন পর কলকাতায় ফিরে এসেছে, স্মৃতি হারিয়ে একটা প্যাথেটিক কেস, কিন্তু থার্ড পার্সন, ওই অরিজিৎ সেনগুপ্ত কোথায় গেল? তার কোনও ট্রেস নেই। কোনও গ্রুপেই তার নাম শুনি না। আমি অসীম চ্যাটার্জিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, উনিও কিছু জানেন না। লোকটা একেবারে ডিসাপিয়ার করে গেল? এমনও হতে পারে, ভদ্রলোক নাম ভাঁড়িয়ে, চেহারা বদলে কোনও সংসারে ঢুকে পড়ে বাচ্চাদের আদর করছে। কিন্তু কেন? এখন তো কারও নামেই কোনও কেস নেই। গণতন্ত্রের নামাবলী গায়ে দিয়ে যা-খুশি করতে পারে! গণতন্ত্র! যে গণতন্ত্র গ্রামের গরিবদের খেতে দিতে পারে না, বরং পুলিশ লেলিয়ে দেয়, তার পেছনে আমি ইয়ে...

বিক্রম, তুই এখন এখানেই থাকবি?

তা ছাড়া আর কোথায় যাব? এখানে তো বেশ আছি। খাওয়াদাওয়া ভালোই দেয়। শুধু যা ঝাল দেয় মাছের ঝোলে, ওফ্! এরা তো সব বাঙাল! আমার এই ঘরখানা তোর ভাল লাগে না?

চমৎকার। মনে হয় যেন এক রাজপুত্র আত্মগোপন করে আছে।

রাজপুত্র? অ্যাঃ! দেখলি না নেপালের এক রাজপুত্তুরের কী দশা হল? আর ইংল্যান্ডের ওই ঘোড়ামুখো রাজপুত্তুরটা, হা-হা-হা, বুড়ো থুরথুরে হয়ে যাবে, তবু সিংহাসন পাবে না। ওর মা-টা সেঞ্চুরি করবে। আমি আমার নিরুদ্দিষ্ট বাবার ছেলে। আমিও একদিন নিরুদ্দেশের রাজ্যে ঝাঁপ দেব।

তোর মা কোথায়?

মা আছে। মা আর দিদি একসঙ্গে থাকে। মোটামুটি দু'বেলা খেতে পায়।

আমি তোর মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করতে যাব।

শোন, আমার আর একটা প্রশ্ন আছে। হেমকান্তি লাহিড়ী যেদিন আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন, তার কতদিন আগে উনি বাড়ি ফিরে এসেছিলেন?

মাস দেড়েক হবে।

সেই সময়টা উনি কী করতেন?

কিছু না। অধিকাংশ সময়েই শুয়ে থাকতেন। কারও সঙ্গে বিশেষ কথা বলতেন না। আমার সঙ্গেও তখন ভাব হয়নি।

বাইরে বেরুতেন না?

প্রায় না-ই বলতে গেলে।

কেউ দেখা করতে আসত না?

আমি তো অন্তত দেখিনি।

আমার একটা সন্দেহ, উনি তখনই গভীর ডিপ্রেশনে ভুগছিলেন। একটা কিছু সাঙ্ঘাতিক ট্রমা হয়েছিল। তখন থেকেই ওঁর স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যায়নি তো? এরকম হতে পারে। ডাক্তার উৎপল চ্যাটার্জিও সেইরকম একটা হিন্ট দিয়েছেন।

এটা তো আমি কিছু বলতে পারব না।

ওঁর স্মৃতিশক্তি আরও খানিকটা ইমপ্রুভ যদি করে, আমি তা হলে ওঁর সঙ্গে একদিন দেখা করতে যাব। ওঁর একটা ইন্টারভিউ নেব। উনি হয়তো আমার বাবার সম্পর্কে কিছু ইনফর্মেশন দিতে পারেন। যদি তা না-ও পারেন, আমি ওঁর সম্পর্কেই এমন দু'-একটা তথ্য জানাব, যা ওঁর মনে থাকার কথা নয়।

তারপরই চমকে উঠে সে বলল, এই কী করছিস, এখনও বসে আছিস? যা বাড়ি যা।

ঝিল্লি বলল, যাচ্ছি, যাচ্ছি।

ধমক দিয়ে বিক্রম বলল, যাচ্ছি কী। এই রাস্তাটায় আলো জ্বলে না। অন্ধকারের মধ্যে খপাত করে কেউ যদি তোকে তুলে নিয়ে যায়?

ঝিল্লি হেসে বলল, সেইজন্যই তো তুই আমার সঙ্গে যাবি, আমাকে মোড় পর্যন্ত পৌঁছে দিবি।

আহা, মাইরি আর কী। এই মুন্ডুগুলো কে শেষ করবে? অর্ডারি মাল। তিন দিন পর বিশ্বকর্মা পুজো। আমি চোখ এঁকে দিলে ওরা মুন্ডুগুলো ধড়ের ওপর বসাবে। মাথায় চুল পরাবে। অনেক কাজ বাকি। যা, যা, ফোট!

অত সহজে আমি মোটেই ফুটছি না। আর একবার চা খাব।

নো চান্স। প্লিজ, এখন কেটে পড়। আমায় কাজ করতে দে।

দু'হাত দিয়ে সে জোর করে চেয়ার থেকে দাঁড় করাল ঝিল্লিকে। দুই করতলে চেপে ধরল তার দুই স্তন। সেখানে ঝনঝন শব্দ হল।

সে বলল, আর একটি মাত্র চুমুর সময় আছে।

চুম্বনটি সমাপ্ত করে বিক্রম জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁরে ঝিলিমিলি, তখন বললি, তুই আমার মতিভ্রম। হয়তো তাই। তোর জন্য মাঝে মাঝে আমি বিপ্লব টিপ্লবের কথা ভুলে যাই। এবার বল তো, আমি তোর কে?

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে ঝিল্লি বলল, তুই আমার ধ্রুবতারা।

ইস। খুব রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কথা বলতে শেখা হয়েছে। তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। নট অরিজিন্যাল। বর্ষাকালে ধ্রুবতারা দেখা যায় না। এই কাজগুলো শেষ করেই আমি একবার বান্দোয়ান যাব। তোর সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে শরৎকালে।

ঝিল্লি বলল, মোটেই না। তুই যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা না করে যেতে পারবি না।

বিক্রম বলল, ও কে! নাও, বিফোর ইউ গো, টাচ্ মি।

লজ্জারুণ হয়ে গেল ঝিল্লির মুখখানি। সে বলল, না।

বিক্রম আবার আদেশের সুরে বলল, টাচ্ মি।

বিক্রমের বুকে একটা চাপড় মেরে ঝিল্লি বলল, এই তো টাচ্ করলাম।

বিক্রম ধমক দিল, কী হচ্ছে ছেলেমানুষি! টাচ্ মি।

এবারে একটা হাত নামিয়ে দিল ঝিল্লি। বিক্রমের উরুর কাছে চেপে ধরল তার পুরুষাঙ্গ। রোগা টিংটিঙে সেই যুবকের ওই অঙ্গটি বেশ স্বাস্থ্যবান এবং লৌহদণ্ডের মতন কঠিন।

একটুক্ষণ ধরে থেকেই ছেড়ে দিল ঝিল্লি।

বিক্রম বলল, এবার বুঝতে পারলি, আমি এক হাজার বছর ধরে তোর জন্য প্রতীক্ষা করে আছি?

ঝিল্লি বলল, এটাও তো বনলতা সেন। নট অরিজিন্যাল।

দু'জনে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

তেরো

যেমন লম্বা, তেমনই চওড়া বারান্দা, কাস্ট আয়রনের রেলিং। ঠিক মাঝখানে একটা দোলনা। একেবারে পাশেই গঙ্গা। এ-বাড়ির একটা নিজস্ব ঘাটও আছে। বাড়িটি স্বাধীনতার অনেক আগে নির্মিত, তখন এই অঞ্চলের নাম ছিল ফরাসডাঙা। এ-বাড়ির কিছুটা ঐতিহাসিক স্মৃতিও আছে, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কয়েকজন বিপ্লবী এখানে কিছুদিনের জন্য গোপনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল প্রমুখ, তবে ঠিক কত জন এবং কত দিনের জন্য, তার কোনও রেকর্ড নেই। লোকশ্রুতিই সম্বল, যা ক্রমশ ফিকে হয়ে এসেছে।

একতলায় অনেকগুলি ঘর, অন্ধকার-অন্ধকার, মানুষজনের লুকিয়ে থাকারই মতন, দোতলার ঘর-বারান্দা অতিরিক্ত আলোকোজ্জ্বল। পটভূমিকায় এত বড় একটা নদী। এই বর্ষায় চমৎকার স্বাস্থ্যবতী।

রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছেন হেমকান্তি। অনেক দিন পর তিনি প্যান্ট-শার্ট, বেল্ট, জুতো-মোজা পরেছেন। চুল ছেঁটেছেন দু'দিন আগে। আসবার পথে জয়ী তাঁকে একটি সানগ্লাস পরিয়ে দিয়েছিল, হেমকান্তি সেটা খুলে ফেলেছেন, তাঁর অস্বস্তি লাগছিল। সুসজ্জিত, সানগ্লাস পরা হেমকান্তিকে মনে হচ্ছিল সত্যিকারের সুপুরুষ।

ভেতর থেকে একটা প্লেটে কয়েকটা জামরুল নিয়ে এসে জয়ী বলল, খাও, এ-বাড়ির গাছের।

সে আজ পরে আছে জিনস্ ও মেরুন রঙের টপ।

হেমকান্তি বললেন, এক একটা জিনিস হাতে নিয়ে এখন মনে হয়, কতদিন আগে চিনতাম। জামরুল। এ তো ছেলেবেলার ফল।

জয়ী বলল, এখনকার শহুরে ছেলেমেয়েরা এসব খেতে চায় না। কোনও ফলই খায় না।

জয়ী, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। তুমি বিয়ে করোনি কেন? কোনও নীতি আছে?

জয়ী কপালে কয়েকটা ভাঁজ ফেলে বলল, না, কোনও নীতি নেই। তবে বিয়ে একটা করে ফেলেছিলাম, প্রায় বাচ্চা বয়সে, তুমি যখন বিপ্লব করতে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে, তার চার বছর পরে। দেড় বছরের বেশি টেঁকেনি।

কেন বিয়ে টেঁকেনি, তা জিজ্ঞেস করতে নেই, না?

তেমন কিছু গন্ডগোল হয়নি। স্রেফ মতের অমিল। তা ছাড়া দূরত্ব। ওর নাম ছিল জাহাঙ্গির। চাকরি নিল কানপুরে। সে-জায়গাটা আমার একেবারে পছন্দ হয়নি। চলে এলাম কলকাতায়। আর ফিরে যাইনি, ও-ও কলকাতায় আসতে চাইল না। এই আর কী! ফুলকাকা, তুমি যখন বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে, তারপর আর আমার কথা তোমার মনে পড়েনি, তাই না?

তখন মনে পড়ত কি না, তা যে এখন কিছুই মনে পড়ে না। আমি বিপ্লব করতে গিয়েছিলাম? তার মানে কী? আমি কি আর্মিতে যোগ দিয়েছিলাম?

সেসব অনেক কথা। এখন থাক। তুমি আমার সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানো না। আজ আমার বলতে ইচ্ছে করছে। আমার বিয়ে ভেঙে গেছে ষোলো বছর আগে। এখন আমার আটত্রিশ বছর বয়েস। মাঝখানে এতগুলি বছর কি আমি পুরুষবর্জিত সাত্ত্বিক জীবন যাপন করেছি? আমি সে টাইপ নই। আমি জীবনের রস এক বিন্দুও নষ্ট করতে চাই না। আমি ছোট্ট ছেলেমেয়েদের খুব পছন্দ করি। তাই শখ করে বেশ কয়েক বছর পড়িয়েছি একটা কিন্ডারগার্টেন স্কুলে। আবার প্রেমিক পুরুষদেরও সঙ্গ চাই। বৃদ্ধাশ্রমে কাজ করেও আনন্দ পেয়েছি। এর মধ্যে অন্তত দু'জন পুরুষের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছিল। একবার কনসিভও করে ফেলেছিলাম। তখন বিয়েটিয়ের প্রশ্ন ছিল না। ভালো করে কিছু না ভেবেচিন্তেই অ্যাবোর্শন করতে রাজি হয়ে গিয়েছিলাম। দ্যাট ওয়াজ দা গ্রেটেস্ট ব্লান্ডার অফ মাই লাইফ। এত দিনে বাচ্চাটার ছ'বছর পাঁচ মাস বয়েস হত। ভাবো তো, ওই বয়েসের একটা বাচ্চা, ছেলে বা মেয়ে যাই-ই হোক, কী সুন্দর, খটখট করে হাসত, খেলত, দৌড়োত, দুষ্টুমি করত, আঃ, শেম অন মি!

হেমকান্তি গভীর বিস্ময়ে জয়ীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। যেন এ তাঁর এক অচেনা নারী। রেলিংয়ের ওপর থুতনি রেখে একটুক্ষণ নীরব রইল জয়ী। তারপর খুব মৃদু গলায় গাইতে লাগল :

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী।
তীরে বসে যায় যে বেলা, মরি গো মরি।
ফুল-ফোটানো সারা করে বসন্ত যে গেল সরে,
নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা বলো কী করি।

জল উঠেছে ছলছলিয়ে, ঢেউ উঠেছে দুলে—
মর্মরিয়ে ঝরে পাতা বিজন তরুমূলে।...

গান থামিয়ে সে বলল, ফুলকাকা, তোমার মনে আছে, তুমি একসময় খুব গাইতে। রীতিমতন হারমোনিয়াম বাজিয়ে। শুধু রবীন্দ্রসংগীত। তারপর আস্তে আস্তে যখন রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে, তখন আর রবীন্দ্রসংগীত পছন্দ করতে না। তখন শুধু সলিল চৌধুরী কিংবা উই শ্যাল ওভারকাম।

হেমকান্তি বিস্মিতভাবে বললেন, হারমোনিয়াম বাজাতাম! এখনও কি পারব?

জয়ী বলল, একদিন দেখতে হবে, আমাদের বাড়িতে হারমোনিয়াম আছে।

হঠাৎ মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে যেন মন খারাপের মেঘ সরিয়ে সহাস্যে জয়ী বলল, আমি ঠিক করেছি, এবার আবার বিয়ে করব। সিরিয়াসলি!

হেমকান্তিও উজ্জ্বল মুখে বলল, বাঃ! তুমি আসবার পথে বলছিলে, এখানে এসে একটা দারুণ খবর শোনাবে। এটাই সে খবর? নিশ্চয়ই ভালো খবর।

জয়ী বলল, এটা তো আমার ভালো খবর। তোমার সম্পর্কেও একটা দারুণ খবর আছে। সেটা বলব যথা সময়ে।

নিজের খবর সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ না করে হেমকান্তি বললেন, তুমি যে আবার বিয়ে করবে, সব ঠিক হয়ে গেছে?

জয়ী বলল, একটা জোক শুনবে? একটা পাগল একটা ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলছিল, রাজকন্যার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। রাজকন্যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে...। পাশ দিয়ে যেতে যেতে একজন মজা করে জিজ্ঞেস করল, কী রে, বিয়ে একদম ঠিক হয়ে গেছে? পাগলটি অমনি উত্তর দিল, ফিফটি পারসেন্ট ঠিকঠাক। পাত্রপক্ষ রাজি!

এরকম রসিকতা শুনে উঁচু গলায় হাসতে পারে সাধারণ বুদ্ধিমান মানুষেরা। বেরসিক বা স্মৃতিভ্রষ্টদের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

কথার মধ্যে যে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর হয়, তা অনুমান করতে এখনও বেশ দেরি হচ্ছে হেমকান্তির।

জয়ী বলল, আমার বেলায় পাত্রীপক্ষ রাজি। এখন দেখা যাক পাত্রটি কী করে? চলো, ভেতরে গিয়ে বসবে? আমরা আর একটু চা খেতে পারি।

হেমকান্তি বললেন, আমার এখানে দাঁড়িয়ে থাকতেই ভালো লাগছে। এক্ষুনি সন্ধে হবে। এখান থেকে কি সূর্যাস্ত দেখা যায়?

জয়ী বলল, না। তবে জলের রং বদলায়। মেঘলা দিনে জলের অনেক রকম রং হয়। ঠিক আছে, আমি এখানেই চা দিতে বলছি।

জয়ী সিঁড়ির কাছে গিয়ে ফিরে এল মণিকার সঙ্গে। সাদা সিল্কের শাড়ি-ব্লাউজ পরে আছে মণিকা। গলায় দু'ছড়া পাথরের মালা।

কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, ভালো লাগছে?

অন্য যে-কোনও অতিথি হলে বলত, দারুণ! কী দুর্দান্ত বাড়ি, গঙ্গার একেবারে ওপরে, ইত্যাদি। হেমকান্তি শুধু বললেন, হ্যাঁ।

একজন পরিচারিকা নিয়ে এল চায়ের সরঞ্জাম। সঙ্গে একটা ফ্রুট কেক।

বারান্দার অন্য প্রান্ত থেকে আনা হল একটি ছোট গোল টেবিল, কয়েকটি গার্ডেন চেয়ার। মণিকা নিজে কেক কেটে প্লেটে সাজিয়ে দিতে দিতে বলল, রাত্তিরটা থাকছেন তো?

হেমকান্তি তাকালেন জয়ীর দিকে।

জয়ী বলল, হ্যাঁ, থাকব তো। চেঞ্জ নিয়ে এসেছি।

মণিকা বলল, দু'-চারদিন থেকে যান। এখন ওয়েদারটা ভালো। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে। ইলিশমাছ ভালোবাসেন তো? টাটকা ইলিশ খাওয়াব।

জয়ী বলল, এত সুন্দর বাড়ি প্রমোটারের হাতে চলে যাচ্ছে, ভাঙার আগে কয়েকটা দিন ভোগ করে নিই।

মণিকা বলল, কী করব, একেবারে দেবার ইচ্ছে ছিল না। এত জ্বালাচ্ছে। অবশ্য মেনটেনান্স কস্টও এত বেশি। পুরো ছাদটা রিপেয়ার করা দরকার।

ফ্ল্যাটবাড়ি বানাবে? তোকে ক'টা দেবে?

না, ফ্ল্যাটবাড়ি না। টুরিস্ট লজ। তার একটা উইং আমার থাকবে, তোকে প্ল্যানটা দেখাব, একেবারে পাকাপাকি...

হেমকান্তি আস্তে আস্তে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। তাঁর এইসব কথা একেবারে পছন্দ হচ্ছে না। স্মল টক। আসন্ন সন্ধ্যায় আকাশের যে বর্ণচ্ছটা, হিমালয়ের চূড়া থেকে নেমে আসছে এই নদী। হেমকান্তি কবি নন, কবি না হলেও কি এসবের পটভূমিকায় মানুষ কিছুক্ষণের জন্যও অন্যমনস্ক হতে পারে না? এই দুই নারী এত কাজের কথা বলছে কেন?

মণিকা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে একবার শ্রীরামপুরে যেতে হবে রে। আমার মাসশাশুড়ি খুব অসুস্থ। একবার দেখে আসব। গাড়িতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

জয়ী বলল, তাড়াতাড়ি আসিস। রাত্তিরে একসঙ্গে গল্প করব।

মণিকা বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বড়জোর দু'ঘণ্টা। তোরা... যা লাগবে চেয়ে নিস। ড্রিঙ্কসেরও ব্যবস্থা আছে, যদি চাস!

তারপর সে জয়ীর দিকে ছোট্ট করে এক চোখ টিপে দিল।

মণিকা চলে যাবার পর জয়ী হেমকান্তিকে বলল, সিন্দবাদ, তুমি দোলনায় বসবে?

হেমকান্তি বললেন, সিন্দবাদ?

জয়ী বলল, ভুলে যাওনি তো? আজ আর তুমি আমার ফুলকাকা নও। তুমি সিন্দবাদ, আমি তাহেরে সফরজাদে। সেই তোপচাঁচিতে আমি বসেছিলাম দোলনায়, তুমি আমাকে দুলিয়ে দিয়েছিলে। আজ আমি তোমাকে দোলাব।

হেমকান্তি বললেন :

মনে আছে, কবে কোন ফুল্ল যূথীবনে,
বহু বাল্যকালে, দেখা হত দুইজনে
আধো চেনা-শোনা? তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরায় অস্থির
এক বালকের সাথে কী খেলা খেলতে...

জয়ী বলল, থামলে কেন, আরও বলো।

হেমকান্তি বললেন, আর মনে পড়ছে না।

জয়ী বলল, আজ তোমার বেশ কবিতা মনে আসছে। অনেক কবিতা তোমার মুখস্থ আছে।

হেমকান্তি বললেন, আমার নিজেরই অবাক লাগছে। এইসব কবিতা যে আমার মনে আছে, তাই-ই মনে ছিল না। কবেকার মুখস্থ।

জয়ী বলল, খুব ভালো। কবিতা, গান, এগুলো স্মৃতিকে চাঙ্গা করার জন্য খুব কাজে লাগে। এবার একটা গান করো।

হেমকান্তি বললেন, নিজে থেকে মনে না এলে তো এখনও সবটাই শূন্য।

আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি। তুমি এই গানটা খুব ভালো গাইতে, আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি। ছেলেবেলায় আমাদের ভবানীপুরের বাড়িটা তো আর এখনকার মতন এত ফাঁকা ছিল না। এক দঙ্গল মেয়ে। তাদের আড্ডার

মাঝখানে তুমি হিরোর মতন গাইতে গাইতে ঢুকতে, আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি! মনে নেই?

না।

আমি প্রথম লাইনটার সুর গেয়ে শোনাচ্ছি।... তাও মনে পড়ছে না?

না।

অবশ্য এই গানটার শুধু প্রথম লাইনটাই ভালো। তারপর কেমন যেন ন্যাকা ন্যাকা। ঠিক আছে, আর একটা গান।

জয়ী, গঙ্গার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি ভাবছিলাম, আমার জীবনটা কত ছোট হয়ে গেছে। আমার মায়ের মুখ মাঝে মাঝে মনে পড়ে, তাও এক ঝলকের মতন, কিন্তু বাবার মুখ মনে করতে পারছি না। মেজদার ঘরে বাবার একটা ছবি দেখেও চেনা লাগল না। বাকি পুরো বাল্যকালটা মুছে গেছে। কলেজ জীবন, কীসের কী বিপ্লব, এসব কিছুই স্মৃতিতে নেই। আর ফিরে পাব কি না জানি না। এখন শুধু কাছাকাছি দু'-চারজন মানুষ, কিছু কবিতার লাইন, হঠাৎ হঠাৎ একটা-আধটা গান, আর কিছু নেই! এত ছোট, এ কী ইনসিগ্‌নিফিকেন্ট জীবন!

জয়ী ওঁকে ধরে ধরে নিয়ে এসে দোলনাটার ওপর বসিয়ে দিল। নিজেও বসল পাশে।

তারপর খুব স্নেহের সঙ্গে তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, ফিরে পাবে, সবই ফিরে পাবে, তোমার যেরকম ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে... সবচেয়ে ভালো ব্যাপার, তুমি ভাষা পেয়ে গেছ, একটুও ইনকোহেরেন্ট নয়। তবে কী জানো, পুরনো সব জিনিস মনে রেখেই বা কী হবে? মানুষ তো অনেক স্মৃতি মুছে ফেলতে চায়। পারে না। সেদিক থেকে তুমি ভাগ্যবানই বলতে পারো। এখন থেকে নতুন জীবন শুরু করবে।

হেমকান্তি বললেন, এইসব তুমি আমাকে কত যত্ন করে বোঝাও। তুমি আমাকে এত সাহায্য করছ, সেবা করছ, এত সময় দিচ্ছ আমার জন্য। কেন? তোমার নিজের জীবন আছে, বন্ধুটন্ধু আছে নিশ্চয়ই, তুমি একজনকে বিয়ে করতে চলেছ, তবু আমার কাছে কেন এতক্ষণ, আমি বুঝতে পারি না।

জয়ী বলল, বুঝতে পারো না বোকারাম! তার কারণ, আমি তোমাকে ভালোবাসি। নিছক সেবাটেবা নয়...

অতীব বিস্ময়ের সঙ্গে হেমকান্তি পাশ ফিরে জয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে

থেকে বললেন, ভালোবাসা! তুমি যে বললে, তুমি একজনকে বিয়ে করতে চলেছ।

জয়ী হেসে বলল, হ্যাঁ, আমার বিয়ে করার ইচ্ছে হয়েছে, ঠিকই। কিন্তু একজনকে বিয়ে করলেও কি অন্য একজনকে ভালোবাসা যায় না? মানুষের মনটা কি এতই ছোট্ট জায়গা যে সেখানে একজনের বেশি কারও স্থান হয় না?

মাথা নাড়তে নাড়তে হেমকান্তি বললেন, কী জানি, জানি না। জানি না।

কিছু একটা রহস্য চিকমিক করছে জয়ীর চোখে, ঠোঁটে ঠোঁট টেপা হাসি। সে বলল, এমনকী বিবাহিত পুরুষ কিংবা মেয়ে, দু'-একবার অন্য একজনের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করলেও কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? মহাভারত বইখানাই তো এরকম অশুদ্ধতায় ভরা! তোমার মহাভারত মনে আছে?

হেমকান্তি বললেন, তুমি সেদিন দ্রৌপদীর কথা বললে। যাজ্ঞসেনী। তাই একটু একটু মনে পড়েছে। আবার মহাভারত পড়ে দেখতে হবে।

জয়ী বলল, হ্যাঁ, অনেক বই তোমাকে নতুন করে পড়তে হবে। সবসময় পড়াশুনো করলে অ্যালঝাইমারস হয় না। থাক এখন ওসব কথা।

এর মধ্যে চারদিক ছেয়ে গেছে অন্ধকারে। বারান্দার আলো জ্বালা হয়নি।

দোলনা থেকে নেমে সে হেমকান্তির মুখোমুখি দাঁড়াল।

তাঁর কাঁধে দু'হাত রেখে গাঢ় স্বরে জয়ী বলল, সিন্দবাদ, আজ আমি তোমায় আদর করব।

দু'জনে চোখাচোখি করে রইল বেশ কয়েক মুহূর্ত।

জয়ী বলল, অল্প বয়েসে গোপনে অন্যায় করতে ভালো লাগে। তোপচাঁচিতে সেই প্রথম চুমু খাওয়ার পর তুমি প্রায়ই লুকিয়ে-চুরিয়ে আমাকে আদর করতে, আমি তোমার ভাইঝি, ওসব করতে নেই, তা জেনেও। জোর করোনি কিন্তু, আমি নিজেও সুযোগ খুঁজতাম, অন্যদের চোখ ফাঁকি দিয়ে...। তারপর এতগুলো বছর কেটে গেল, কোথায় চলে গেলে তুমি, আর এখন, তোমার অনেকটা স্মৃতি নষ্ট হয়ে গেছে, তবু এখনই কি তোমার মধ্যে সামাজিক নিয়ম গেঁথে গেছে? তুমি তো একবারও আমাকে চুমু খাবার চেষ্টা করোনি। কিংবা, আমাকে আর তোমার পছন্দ হয় না?

হেমকান্তি কোনও উত্তর দিলেন না।

জয়ী আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল, আমি আজ তোমায় আদর করবই। তোমাকে সিডিউস করব। এমনকী রেপও করতে পারি।

হেমকান্তি এবার বিষণ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, সেটাও কি আমার চিকিৎসার অঙ্গ?

জয়ী বলল, ধুত, তোমার জন্য কিছু না, সবটাই আমার জন্য। সিন্দবাদ, তুমি আমার জীবনের প্রাণপুরুষ, তোমার কতরকম গুণ, মনে মনে তোমাকে পুজো করতাম, তবে আমরা শেষ পর্যন্ত যাইনি কখনও। তারপর তুমি চলে গেলে, অন্য যেসব পুরুষদের সঙ্গে সম্পর্ক হল, মনে মনে সবসময় তোমার সঙ্গে তাদের তুলনা করতাম, কেউ না, কেউ তোমার ধারে-কাছে আসে না। তাই আজ আমি তোমাকে চাই।

মেরুন রঙের টপটা খুলে ফেলল জয়ী, খুলে ফেলল ব্রা। একটা স্তন হেমকান্তির ঠোঁটে চেপে দিয়ে বলল, সেদিন তুমি বলেছিলে, আবার। আজ নাও, যত ইচ্ছে।

হেমকান্তির ওষ্ঠে জয়ীর সেই স্তন যেন আগুনের ব্রহ্মকমল ফুল।

তাঁর হাত দুটি জয়ীর কোমর বেষ্টন করল। একটু পরে তাঁর মুখ গেল অন্য স্তনে, একটা হাত স্বাভাবিকভাবেই যেতে চাইল জয়ীর জিনসের মধ্যে।

আগে নিজের জিনস্‌টা খুলে ফেলে তারপর জয়ী একটা একটা করে খুলতে লাগল হেমকান্তির জামার বোতাম। তারপর প্যান্টের বেল্ট।

এর পরের যে অনন্তকাল, তা সীমাবদ্ধ হয় চল্লিশ মিনিটে। তাঁর মধ্যে পৃথিবী ও সমাজসংসার হারিয়ে যায়, আবার ফিরে আসে একটু একটু করে।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে জয়ী একটা সিগারেট ধরাল।

হেমকান্তি মেঝেতেই শুয়ে আছেন চিত হয়ে। জয়ী তাঁর পাশে বসে বলল, একটা টান দেবে?

হেমকান্তি কয়েকবার টান দিলেন। কাশি হল না।

জয়ী বলল, এইবার তোমার সঙ্গে আমার আসল কথা হবে। তোমাকে যে বলেছিলাম, একটা খুবই দারুণ খবর, সেটা ইচ্ছে করেই আগে বলিনি।

হেমকান্তি বললেন, তুমি কী সুন্দর জয়ী। তোমার শরীরে এত তাপ!

জয়ী বলল, তোমারও তো খুব তাপ এসেছিল, নইলে এত মজা হত না। শোনো, যে-কথাটা বলব, সেটা তোমার কাছে খুব শকিং মনে হতে পারে। এই স্টেজে তোমাকে তা বলা উচিত কি না, সে সম্পর্কে আমি দু'জন ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করেছি। দু'জনে একই অ্যাডভাইস দিয়েছেন। আজকালকার চিকিৎসায় কোনও কিছুই গোপন করার দরকার নেই। যতই শকিং হোক, ট্রুথ

মাস্ট বি টোলড। সেটা সহ্য করার ওপরেই তোমার মনের শক্তি নির্ভর করছে। সেই ট্রুথ হচ্ছে, তুমি আমার কাকা নও।

কী?

তুমি আমার কাকা নও।

এটা তুমি কী বলছ?

ঠিকই বলছি, তোমার সঙ্গে আমার কোনও পারিবারিক রক্তের সম্পর্ক নেই। তুমি আমার সিন্দবাদ।

আমি তোমার বাবার ভাই।

না।

না মানে?

সবাই যাঁকে তোমার বাবা বলে জানে, তিনি তোমার বাবা নন। আই মিন, লিগ্যালি তোমার বাবা ঠিকই, কিন্তু তিনি তোমার বায়োলজিকাল ফাদার নন। আমাদের দাদু, যাঁকে তুমি বাবা বলে জেনেছ, সেই সূর্যশেখর লাহিড়ীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তোমার মা।

দ্বিতীয় পক্ষ? তার মানে আর একজন বউ?

হ্যাঁ, একসঙ্গে নয় অবশ্য। আগের বউ মারা যাবার পর তিনি আবার বিয়ে করেন। তোমার অন্য ভাইগুলো সেই আগের স্ত্রীর ছেলে।

তা হলেও আমাদের বাবা তো একই, তাই না?

না। বললাম তো। তোমার মাকে যখন সূর্যশেখর বিয়ে করেন, তখন অলরেডি তাঁর একটি ছেলে ছিল, ঠিক দু'বছর চার মাস বয়েস। সেই ছেলেটিই তুমি! তোমার মায়েরও সেটা দ্বিতীয় বিয়ে।

দু'বছর চার মাস?

শোনো সিন্দবাদ, এসব কথা আমি জেনেছি আমার মায়ের কাছ থেকে। মা তোমায় পছন্দ করেন। আমি অনেকবার মাকে জিজ্ঞেস করেছি, আমার বাবা, বাড়ির মেজবাবু তার ছোট ভাইটিকে এত অপছন্দ করে কেন? শুধু বিষয়-সম্পত্তির জন্য? মা এতদিন কিছু বলতে চায়নি। এই বুধবার সব খুলে বলেছে। বাবা ছোটবেলা থেকেই এরকম, তোমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না, সুযোগ পেলেই তোমাকে মারত। কারণ, তুমি তো একটা বাইরের ছেলে। এ-বাড়িতে এসে খুব আদর পেতে শুরু করলে, সেইজন্যই তার হিংসে হত। মেজবাবুরও সেই একই ব্যাপার। শুধু তোমার বড়দাদা,

আমাদের সোনাজেঠু তোমাকে ভালোবাসতেন, প্রটেকশন দিতেন।

দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমার মা এত সব জানলেন কী করে? তিনি তো এসেছেন অনেক পরে।

হ্যাঁ, কিন্তু মা এসব শুনেছেন তাঁর শাশুড়ি অর্থাৎ তোমার মায়ের কাছ থেকে। তিনি মাকে খুব ভালোবাসতেন। অন্য বউরা ওঁকে তেমন পছন্দ করতেন না। মা তো বলেন, তোমার মা অপরাজিতা ছিলেন দারুণ সুন্দরী, চাঁপাফুলের মতন গায়ের রং, স্বভাবটিও খুব মিষ্টি, লেখাপড়া জানতেন।

সেইজন্যই কি আমি মাঝে মাঝে আমার মাকে দেখতে পাই, একটা বাগানে বসে আছেন। এ-বাড়িতে তো বাগান নেই। সেটা অন্য বাড়ি।

দু'বছর চার মাস বয়েসের আগেকার স্মৃতি? হতেও পারে।

জয়ী, তা হলে আমার বাবা কে ছিলেন?

শোনো, তোমার মা ডিভোর্সি ছিলেন, না বিধবা ছিলেন, তা আমার মায়েরও মনে নেই। তোমার বাবার কথা জানার বোধহয় কোনও উপায় নেই এখন। আগেকার জেনারেশনের কেউ তো বেঁচে নেই আর।

উঠে বসে হা-হা করে বেশ জোরে হাসতে লাগলেন হেমকান্তি।

তাঁর এরকম প্রতিক্রিয়ায় জয়ী একটু বিচলিত বোধ করল।

হেমকান্তি হাসতে হাসতেই বললেন, বেশ ভালো কথা শোনালে জয়ী। সারাটা জীবনে কোনও অন্যায় না ভালো কাজ করেছি তা জানি না। স্মৃতির সম্বল অতি সামান্য। তবু একজন মা ছিল, আর ছবির ফ্রেমে বাঁধানো একজন বাবা। এখন সেই বাবাকেও তুমি কেড়ে নিলে। সে জায়গাটাও শূন্য! ভাইরাও কেউ ভাই নয়!

দ্বিতীয় পক্ষে তোমার মায়ের একটি মাত্র মেয়ে হয়েছিল। সে-ই তোমার বোন, টিটোর মা। তাকে তুমি খুব ভালোবাসতে, তার বিয়ের সময় কেঁদেছিলে।

সে কোথায়?

টিটো তোমায় বলেনি? বুলিপিসি জলে ডুবে মারা যায়। বেশি বয়েস নয় তখন।

এসব জেনে আমার কী লাভ হল বলো তো জয়ী? আর শুনতে ভালো লাগছে না। তুমি বরং আমার পাশে একটু শুয়ে থাকো। এসো, আমরা অন্য কথা বলি।

জয়ী শুয়ে পড়ে বলল, এখন আমার কী রকম লাগছে জানো তো? আমি যেন রক্তকরবীর রাজাকে দেখে ফেলেছি।

হেমকান্তি বললেন, রক্তকরবীর রাজা... আমি নই নিশ্চয়ই।

জয়ী বলল, উপমাটা ঠিক সেভাবে নয়। অনেকদিন ধরে যাকে দেখতে চেয়েছি, অথচ যে ছিল আড়ালে, এবার দেখতে পেলাম তাকে। তোমার সঙ্গে যেন এই প্রথম আমার ঠিক চেনা হল।

হেমকান্তি বললেন, বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। ইচ্ছে করছে বৃষ্টিতে ভিজি।

জয়ী বলল, তোমার সঙ্গে আমি জঙ্গলে কোথাও বেড়াতে যাব। সেখানে ভিজব। এখানে... যদি আমরা বাগানে এখন যাই, অমনি সাতগন্ডা কাজের লোক ছাতা নিয়ে ছুটে আসবে।

হেমকান্তি বললেন, জঙ্গলে যাব? কী জানি কবে। আজ এত ভালো লাগার মধ্যেও আমার কী মনে হচ্ছে জানো জয়ী? আমার ভবিষ্যৎ জীবনটা কীরকম হবে? যার অতীত নেই, তার আবার ভবিষ্যৎ কী?

জয়ী বলল, অতীতটা মুছে গেছে তো যাক না, যাকে বলে ক্লিন স্লেট, সেখান থেকে আবার জীবন শুরু করাই তো ভালো।

হেমকান্তি বললেন, তা কি হবে? আমি ভুলে গেলেও অন্য লোকেরা তো ভোলেনি। যদি কারও প্রতি কোনও অন্যায় করে থাকি, সে কেন মেনে নেবে?

তুমি সেরকম বড় কোনও অন্যায় করতে পারো না। তোমার চরিত্রই সেরকম নয়।

আমি এখনও বুঝতে পারছি না, আমার দুই দাদা, ছোট্টবেলা থেকেই তো একসঙ্গে মানুষ হয়েছি, আমার কি কোনও গুণই ছিল না, আমাকে কেন ওঁরা পছন্দ করতে পারেননি। এখনও খিঁচিয়ে ওঠেন।

তুমি সরল মানুষ, এখন তোমার মন আরও সরল অবস্থায় আছে, তাই তুমি এটা বুঝতে পারছ না। তোমার সঙ্গে যে রক্তের সম্পর্ক নেই, তা যে ওরা প্রথম থেকেই জানে। আমি অবশ্য রক্তের সম্পর্কটাকে কোনও গুরুত্বই দিই না। ওটা একটা কুসংস্কার মাত্র। তবে, তোমার বড় দাদা, তোমার থেকে বয়েসে অনেকটাই বড়, তিনি নাকি তোমাকে ভালোবাসতেন, অন্য ভাইদের হিংসে থেকে তোমাকে আড়াল করে রাখতেন। তিনি সে আমলে কংগ্রেসি নেতা ছিলেন, কিছুদিনের জন্য সোনাজেঠু মন্ত্রীও হয়েছিলেন। ছাত্র বয়েসে তুমি যখন কমিউনিস্ট হয়ে গেলে, তখন তিনি খুব আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি

বেঁচে থাকলে তোমার সম্পর্কে তাঁর মনোভাব এখন কী হত জানি না। কিন্তু তোমার আর দু'ভাই, তোমার প্রতি তাদের মূল রাগের কারণ অর্থলোভ। তোমার বাবা, আই মিন স্টেপ ফাদার ঠিকই বুঝেছিলেন তিনি মরে গেলে তোমার মা আর তোমার বেশ হেনস্থা হতে পারে। তাই তিনি মৃত্যুর আগে একটা মাস্টার স্ট্রোক দিয়ে গেছেন। তিনি তাঁর কোনও ছেলের নামেই আলাদা করে কিছু সম্পত্তি দিয়ে যাননি। সব সম্পত্তি লিখে দিয়েছেন তোমার মায়ের নামে। সেই মাতৃসম্পত্তি থেকে তোমাকে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না। আমার বাবা বোধহয় নিজের বাবার সেই উইলই এখন নাল অ্যান্ড ভয়েড করে দেবার চেষ্টা করছেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেমকান্তি বললেন, আবার ওইসব কথা এসে গেল। প্রপার্টি? আমি ওসব কিছু চাই না।

জয়ী বলল, তুমি চাই না বললেই হবে? আগে তোমার ওই ভাই দুটোকে জব্দ করা দরকার। তারপর তোমার ইচ্ছে হলে কোথাও দান করে দিয়ো। এর মধ্যেই তুমি তোমার মেজদার কাছে হিসেব চাইবে। তোমার বেশ কিছু প্রাপ্য টাকা জমে থাকার কথা।

হেমকান্তি জিজ্ঞেস করলেন, জয়ী, যার বাবা থাকে না, তাকে কী বলে?

জয়ী বলল, আমি এই ভয়টি করছিলাম। এই খবরটা তোমাকে খুব নাড়া দিয়েছে। তুমি কি রক্তের সম্পর্ক নিয়ে খুব মাথা ঘামাও?

মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে, তার আবার মাথা ঘামানো। তবে...

মানুষের জন্ম তো অ্যাকসিডেন্ট। কোন পুরুষের স্বার্থে তোমার জন্ম হল, সেটা এমন কী বড় ব্যাপার? দু'বছর চার মাস বয়েস পর্যন্ত যিনি তোমার বাবা ছিলেন, তার চেয়েও আরও অনেকগুলো বছর যাঁকে তুমি বাবা বলে জেনেছ, যাঁর আশ্রয়ে মানুষ হয়েছ, তাঁর পরিচয়টাই কি তোমার কাছে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট নয়? স্নেহ তো তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছ! তোমার কর্ণ-কুন্তী সংবাদ মনে আছে?

না।

উঃ, কী অদ্ভুত ব্যাপার, একটুও মনে নেই? একসময় তুমি রীতিমতন অ্যাকটিং করে পুরোটা শোনাতে আমাদের। একবার একটা ফাংশনে তুমি আর তোমার বোন দু'জনে কর্ণ আর কুন্তী সেজেছিলে। আমার কিছুটা মনে আছে, শুনবে, কর্ণ কী বলেছিল? "মাতঃ, সূতপুত্র আমি, রাধা মোর মাতা, তার চেয়ে

নাহি মোর অধিক গৌরব...।" তারও আগে, কুন্তীর বর্ণনায়, ইয়ে, হ্যাঁ, "হেনকালে করি পথ/ রঙ্গমাঝে পশিলেন সূত অধিরথ/ আনন্দ বিহুল/ তখনি সে রাজসাজে/ চারিদিকে কুতূহলী জনতার মাঝে/ অভিষেকসিক্ত শির লুটায়ে চরণে/ সূতবৃদ্ধে প্রণমিলে পিতৃ সম্ভাষণে..."। যার সান্নিধ্য পেলে না, স্নেহ পেলে না, শুধু বীর্য দিয়েই কি সে বাবার স্থান পেতে পারে?

তাকে থামিয়ে দিয়ে হেমকান্তি জিজ্ঞেস করলেন, জয়ী, তুমি কবে বিয়ে করছ?

এবার জয়ী সহাস্যে বলল, আমি এক পাগলিনী। একটা ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে বলছি, আমি বিয়ে করতে চাই, বিয়ে করতে চাই, আমার বিয়ে আদ্ধেক ঠিক হয়ে গেছে। এখন রাজকুমার রাজি হলেই হয়!

চোদ্দো

আজকের কাগজে পাকিস্তানের টিমের বিরুদ্ধে ভারতীয় টিমের যে ষোলোজন খেলোয়াড়ের নামের তালিকা ছাপা হয়েছে, তাদের মধ্যে টিটো একজন।

সকালবেলা কফি দিতে এসে ঝিল্লি হেমকান্তিকে জিজ্ঞেস করল, আপনি খবরটা শুনেছেন? টিভিতে বারবার দেখাচ্ছে টিটোদার ছবি। আপনার উচিত টিটোদাকে কনগ্র্যাচুলেট করা।

পাছে হেমকান্তি অজ্ঞতার সাফাই দেন, তাই হাতে করে একটা ইংরিজি সংবাদপত্রও নিয়ে এসেছে ঝিল্লি। উদ্দিষ্ট জায়গাটি দেখিয়ে দিল।

চক্ষু বুলিয়ে হেমকান্তি বললেন, বাঃ!

ঝিল্লি বলল, টিটোদা কালই দিল্লি চলে যাবে। নিশ্চয়ই দেখা করতে আসবে আপনার সঙ্গে।

ইদানীং টিটো খেলা নিয়ে এত ব্যস্ত যে হেমকান্তির সঙ্গে তেমন দেখাই হয় না। আজও হয়তো সে বেরিয়েই যেত, একটু পরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, ছোটমামা, তুমি আমায় ডেকেছ?

হেমকান্তি ডাকেননি, তবু বুঝলেন, এটা ঝিল্লির কীর্তি।

তিনি বললেন, হ্যাঁ রে, খুব খুশি হয়েছি। কনগ্র্যাচুলেশনস্।

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

টিটোর এখনও মনে আছে, এই মানুষটিই তাকে বলেছিলেন, ওখানে না খেললে কী হয়? যাক, এখন তা হলে বোধবুদ্ধি অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে!

একটু ইতস্তত করে সে করমর্দনের বদলে নিচু হয়ে ঝুপ করে হেমকান্তির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ফেলল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এখন বেশ কিছুদিন বাইরে থাকতে হবে, তোমার সঙ্গে অনেকদিন...

হেমকান্তি বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে? আমি এখন ভালো হয়ে গেছি। একা চলাফেরা করতে পারি।

টিটো বলল, আমি ফোন করব মাঝে মাঝে। এখন পাকিস্তান থেকেও সহজেই ফোন করা যায়।

হেমকান্তি বললেন, টিটো, তোমার একটু সাহায্য চাই। আমি ভাবছি, একবার বাইরে থেকে দু'-একদিনের জন্য ঘুরে আসব। দিনের পর দিন বাড়িতে বসে থাকা, এখন হাঁটতে গেলে আমার মাথা ঘোরে না। আমি জামসেদপুরে যাব।

জামসেদপুরে, তুমি একা যাবে?

হ্যাঁ! রত্নেশ আমায় টিকিট কেটে ট্রেনে তুলে দেবে। আর রত্নেশ যদি না থাকে, ঝিল্লিই পারবে। আগে জামসেদপুরের একটা হোটেল ঠিক করতে হবে। তুমি যদি সেটা বলে দাও, মাঝারি হোটেল...

জামসেদপুর গিয়ে তুমি হোটেলে থাকবে?

না হলে কোথায় থাকব?

জামসেদপুরে তোমার বোনের বাড়ি নেই?

আমার বোন?

আমার মা তোমার বোন নয়? আবার ভুলে গেছ?

না, না, মনে আছে। তোমার মা আমার বোন। আমি তোমার ছোটমামা। কিন্তু সে তো আর নেই?

মা না থাক, আমার বাবা আছেন। ছোট একটা বোন আছে। তারা যদি শোনে তুমি কোনও হোটেলে উঠেছ... ইমপসিবল্‌।

আচ্ছা, আচ্ছা।

যাও, জামসেদপুর ঘুরে এসো, তোমার ভালো লাগবে। ওখানে তোমার অনেক চেনাশুনো আছে, হয়তো তাদের দেখে...

একটু থেমে গিয়ে সে বলল, সেখানে তো তোমার এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীও আছে।

স্মৃতিতে বান্ধবীর মুখ নেই, তাই টিটোর চোখে চোখ রেখে তিনি বললেন, বান্ধবী?

টিটো বলল, আসলে আমার মায়ের বান্ধবী, সম্পর্কে আমার পিসি হলেও দু'জনে একেবারে এক বয়েসি। মায়ের থ্রু দিয়েই তোমার সঙ্গে বিভাপিসির আলাপ। তুমি তো শ্রাবণীকে দেখেছ, ওর মা। একসময় তুমি ওদের বাড়িতে বেশ ঘনঘন যেতে, একবার কী যেন একটা গন্ডগোলও হয়েছিল...

এবারে অতিরিক্ত উৎসাহ দেখিয়ে হেমকান্তি বললেন, গন্ডগোল হয়েছিল? গন্ডগোল? সে মহিলার নিশ্চয়ই মনে থাকবে, কী গন্ডগোল হয়েছিল বলতে পারবে!

তুমি শ্রাবণীকেও জিজ্ঞেস করতে পারো। না, ও বোধহয় সবটা জানে না।

আমি জামসেদপুরেই যাব।

আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। ওখানকার ঠিকানা, ফোন নাম্বার, আমি আজই ফোনে জানিয়ে দিচ্ছি—

একটু বাদে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে হেমকান্তি দেখলেন, টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ঝিল্লি।

সে বলল, আপনার ব্রেকফাস্ট এখানে এনে দেব, না ভেতরে গিয়ে টেবিলে বসে খাবেন? টিটোদা আরও কিছু বলবে বোধহয় আপনাকে।

হেমকান্তি বললেন, ঠিক আছে, আমি টেবিলেই যাচ্ছি।

ঝিল্লি তখনই চলে গেল না। টেবিলের ওপর বইপত্র নাড়াচাড়া করতে লাগল।

তারপর কুণ্ঠিতভাবে বলল, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

বলো।

আমার এক বন্ধু আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়। কাল-পরশু একবার আসতে পারে এখানে!

হেমকান্তি সন্ত্রস্তভাবে বললেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়? কেন?

আপনার ইন্টারভিউ নেবে।

আমার... ইন্টারভিউ?... কেন? আমি কী করেছি?

ও একটা বই লিখছে, আপনাদের সময়টা নিয়ে। ওর নাম বিক্রম আচার্য, আপনি বোধহয় ওর বাবাকে চিনতেন।

না না, ঝিল্লি, তা সম্ভব নয়। তোমার বন্ধুকে এখানে আসতে বারণ করো। সে তার বাবার কথা জিজ্ঞেস করবে, আমি কিছুই বলতে পারব না, একটা নির্বোধের মতন বসে থাকব। না, আমি আর ওসব চাই না।

ঝিল্লি মুখ নিচু করে নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল, আমার এই বন্ধুটা না, বড্ড নাছোড়বান্দা। একটু একটু পাগলও। আপনি যদি ওকে এখানে আসতে বারণ করেন, তাও ও আপনি রাস্তায় বেরোলেই আপনার পিছু নেবে, একটা কোনও জায়গায় আপনার পথ আটকে কথা বলতে শুরু করবে। ওর বাবা কার্তিক আচার্যের কথা আপনার একটুও মনে নেই?

সত্যিই নেই। কী করব বলো!

আর অরিজিৎ সেনগুপ্ত!

সে আবার কে?

অরিজিৎ সেনগুপ্ত আপনার খুব বন্ধু ছিলেন।

পুরনো সব বন্ধুদের আমি হারিয়ে ফেলেছি, ঝিল্লি। এখন নতুন বন্ধু সংগ্রহ করতে হবে। যদি সম্ভব হয়। কী নাম বললে, অ-রি-জি-ৎ সেনগুপ্ত, তুমি তার কথা কী করে জানলে?

ওই বিক্রমই বলছিল।

তুমি...

কথা শেষ হল না। অন্য ঘর থেকে মেজবাবু দু'বার ঝিল্লির নাম ধরে ডাকলেন।

ঝিল্লির সঙ্গে সঙ্গে হেমকান্তিও এলেন খাবার ঘরে।

টিটোর খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, সে একটা প্যাডে কিছু লিখছে।

মেজবাবু বিরক্তভাবে ঝিল্লিকে বললেন, কোথায় থাকিস? আমার ওষুধ দিয়েছিস? তারপর ছোট ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হেম, তুই বুঝি উকিল ঠিক করেছিস?

হেমকান্তি বিস্মিত হয়ে বললেন, উকিল? কই না তো!

শুকনো গলায় মেজবাবু বললেন, একজন আমাকে ফোন করেছিল। বলল, সে তোর ল-ইয়ার। নাম বলল, অসিতরঞ্জন সরকার। মুরুব্বি চালে আমাকে বলল, তুই যে অনেক বছর অনুপস্থিত ছিলি, তার দরুন তোর যে টাকা জমেছে, তার একটা হিসেব তৈরি করে রাখতে। শিগগিরই সে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

বিভ্রান্তভাবে হেমকান্তি বললেন, মেজদা, এরকম কোনও লোকের সঙ্গে আমার কোনও কথা হয়নি। আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না।

তাঁর কথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করে মেজবাবু বললেন, তুই তো সুবিধে মতন এটা ভুলে যাস, সেটা ভুলে যাস। পরে বলবি... যাই হোক, ওই লোককে আমার কাছে আসতে বারণ করে দিবি। আমি কোনও হেঁজিপেঁজি উকিলের সঙ্গে কথা বলতে চাই না। সে যেন আমার ল-ইয়ারকে মিট করে। আমার ল-ইয়ার সি. কে. বোস। এরপর থেকে লড়াই হবে উকিলে উকিলে।

লেখা শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে টিটো বলল, মেজমামা, আমাকে এক্ষুনি বেরোতে হবে, অনেক কাজ সারতে হবে। আমি একটু কথা বলে নিই?

প্যাডের কাগজটা ভাঁজ করে টিটো বলল, ছোটমামা, আমার ছোট বোনকে চিঠি লিখে দিলাম, তুমি নিয়ে যাবে, সে-ই তোমাকে জামসেদপুরের সব দেখিয়ে দেবে। বিভাপিসির বাড়িতেও সে পৌঁছে দেবে তোমাকে। আমার বাবার একটু হার্টের প্রবলেম আছে... আমি শ্রাবণীকে বলে যাচ্ছি, ও যদি এর মধ্যে বাড়ি যায়...

চিঠিটা হেমকান্তিকে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল দ্রুত। দুই মামা মিলে উকিল ফুকিল নিয়ে কী সব বলছিল, তা তার শুনতে একটুও ভালো লাগছিল না।

এখন তার একমাত্র চিন্তা, সেঞ্চুরি, সেঞ্চুরি! প্রথম টেস্টেই সেঞ্চুরি করতে পারলে বাকি কটা টেস্টে তার জায়গা বাঁধা। জান লড়িয়ে দিতে হবে।

দিল্লি রওনা হবার আগে তার বহু কাজ, দেখা করতে হবে অনেকের সঙ্গে।

মোটরসাইকেলটা বার করে পাড়ার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে আজ তার অন্য রকম অনুভূতি হল। রোজই তো সে এইসময় বেরোয়, কিন্তু আজ যেন প্রত্যেক বাড়ির জানলা খুলে গেছে, সব মেয়েরা, অল্প বয়েসি ছেলেরা বড় বড় চোখ করে দেখছে তাকে। সে যখন পাকিস্তান থেকে ফিরবে, এই পাড়ায় অনবরত ফোটোগ্রাফার আর সাংবাদিকদের ভিড়...

সংবরণদার সঙ্গে সকালেই দেখা করার কথা, তার আগে শ্রাবণী আর রুচিরার কাছে বিদায় নেওয়াটা সেরে ফেলা যাক। আর দেরি হলে শ্রাবণী অফিসে বেরিয়ে যাবে। সে পথের বাঁক নিল।

শ্রাবণীদের বাড়ির সামনেই সদর দরজার কাছে বেশ কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে। উত্তেজিতভাবে কী যেন বলাবলি করছে নিজেদের মধ্যে।

বুকটা একবার কেঁপে উঠল টিটোর। কী হয়েছে, কোনও দুর্ঘটনা?

কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করল না, মোটরসাইকেলটা এক পাশে রেখে সে দুটো করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে উঠতে লাগল ওপরে।

উঠতে উঠতেই শুনতে পেল একটা কুকুরের বিকট হুংকার।

এ-বাড়িতে তো কোনও কুকুর নেই।

তিনতলায় এসে দেখল সে এক অদ্ভুত দৃশ্য।

লোহার গেটটা বন্ধ, তার ওপাশে পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে আছে মাসি আর শ্রাবণী। আর একটা বিশাল কুকুর শক্ত চেন দিয়ে সেই গেটের বাইরে বাঁধা। সেই কুকুরটা লাফাতে লাফাতে হিংস্রভাবে চিৎকার করছে।

টিটোকে দেখে সে আগুন চোখে তাকাল, বেরিয়ে এল দাঁত। সে আরও জোরে লাফিয়ে লাফিয়ে গর্জন করতে লাগল।

যত বড় কুকুরপ্রেমিকই হোক, এই দৃশ্য দেখলে ভয় লাগবেই। টিটো কুকুরপ্রেমিক নয়।

শ্রাবণী চেঁচিয়ে বলল, টিটো, কাছে আসিস না। কাছে আসিস না।

টিটো আগেই থেমে গেছে।

সে ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করল, এটা কী ব্যাপার?

শ্রাবণী বলল, সদর দরজা খোলা ছিল, ও এসে কখন বেঁধে দিয়ে গেছে, আমরা তখনও জাগিনি।

ও মানে?

এটা তো সুদর্শনের ডোবারম্যান। আমি চিনি।

এখানে বেঁধে দিয়ে যাওয়ার মানে কী?

তা আমি কী করে বলব? কুকুরটা আমাকে চিনতে পারছে না। কাছে গেলে আমাকেও কামড়াতে আসছে। অবশ্য তিন-চার বছর আমায় দেখেনি।

মাসি বললেন, পাগলা কুকুর। চোখ দুটো দ্যাখো না।

টিটো বলল, এ আবার কী ধরনের বাঁদরামি!

মাসি বললেন, উফ্, কী দুশ্চিন্তেটাই না হয়েছিল। গেট খুলে দুধ আনতেও যেতে পারছি না। যাক, টিটোদাদা এসে গেছে, আর চিন্তে নেই। একটা কিছু ব্যবস্থা করবেই টিটোদাদা।

টিটো একবার চোখ বন্ধ করে পর মুহূর্তেই আবার খুলল। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় ঘূর্ণিপাক খেয়ে গেল অনেক চিন্তা।

সেঞ্চুরি, তাকে সেঞ্চুরি করতে হবে। তার কি এখন অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আছে?

সংবরণদা বলেছেন, কনসেনট্রেশন, কনসেনট্রেশনই আসল কথা। দুই ভুরুর মাঝখানে নিয়ে আসবি হৃদয়টাকে। খেলার সময় ছাড়াও অনেক আগে থেকেই প্রিপারেশন দরকার। মা, বাবা, গার্লফ্রেন্ড, কারও সম্পর্কেই চিন্তা করার সময় নেই। টিটো, একবার যদি পাকিস্তানের ফাস্ট বোলারদের পেটাতে শুরু করতে পারিস, আউট হয়ে গেলি তো গেলি, নইলে হু-হু করে রান উঠবে, সেই সাহসটা দরকার—

কালই টিটোকে চলে যেতে হবে দিল্লি, এর মধ্যে সে শ্রাবণীর সমস্যা নিয়ে কী করে মাথা ঘামাবে?

সুদর্শন এর মধ্যে নানা রকম গন্ডগোল শুরু করেছে। একবার বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যাবার পর সে এখন আবার শ্রাবণীকে বিয়ে করতে চায়। শ্রাবণী ওকে সহ্য করতেই পারে না।

তার ওপরে সুদর্শনের আর একটা অদ্ভুত আবদার, শ্রাবণীকে ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ওর বন্ধু অমিতের অফিসে চাকরি নিতে হবে। অনেক বেশি মাইনে দেবে, শ্রাবণীর আপত্তি করার কী কারণ থাকতে পারে?

এইসব আজেবাজে কথা নিয়ে ও প্রায়ই আসা-যাওয়া শুরু করেছে। রীতিমতন উপদ্রব। তার ওপর আজ আবার এই কুকুর নিয়ে হামলা। কুকুরটা যদি সত্যিই পাগল হয়ে গিয়ে থাকে... এইসব কুকুর প্রথমেই মানুষের টুঁটি কামড়ে ধরে।

টিটো এখন কী করবে? ও কুকুরের ধারে-কাছে যাওয়ারও প্রশ্ন ওঠে না। শরীরে কোনওরকম চোট লাগালে চলবে না। আজ বিকেল থেকে মোটরসাইকেলটাও বাদ দেবে ঠিক করে রেখেছে। অনেক পরিশ্রম, অনেক কৃচ্ছ্রসাধনে টিটো আজ এই জায়গায় পৌঁছেছে। সে বিড়ি-সিগারেট খায় না। মদ স্পর্শ করে না। এমনকী কোনও স্টেডি মেয়ে-বন্ধুও নেই, যে হঠাৎ মনে আঘাত দিয়ে ফেলবে।

জীবনে কোনও কিছুতেই সার্থকতায় পৌঁছোতে গেলে স্বার্থপর হতেই হয়।

এখন কি সে সেঞ্চুরির কথা ভাববে, না শ্রাবণীকে উদ্ধার করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে। সে সময়ই বা তার কোথায়!

শ্রাবণীর এখন নানান দিক থেকেই বিপদ।

শ্রাবণীর তুলনায় রুচিরা অনেক শক্ত মেয়ে। রুচিরা পাশে থাকলে সুদর্শন খুব বেশি দূর এগোতে পারত না। কিন্তু রুচিরাও তো চলে যাচ্ছে। আমেরিকায় একটা ইউনিভার্সিটিতে ভালো চান্স পেয়েছে, চলে যাচ্ছে চাকরি ছেড়ে।

শ্রাবণী আর এই মাসি। রুচিরা থাকবে না। টিটোকেও অন্তত দু'মাস থাকতে হবে বাইরে, এই সুযোগে সুদর্শন রাস্কেলটা...।

তবু টিটোকে যেতেই হবে। রুচিরা যেমন আমেরিকা যাওয়া বাতিল করবে না, তেমনই টিটোকেও শ্রাবণীকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। শুধু উপস্থিত এই কুকুরের ব্যাপারটা একটা কিছু করা যেতে পারে।

মাসি চেঁচালেন, পুলিশ ডাকো, পুলিশ ডাকো।

গ্রাম্য মহিলারা পুলিশ ছাড়া আর কিছু জানে না। পুলিশ কি পাগলা কুকুর ধরে? এটা কি দমকলের কাজ?

কর্পোরেশনে খুব সম্ভবত ডগ ক্যাচার থাকে। সেখানে খবর দিলে...

অথবা, ডি পি নাগ, হো চি মিন সরণিতে তাঁর কুকুরের হাসপাতাল, তিনি নামকরা একজন কুকুরের ডাক্তার। পাশের একটা অফিসে টিটোকে মাঝে মাঝেই যেতে হয়, সে দেখেছে, সেই ভদ্রলোক নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবেন।

সে বলল, শ্রাবণী, মাসি, তোমরা একদম গেট খুলবে না। দূরে থাকো। আমি লোক পাঠাচ্ছি।

সে নেমে যাওয়া শুরু করল।

শ্রাবণী নিশ্চয়ই খবরে কাগজ পড়েনি, আজকের বড় খবরটা জানে না। এরকম অবস্থায় সেটা জানানোও যায় না।

বিদায়, শ্রাবণী।

কুকুরটা এখনও ডেকে চলেছে।

পনেরো

বরানগরের একটা সরু রাস্তার ওপরে হলদে বাড়িটার সামনে ট্যাক্সি থেকে নামলেন বোসদা আর হেমকান্তি। সবেমাত্র সন্ধে হয়েছে।

ফ্ল্যাটবাড়ির মতন প্রধান দরজা খোলা।

ভেতরে এসে বোসদা বললেন, চারতলায় উঠতে হবে, পারবি তো?

হেমকান্তি বললেন, হ্যাঁ, আমার তো ওপরে উঠতে কষ্ট হয় না। আর মাথা ঘোরে না।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বোসদা জিজ্ঞেস করলেন, অনেকটাই সেরে উঠেছিস, তাই না?

হেমকান্তি বললেন, আমার কোনও অসুস্থতা আছে বলে মনেই হয় না। শুধু পুরনো কথা প্রায় কিছুই মনে করতে পারি না। বেশি ভাবার চেষ্টা করলে মাথার মধ্যে টনটন করে।

মানুষ চিনতে পারিস?

কারুকে কারুকে পারি। নার্সিংহোম থেকে ফেরার পর খুব খারাপ অবস্থা ছিল। সকালে যাকে দেখেছি, বিকেলে আবার তাকে ভুলে যাচ্ছিলাম। এখন তা নয়। নতুন করে যাদের চিনছি, তারা থেকে যাচ্ছে।

এখানে কয়েকজন তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। দ্যাখ চিনতে পারিস কি না। সবাই অবশ্য আগে তোর পরিচিত ছিল।

চারতলায় সিঁড়ি দিয়ে উঠেই একটা লম্বামতন ঘর। অনেকগুলি জানলা। প্রত্যেক জানলার পাশে নানা রকম ফুলগাছের টব। দেওয়াল একেবারে নিরাভরণ।

চারটে টিউব লাইট জ্বলছে।

পাঁচ-ছ'জন ব্যক্তি চেয়ারে বসে গল্পগুজব করছে, প্রায় সবারই হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। ওদের দু'জনকে দেখে সবাই কথা থামিয়ে দিল।

উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রায় সকলেরই বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়েছে, শুধু একজন ষাটের অধিক। একমাত্র সেই ব্যক্তিটিকেই চিনতে পারলেন হেমকান্তি, চোখে কালো চশমা পরা নিরঞ্জন ঘোষাল। গৌতম ধর আর সুশোভন রায়কে অল্পদিন আগেই দেখেছেন হেমকান্তি, কিন্তু তাঁদের মুখ অস্পষ্ট লাগল।

নিরঞ্জন ঘোষাল বললেন, উমাপতি, তুমি আধঘণ্টা নাকি চল্লিশ মিনিট লেট করেছ।

বোসদা বললেন, শ্যামবাজারের মুখটায় বেশ জ্যাম ছিল।

গৌতম ধর বললেন, নিরঞ্জনদা চোখে দেখতে পান না, কিন্তু সময়ের জ্ঞান দারুণ। আপনি কী করে বোঝেন নিরঞ্জনদা?

নিরঞ্জন ঘোষাল কাষ্ঠ হাসি দিয়ে বললেন, নিজের গায়ের চামড়া ছুঁয়ে বুঝি। এখন পৌনে সাতটা, তাই না?

অন্য একজন বললেন, ব্র্যাভো! মাত্র দশ মিনিট এদিক-ওদিক।

বোসদা বললেন, চেয়ারগুলো একটু রি-অ্যারেঞ্জ করে নিই। বড্ড ছড়িয়ে আছে।

সবাই উঠে চেয়ারগুলি টানাটানি করে অর্ধবৃত্তাকারে সাজালেন একদিকে, তার সামনের দিকে মুখোমুখি রাখা হল একটি চেয়ার।

হেমকান্তিকে বসানো হল সেই চেয়ারে।

নিজে বসবার আগে বোসদা বললেন, হয়তো দরকার নেই, তবু পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। নিরঞ্জনদা, সমর, পৃথ্বীন্দ্র, গৌতম, সুশোভন আর আমি।

নিরঞ্জনদা জিজ্ঞেস করলেন, আর কারও আসার কথা আছে?

পৃথ্বীন্দ্র বললেন, শান্তা, অ্যাজ ইউজুয়াল লেট লতিফ।

তখনই ভেজানো দরজা খুলে ঢুকল দু'জন রমণী। ঠিক যুবতী বলা যায় না, আবার প্রৌঢ়ত্বকেও খানিকটা পিছিয়ে রাখা হয়েছে। অবশ্য ভাঁজ পড়েছে নাকের দু'পাশে। দু'জনেই মোটামুটি সুশ্রী।

শান্তা লঘু চাপল্যে বললেন, সরি, সরি, সরি, দেরি হয়ে গেল। মিটিং শুরু হয়নি তো! আমি দীপান্বিতাকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

দু'-তিনজন পুরুষ নিজেদের মধ্যে কী সব কানাকানি করলেন।

তারপর সুশোভন বললেন, বোসদা, আজকের মিটিংটা ক্লোজ ডোর হবার কথা, বাইরের কারও থাকা উচিত নয়। দীপান্বিতা, ডোন্ট মাইন্ড, নাথিং পার্সোনাল, তোমাকে অন্য ঘরে অপেক্ষা করতে হবে।

শান্তা বলল, কেন, কেন? দীপান্বিতা মোটেও আউট সাইডার নয়। গোপীবল্লভপুরে একসময় অনেক কাজ করেছে।

বোসদা বললেন, হেমকান্তির যদি আপত্তি না থাকে, তা হলে দীপান্বিতা সম্পর্কে আমার কোনও আপত্তি নেই।

হেমকান্তি বললেন, আমার আবার কীসের আপত্তি?

দীপান্বিতা বললেন, কারও আপত্তি থাকলেও আমি অন্য ঘরে যেতাম না। এ কি সিক্রেট পার্টি মিটিং নাকি? আমারও কিছু বলার থাকতে পারে।

বঙ্গীয় রীতি অনুযায়ী নারী দু'জন বসল পাশাপাশি, এক ধারে।

নিরঞ্জনদা বললেন, শুরু করো, শুরু করো। আমার আবার খাওয়ার নির্দিষ্ট টাইম আছে।

সুশোভন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার প্রথম প্রশ্ন, ওঁর স্মৃতিশক্তিটক্তি নাকি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেসব এখন ঠিক হয়ে গেছে?

বোসদা বললেন, অনেকটা ঠিক হয়ে গেছে। এখন বেশ ভালোই আছে।

সুশোভন তীব্র কণ্ঠে বললেন, বোসদা, প্লিজ, ওঁর উত্তরটা ওঁকেই দিতে দাও!

নিরঞ্জনদা বললেন, রাইট। যাকে যা জিজ্ঞেস করা হবে সে-ই নিজে উত্তর দেবে।

বোসদা বললেন, ঠিক আছে। তবে, প্রত্যেকেরই মাঝখানে মন্তব্য করার অধিকার থাকবে।

সুশোভন বললেন, বলুন, হেম, আপনি বলুন।

হেমকান্তি বললেন, না। ঠিক হয়নি। অনেক কিছুই মনে পড়ে না।

সুশোভন বললেন, আমি যদি বলি, এ ব্যাপারে আপনি অনেকটাই ভান করছেন? সত্যিই ভান করছেন কি না, তা আমরা কী করে বুঝব?

হেমকান্তি নিরঞ্জনদার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ওই যে উনি, কালো চশমা পরে থাকেন, অন্ধ, উনি সত্যিই অন্ধ, না অন্ধ সেজে থাকেন, তা বোঝার কোনও উপায় আছে?

নিরঞ্জনদা হ্যা হ্যা করে হেসে উঠে বললেন, এটা কিন্তু হেম ঠিকই বলেছে। ভেরি স্মার্ট আনসার। কেউ যদি ইচ্ছে করে অন্ধ সেজে থাকে, তা ধরার কোনও উপায় নেই। রাস্তায় যত অন্ধ ভিখিরি দেখা যায়, তার মধ্যে অনেকেই তো ফেক!

বোসদা বললেন, আমরা হেমকে প্রশ্ন করব। ও যথাসাধ্য উত্তর দেবে। যত দূর যা মনে আছে। আমরা আশা করব, ও সত্যি কথা বলবে। আমরা কিছু কিছু ব্যাপারে সত্যের উদ্ঘাটন চাই।

কেউ একজন বলল, সত্য ব্যাপারটাও তো আপেক্ষিক। একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি। সত্য এক হলেও নানা জনে তা নানাভাবে ব্যাখ্যা করে।

বোসদা বললেন, ওসব কচকচির মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই। এখানে সত্য বলতে বোঝাচ্ছি ফ্যাক্ট।

সুশোভন বললেন, নাইনটিন সেভেনটি, ডিসেম্বর। একটা অ্যাকশন হয়েছিল বীরভূমে, হেম, তুমিও সঙ্গে ছিলে। তারপরই আমাদের মধ্য থেকে শুভ্রজিৎ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। কেউ বিট্রে করেছিল। হেম, তুমি তখন কোথায় লুকিয়ে ছিলে?

হেমকান্তি ম্লানভাবে বললেন, আমায় মাপ করুন। নাইনটিন সেভেনটি... মানে ঠিক কত বছর আগে, সেটাই আমি মনে করতে পারছি না।

সুশোভন বললেন, তখন ছিল সিদ্ধার্থ রায়ের আমল। খদ্দর পরা অহিংস কংগ্রেসি। কিন্তু কাঁচাখেকো, রক্তমাখা হাত।

হেমকান্তি অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, আমায় কেউ একটা সিগারেট দেবেন?

বোসদাই তাঁর সিগারেটের প্যাকেট ও লাইটার এগিয়ে দিলেন।

একটা সিগারেট ধরিয়ে হেমকান্তির মনে পড়ল জয়ীর কথা। এইসময় জয়ী তাঁর পাশে থাকলে কত ভালো হত।

এতগুলি মানুষের চোখ তাঁর দিকে নিবদ্ধ।

তাঁর মনে হল, এদের প্রত্যেকের হাতে রয়েছে রাইফেল। একসঙ্গে গুলি ছুড়বে তাঁর দিকে। আগে শুধু একটু খেলা করছে।

তিনি বললেন, আপনাদের প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না। সিদ্ধার্থ রায়কে আমি জানি না। সত্যিই জানি না। বরং আমি আপনাদের প্রশ্ন করি? আপনারা আমাকে বুঝিয়ে দিন।

একজন কেউ বললেন, নট আ ব্যাড আইডিয়া। হেম, তুমিই প্রশ্ন করো।

হেমকান্তি বললেন, আপনারা অনেকে এসেছেন, সবাই আমাকে অনেকদিন থেকে চেনেন?

নিরঞ্জনদা বললেন, হ্যাঁ, চিনি তো বটেই। অন্তত তিরিশ-বত্রিশ বছর।

হেমকান্তি বললেন, আমি আপনাদের সঙ্গে ছিলাম? আমরা কী করছিলাম? কোথায় গিয়েছিলাম?

বোসদা বললেন, আমি বলছি, গোড়া থেকে। প্রেসিডেন্সি কলেজে ফাইন্যাল পরীক্ষার আগেই আমরা কলেজ ছেড়ে চলে যাই, তুই আমি আর পৃথ্বীন্দ্র একসঙ্গে।

কোথায় চলে যাই?

দেশের জন্য কিছু কাজ করতে।

দেশের কাজ মানে কী?

দেশের কাজ মানে, দেশটার যা দুরবস্থা, তা যাতে বদলানো যায়।

কেন?

কেন মানে? ওই যে বললাম, দেশের শাসনব্যবস্থাটা যাতে বদলানো যায়।

কলেজসুদ্ধু সবাই গিয়েছিল?

যাঃ, তা কখনও হয় নাকি? আমরা কয়েকজন, আরও অন্য কলেজ থেকেও।

আমরা কয়েকজন কেন গিয়েছিলাম? কেউ আমাদের যেতে বলেছিল?

না। কে আবার বলবে?

সবাই যায়নি, শুধু আমরা কয়েকজন, কেন?

বোসদা অধৈর্য হয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ প্রশ্নের কে উত্তর দেবে?

হেমকান্তি তাঁকে প্রায় বকুনির সুরে বললেন, ভোমরা, আমি জানতে চাইছি, আমি জানতে চাইছি।

পৃথ্বীন্দ্রর রোগা লম্বাটে চেহারা, এরই মধ্যে মাথার চুল প্রায় সাদা, মুখে কয়েক দিনের না কামানো দাড়ি। এখানে একমাত্র তাঁরই পরিধানে ধুতি আর হাফ হাতা ফতুয়া।

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি হেমকে সহজ করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। যত দূর মনে হচ্ছে, ওর সত্যিই কিছু মনে নেই। হেম, তুমি ছিলে সচ্ছল পরিবারের ছেলে। পড়াশুনোয় ভালো। ইন ফ্যাক্ট স্কলারশিপ পেয়েছিলে। ছাত্রীদের মধ্যে পপুলার, শান্তা-দীপান্বিতারা তার সাক্ষী দেবে। এই ধরনের একজন ছাত্র সাধারণত চুটিয়ে প্রেম করে, আবার পরীক্ষাতেও ভালো রেজাল্ট করে, কিছুদিন পরেই আই এ এস অফিসার হয়, কিংবা কোনও মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে যোগ দিয়ে আরও মোটা মাইনের চাকরি পায়, তারও পরে, অধিকতর কোনও বড়লোকের বাড়ির ফরসা, তুলতুলে চেহারার মেয়েকে বিয়ে করে। অ্যান্ড দে লিভ হ্যাপিলি এভার আফটার। অথবা যারা বিদেশে যায়, তারা চিরকালের মতন হারিয়ে যায়। সাদাদের দেশে গিয়ে ব্রাউন সাহেব হয়ে জীবন কাটায়। এই হল প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের যাকে বলে

অ্যাভারেজ সফল জীবন। কেউ কেউ অবশ্য পলিটিক্সেও জয়েন করে। রেসপেক্টেবল পলিটিক্স। মন্ত্রী হবার রাস্তা সামনে খোলা। তখন কেন্দ্রেও কংগ্রেস, রাজ্যেও কংগ্রেস। শুধু সিক্সটি সেভেনে কয়েক মাসের জন্য অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল সেনদের ধরাশায়ী করে একটা যুক্তফ্রন্টের এক্সপেরিমেন্ট হয়েছিল, টেকেনি। তবে, সেই সুবাদে অপোজিশনের বাম পার্টিগুলোও হাত অনেকটা শক্ত করে নিয়েছে। এককালের সর্বহারা পার্টির নেতা জ্যোতি বসু একবার মন্ত্রিত্বের গদিতে বসার চান্স পেয়েছেন, চান্স পেয়েই তিনি নকশালবাড়ির কৃষকদের ওপর গুলি চালাবার অর্ডার দিয়েছেন। ভবিষ্যতে...

সুশোভন চেঁচিয়ে বললেন, আঃ পৃথ্বী, বড্ড লম্বা হয়ে যাচ্ছে। এসব তো অতি ছেঁদো কথা!

পৃথ্বীন্দ্র বললেন, হেম কত মনোযোগ দিয়ে শুনছে দ্যাখ। ওর এই ব্যাকগ্রাউন্ড জানা দরকার। হেম, তোমার বড়দাদা ছিলেন কংগ্রেসের মন্ত্রী। তুমি ওই রাজনীতিতে যোগ দিলে তোমার মন্ত্রিত্ব বাঁধা ছিল, এমনকী সেন্ট্রালেও...। কিন্তু তুমি মার্ক্সবাদে দীক্ষা নিলে। অনেকটা নিজে নিজেই। কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয়েছে মাত্র কিছুদিন আগে। আমরা বামপন্থী ছাত্র রাজনীতি করতাম, সি পি আই না সি পি এম কোন দিকে যাব, তা নিয়ে খানিকটা কনফিউশন ছিল। তুমিই আমাদের চিনের দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝালে যে সোভিয়েট রাশিয়া শোধনবাদী, ও-রাস্তা আমাদের নয়। কেন্দ্রে ইন্দিরা গাঁধীর সরকারকে বিপ্লবের মাধ্যমে উলটে দিতে না পারলে এ দেশের প্রকৃত মুক্তি নেই। ইন্দিরা গাঁধীর সঙ্গে তখন রাশিয়ার খুব দোস্তি। আমরা কলেজ ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম বিপ্লবে। কেউ আমাদের নির্দেশ দেয়নি, আমরা গিয়েছিলাম নিজেদের বিবেকের তাগিদে। চারু মজুমদারের কথা জেনেছি আরও পরে।

হেমকান্তি অস্ফুট স্বরে বললেন, বিপ্লব? আমরা বিপ্লব করেছি? দেশ বদলেছে?

পৃথ্বীন্দ্র বললেন, আমরা কতটা কী পেরেছি, তার ইভ্যালুয়েশন এখনও ঠিক হয়নি। প্রত্যক্ষ না হোক, পরোক্ষভাবে দেশ বদলাবার কাজে...। আমাদের আন্তরিকতার কোনও অভাব ছিল না, সেন্ট পারসেন্ট ডেডিকেশন ছিল, কত কষ্ট সহ্য করেছি, না খেয়ে থেকেছি। সারাগায়ে খোস-পাঁচড়া, সেই থেকে আমার আলসার, নিরঞ্জনদার চোখ দুটো গেছে। যেসব কমরেড জীবন

দিয়েছে, তারা এক একজন হিরের টুকরো ছেলে। হেম, তুমিও এইসব কষ্ট সহ্য করেছ সমানে। স্বেচ্ছায়।

সুশোভন বললেন, আই অ্যাম সরি টু সে দিস, হেমকান্তি লাহিড়ী ছিল বরাবরই মেয়েবাজ! বনে-জঙ্গলেই হোক কিংবা গ্রামে-গঞ্জে, সবজায়গায় ও একটা করে মেয়ে খুঁজে নিত।

বোসদা তাঁকে ধমক দিয়ে বললেন, সে তো চে গুয়েভারা সাউথ আমেরিকার যেখানেই যেতেন, সুন্দরী সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে ট্যাঙ্গো নাচতেন না? মদ খেতেন না? তোদের এইসব শুচিবাই আর গেল না। হেমের আইডিয়ালিজম কারও চেয়ে কম ছিল না। আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে না গিয়ে ও বাড়িতে থাকলেও অনেক মেয়েকে কাছে পেতে পারত।

সুশোভন বললেন, বাড়িতে ফিরে যেত তো মাঝে মাঝে। যেত না?

বোসদা বললেন, হ্যাঁ, কয়েকবার গেছে, কিন্তু মন বসাতে পারেনি, টিকতেও পারেনি, আবার বেরিয়ে এসেছে। কেরিয়ার গড়ার দিকে ও কোনওদিন মন দেয়নি, এটা সেন্টপারসেন্ট সত্যি।

সুশোভন বললেন, বোসদা, তুমি বড্ড বেশি কথা বলছ। তাও ওর দিকে টেনে টেনে। অন্যদেরও কিছু বলতে দাও।

বোসদা বললেন, অন্যদের মানে সত্যিই অন্যদের। তুমি একাই অন্য নও।

হেমকান্তি বললেন, এতগুলো বছর, আমি মাঝে মাঝে বাড়িতে থাকতাম না, তা হলে থাকতাম কোথায়?

বোসদা বললেন, তুই আর আমি দু'জনেই একসঙ্গে আড়াই বছর জেলে ছিলাম। স্যরি, অন্য কেউ কিছু বলুক।

দীপান্বিতা জিজ্ঞেস করলেন, আমি কিছু বলতে পারি?

হেমকান্তি তাঁর দিকে তাকালেন।

দীপান্বিতা বললেন, হেম কিছুদিন রামপুরহাটে ছিল। বছর দেড়েক। তখন হুলিয়া ছিল ওর নামে। ওখানে আমার মামার বাড়ি। আমার মামা পরাধীন আমলে স্বাধীনতাসংগ্রামী ছিলেন। স্বাধীনতার পরে সরকারের কাছ থেকে কোনও অনুগ্রহ নেননি, একটা সাধারণ স্কুলে চাকরি করতেন। ওঁর দুর্বলতা ছিল বিপ্লবীদের সম্পর্কে। মামা ওকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, আমিও সেখানে গিয়ে ছিলাম প্রায় তিন মাস।

হেমকান্তি বললেন, দীপান্বিতা?

দীপান্বিতা বললেন, মনে আছে কিছু?

দু'দিকে মাথা নাড়লেন হেমকান্তি।

দীপান্বিতা অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, সুশোভন ওকে বলল, মেয়েবাজ। আমি তো তখন দেখেছি অন্য এক মানুষকে। কী শান্তশিষ্ট, আর ভদ্র। মামা দু'বেলা খেতে দিচ্ছেন, তাই বিনিময়ে হেম মামার তিনটি ছেলেমেয়েকে প্রতিদিন সন্ধেবেলা পড়াত। বড় ছেলেটা ছিল অতি বাঁদর, তাকে বাগ মানানো সোজা কথা নয়, আমি দেখতাম, সে ছেলেও মন দিয়ে এই মাস্টারের কাছে মাও সে তুং-এর গল্প শুনছে। সেই ছেলে এখন পুরুলিয়ায় মাওবাদীদের দলে ভিড়েছে। আর মেয়েবাজ? আমি যে তিন মাস ছিলাম, আমার সঙ্গে তো এক দিনও হিড়িক দেবার চেষ্টা করেনি। এখন না হয় বুড়ি হয়ে গেছি, তখন আমি দেখতে-শুনতে নেহাত খারাপ ছিলাম না!

শান্তা বললেন, মেয়েরাই তো হেমকে দেখলে হামলে পড়ত। যেমন হ্যান্ডসাম, তেমনই অতি সুন্দর ব্যবহার। পুরুষ মানুষের চেহারার চেয়েও ভালো ব্যবহার মেয়েরা বেশি পছন্দ করে।

দীপান্বিতা বলল, তুই যে সেই নদীতে স্নানের ঘটনাটা বলেছিলি?

শান্তা বলল, হ্যাঁ, মেয়েরা যখন পুকুরে বা নদীতে স্নানটান করে, তখন অনেক পুরুষ পাড়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখে। সেই কৃষ্ণের আমল থেকে ব্যাপারটা চলে আসছে। আর একবার হেমকান্তি একা নদীতে স্নান করছিল, দেখি কী, একটা ঝোপের আড়ালে তিনটি গ্রামের মেয়ে।

সুশোভন আবার উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্তভাবে বলল, এসব কী হচ্ছে কী? আজেবাজে কথা, এইসব শুনতে আমরা এখানে এসেছি?

দীপান্বিতা বলল, রামপুরহাটের আর একটা ঘটনা আমি বলবই। তখন ওই জেলার এস পি ছিলেন এ. আর. খান। খুব দুঁদে অফিসার। একদিন সন্ধেবেলা তিনি এলেন মামার সঙ্গে দেখা করতে। মামা তখন মুড়ি আর তেলেভাজা বেগুনি খাচ্ছিলেন। এ. আর. খান বললেন, তিনিও মুড়ি খাবেন। মুড়ি খেতে খেতে ইস্কুলের কথা, জলকষ্টের কথা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করতে করতে হঠাৎ তিনি খুব ক্যাজুয়ালি বললেন. মাস্টারমশাই, আপনার বাড়ির পেছনের দিকে টালির ঘরটায় যে-ছেলেটিকে আশ্রয় দিয়েছেন, এবার তাকে কেটে পড়তে বলুন। আর ওকে বাইরে রাখা যাবে না। আমার মামা বললেন, আপনি জেনে

ফেলেছেন ওর কথা? খান সাহেব হেসে বললেন, সে তো আমি অনেক দিন থেকেই জানি। চোখ বুজে ছিলাম। এখন হাওয়া খুব গরম। আরও একটা দিন আমি চোখ বুজে থাকব, তার মধ্যে যেন সরে পড়ে।

নিরঞ্জনদা বললেন, হ্যাঁ, এই ঘটনাটা আমি শুনেছিলাম।

দীপান্বিতা বললেন, আমার মামা একথা শুনে কী বলেছিলেন, সেটা কি জানেন? মামা বলেছিলেন, খানসাহেব, ও ছেলেটিকে আপনারা ধরতে এলেও সুবিধে করতে পারতেন না। পাবলিক রেজিসটেন্স হত। ও ছেলেটি এর মধ্যেই এ-মহল্লায় এত পপুলার যে পুলিশ ওকে ধরতে এলে দলে দলে লোক, বিশেষ করে মেয়েরা ঝাঁটা খুন্তি নিয়ে পুলিশকে তেড়ে যেত। খানসাহেব অবশ্য তা শুনে বলেছিলেন, তাতে কোনও সুবিধে হত না। এখন ঢালাও অর্ডার আছে ফায়ারিংয়ের, কিছু মানুষ মরত। আমি তা চাই না। নকশালরা কনস্টেবল আর সাধারণ পুলিশকে মারতে শুরু করায় তলার র‍্যাঙ্কের পুলিশরা ওদের ওপর খুব খেপে আছে। মাস্টারমশাই, বিপ্লব করতে গেলে যে তলার র‍্যাঙ্কের পুলিশ, আর্মি, এদের অ্যান্টাগোনাইজ না করে আগে দলে টানার চেষ্টা করতে হয়, সেটা শেখাননি!

নিরঞ্জনদা বললেন, এইসব গল্পেই তো রাত কাবার হয়ে যাবে দেখছি। আসল কথা কিছুই হবে না।

হেমকান্তি বললেন, দীপান্বিতা, তুমি আমাকে আর একটু সাহায্য করবে? তুমি কি জানো, আমি কখনও বিয়ে করেছিলাম কি না?

দীপান্বিতা বললেন, আমি শুনেছিলাম যেন, আপনি জসিডি শহরে এক ডাক্তারের বাড়িতে ছিলেন, তখন আপনি অসুস্থ, সেই ডাক্তারের মেয়ের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়। আপনি তাকে বিয়েও করেছিলেন, তার নাম অনুপমা, আমি তাকে দেখিনি, শুনেছি তার কথা।

হেমকান্তি জলে-ডোবা মানুষের মতন বললেন, বিয়ে করেছিলাম? সে কোথায়?

তা তো জানি না।

অনুপমা? বিয়ের পর তাকে ফেলে চলে গিয়েছিলাম?

সত্যিই আমি আর কিছু জানি না। আমি নিজেও তখন...

আর একটু বলো। আর একটু বলো। সেই অনুপমা এখন কোথায়?

আমার কোনও ধারণা নেই।

তুমি কিছুই জানো না, তবু কেন বললে তার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে?

যা শুনেছি, তাই বলেছি। আপনি জিজ্ঞেস না করলে কিছুই বলতাম না!

সুশোভন আবার অসহিষ্ণুভাবে বললেন, হয়েছে, হয়েছে, ওসব বাদ দাও। এখন কাজের কথা হোক।

শান্তা বললেন, এখানে চায়ের ব্যবস্থা নেই? এখন একটু চা পেলে হত।

সুশোভন বললেন, উফ্, এই মেয়েদের নিয়ে আর পারা যায় না। সবসময় ডিভিয়েট করে। না। এখানে চায়ের ব্যবস্থা নেই। এটা কারও বৈঠকখানা নয়!

গৌতম এবার সুশোভনের দিকে হাত তুলে থামার ইঙ্গিত করে শান্ত, গম্ভীর গলায় বললেন, হেম, আমাদের মূল প্রশ্ন দুটি।

সুশোভন তবু বললেন, দুটি নয়, তিনটি!

গৌতম বললেন, বেশ! প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, ব্লাড ডোনেশনের সেই সকালে, বরুণদা সম্পর্কে তোমার কিছু বলার কথা ছিল, তুমি স্টেজেও বসেছিলে, তারপর হঠাৎ তোমার কী হল, শরীর খারাপ, সাডেনলি কী এত শরীর খারাপ হয়, হোয়াট এগজ্যাক্টলি হ্যাপেন্ড?

হেমকান্তি নিরুত্তাপভাবে বললেন, মনে নেই।

সুশোভন এবার তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠার মতন হয়ে বললেন, হোয়াট ইজ দিস? সবই যদি 'মনে নেই' বলে, তা হলে তো কোনও কথাই চলে না।

সুশোভনের ভাবভঙ্গি দেখে নারী দু'জন ঠোঁট টিপে হাসল।

গৌতম অসীম ধৈর্যের সঙ্গে বললেন, কিছুই মনে নেই? তুমি বাড়ি থেকে হেঁটে এলে, অন্যদের সঙ্গে কথাও বলেছিলে, মঞ্চে তোমাকে স্বাভাবিকই লাগছিল, তারপর মৃণাল সেন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তুমি তাঁর গায়ের ওপর পড়ে গেলে... অজ্ঞান... জুনিয়ার ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখে বলেছিল, তোমার অ্যাবনর্মাল কিছু হয়নি। তা হলে কি তুমি বরুণদা সম্পর্কে কিছু বলাটা অ্যাভয়েড করার জন্যই... মনে করার চেষ্টা করো।

হেমকান্তি বললেন, মনে পড়ছে না। শুধু একটা খুব ভয়ের অনুভূতি, খুব ভয়...

কীসের ভয়? কেউ তোমাকে মারতে আসবে ভাবছিলে?

না।

তবে কী জন্য ভয়?

হেমকান্তি এবার বিরক্তি গোপন না করে বললেন, বলছি তো আমার মনে নেই! সেজন্য তোমরা আমাকে কী করতে চাও, বলো।

গৌতম বললেন, ও কে, ও কে। এই প্রশ্নটায় আমরা পরে আবার ফিরে আসব। দ্বিতীয় প্রশ্নটা কী যেন?

পৃথ্বীন্দ্র বললেন, তুমি দময়ন্তী-বিশ্বদেবের কাছে গিয়েছিলে একদিন দুপুরে, এর আগেও দু'-একবার গেছ ওদের কাছে।

হেমকান্তি বললেন, হ্যাঁ। এটা আমার মনে আছে। যাবার সময় আমার জ্ঞান ছিল না, মাথা কাজ করছিল না, কেন যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি তা বুঝিনি। কোনওরকমে পৌঁছে গিয়েছিলাম ওদের কাছে। পরে আসল কারণটা মনে পড়েছে। সেটা মনে পড়াতেই আমি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছি। কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই, আমাকে এই প্রশ্নটা করা হচ্ছে কেন? ওদের সঙ্গে দেখা করাটা কি অপরাধ?

সবাই কয়েক মুহূর্ত চুপ।

বোসদা তারপর বললেন, তুই বোধহয় জানিস না হেম, আমাদের মধ্যে এখন অনেকগুলো ফ্র্যাকশন। খুবই আনফরচুনেট কিন্তু এটাই রিয়েলিটি। একসময় ঘনিষ্ঠ কমরেড ছিলাম। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসঙ্গে সংগঠনের কাজ করেছি, সেই আমরাই এখন নানা দলে ভাগ হয়ে পরস্পরের মুখ দেখি না। পরস্পরের নামে বিষ ছড়াই। দময়ন্তী একসময় আমার কত বন্ধু ছিল, সেদিন দেখলি তো, আমার সঙ্গে ভালো করে কথাই বলল না।

পৃথ্বীন্দ্র বললেন, ওই বিশ্বদেবটা এক নম্বরের সিনিক। আমাদের নামে যা-তা বলে বেড়ায়। সেইজন্যই ওদের কাছে তোমার যাওয়া...

সুশোভন বললেন, সিনিক! শুনেছি তো কার কাছ থেকে যেন ওরা রেগুলার মোটা টাকা পায়। নিজেরা দিব্যি আরামে আছে। বাইরে সিনিক, আসলে হিপোক্রিট!

বোসদা বললেন, শাট আপ, সুশোভন। আমরা কারও নামে কিছু বলব না। নিজেদের মধ্যে স্ল্যানডারিং, লোকে হাসবে।

হেমকান্তি ধীর স্বরে বললেন, আমার অনেক কিছুই মনে নেই, মন থেকে মুছে গেছে, বাট স্ট্রেঞ্জলি আই রিমেমবারড্, আমার কাছে একটা রিভলবার ছিল। আফতাব আমাকে দিয়েছিল।

পৃথ্বীন্দ্র বললেন, আফতাবের রিভলবার? অফ কোর্স, আমরাও জানি। তোমার কাছে ছিল? এখন?

হেমকান্তি বললেন, এখন নেই। তাই আমার মনে হল, সেটা কি আমি দময়ন্তীকে কখনও দিয়েছিলাম?

শান্তা অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, দময়ন্তীর সঙ্গে একদিন মৌলালির যুবকেন্দ্রের সামনে দেখা হয়েছিল, আমার সঙ্গেও কথা বলেনি।

পৃথ্বীন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, দময়ন্তীরা কী বলল তোমাকে? সেটা ওদের কাছে আছে?

হেমকান্তি বললেন, না। ওরা জানে না।

সুশোভন বললেন, তা তো বলবেই। ওদের কাছে থাকলেও স্বীকার করবে না।

গৌতম বললেন, এটা একটা মাইনর ইশু। রিভলবারের খোঁজ দিয়ে আমাদের এখন আর কোনও দরকার নেই।

হেমকান্তি জিজ্ঞেস করলেন, সেই রিভলবার দিয়ে কি আমি কারুকে খুন করেছি?

গৌতম বললেন, আসছি, আসছি, সেই ব্যাপারেই আসছি। তার আগে একটা কথা বলে নিই, আমাদের মুভমেন্ট যখন উত্তুঙ্গে, তখন আমরা প্রত্যেকেই, এই ঘরে যারা উপস্থিত তারা প্রত্যেকেই কিছু কিছু অ্যাকশনে অংশ নিয়েছি। আমাদের হাতে রক্ত লেগেছে। কিন্তু সে তো কোনও ব্যক্তিস্বার্থের জন্য নয়, আদর্শের জন্য। যাই হোক, এতদিন পর, সেইসব প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা কোনও আলোচনাই করব না। কোনও অ্যাকশনের জন্যই কারও কোনও দায়িত্ব নেবার আর প্রশ্নই নেই। সুতরাং হেম, তুমি ও নিয়ে চিন্তাই করবে না। দ্যাট চ্যাপ্টার ইজ ক্লোজড।

বোসদা বললেন, কিন্তু বরুণদার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। মাত্র পাঁচ বছর আগে... আমাদের শরীরে আর সেই জোস্ নেই। আমরা দূরে সরে গেছি, অনেকেই ঢুকে গেছি সংসারে, এখন আমাদের পরের জেনারেশন বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে কীভাবে বিপ্লবের ছক কষেছে, তা আমরা কিছুই জানি না। বরুণদা আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা ছিলেন, মাত্র পাঁচ বছর আগে তিনি খুন হয়েছেন, এটা যদি ইনসাইড জব হয়, তা হলে খুবই দুঃখ আর লজ্জার কথা! আমাদেরই দলের কেউ মেরেছে বরুণদাকে? হেম, শেষযাত্রায় তুই ছিলি

বরুণদার সঙ্গে, তাই তোর কাছ থেকেই আমরা আসল ঘটনাটা জানতে চাইছি।

হেমকান্তি বললেন, আমাকে ক্ষমা করো, তোমরা হয়তো বিশ্বাস করবে না, বরুণদার ব্যাপারে আমার মনটা টোটালি ব্ল্যাঙ্ক। কে বরুণদা, কেমন দেখতে তাকে, কিছুই আমি জানি না।

সুশোভন হেঁকে বললেন, না। আমরা এটা বিশ্বাস করছি না। সাইকোলজিস্টরা বলে, মানুষ যেটা মনে রাখতে চায় না, যাতে নিজের অপরাধবোধ থাকে, সেটাই মন থেকে মুছে ফেলতে চায়, কিংবা চেপে যায়।

পৃথ্বীন্দ্র বললেন, তুমি নিজেই স্বীকার করলে, তোমার কাছে একটা গান ছিল। তুমি ছিলে বরুণদার পাশে। বরুণদার বুকে দুটো বুলেট লেগেছিল। বরুণদার কাছে একটা ব্যাগে চার লাখ চল্লিশ হাজার টাকা ছিল। কী করে বরুণদা মারা গেলেন, সেই টাকাটাই বা কোথায় গেল, তা তোমাকে এক্সপ্লেন করতেই হবে।

এ পর্যন্ত একটাও কথা বলেননি সমর, তিনি এবার বললেন, তখন কি ওদের দু'জনের সঙ্গে অরিজিৎও ছিল না?

দু'-তিনজন একসঙ্গে বলে উঠল, না, না, না, অরিজিৎ কী করে থাকবে? সে তো তখন পুলিশ হেফাজতে।

সমর তবু ভুরু কুঁচকে বললেন, পুলিশ হেফাজতে? তারপর কি অরিজিতের জেল হয়েছিল? আমরা তো কেউ শুনিনি। কোনও কেসেও তার নাম ছিল না।

সুশোভন বললেন, কোনওক্রমে ছাড়া পেয়েই অরিজিৎ পালিয়েছিল। তারপর আর আমাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই রাখেনি। যত দূর জানি, সে এখন দিল্লিতে, কীসব ব্যাবসা ট্যাবসা করে। নামও পালটে ফেলেছে বোধহয়।

পৃথ্বীন্দ্র বললেন, থার্ড পার্সন কেউ ছিল না। শুধু তুমি হেম, আর বরুণদা। বরুণদা খুন হলেন, টাকার থলিটা উধাও হয়ে গেল। শুধু তুমি বেঁচে আছ। এ ব্যাপারে তোমার ভূমিকাটা আমাদের জানতেই হবে। বরুণদার কাছে যে টাকাটা, তা কোনও চুরি-ডাকাতির টাকা নয়। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে চাঁদা তোলা আমাদের সংগঠনের টাকা।

বোসদা বললেন, পুরোটা সাধারণ মানুষের চাঁদার টাকা বললে বাড়াবাড়ি হবে। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অত টাকা তোলার মতন স্ট্রেংথ আমাদের

ছিল না, গোটাকতক জোতদারকে ভয় দেখিয়ে... আমি নিজেই একজনের কাছ থেকে পঁয়তিরিশ হাজার টাকা...

পৃথ্বীন্দ্র বললেন, সে যাই হোক, সেটা আমাদের সংগঠনের টাকা। সে-টাকাটা গেল কোথায় হেম?

হেমকান্তি একটুক্ষণ পাথরের মূর্তির মতন স্থির হয়ে রইলেন।

তারপর আস্তে আস্তে বললেন, আমি বরুণদাকে খুন করেছি! আমি একজন খুনি? আমি টাকার ব্যাগটা... আমি একজন চোর। খুনি আর চোর, এই আমার অতীত জীবন। খুনি আর চোর! এই অতীতের ওপর নির্ভর করে আমার ভবিষ্যৎ গড়া... না, না, না, আমি আর বাঁচতে চাই না, তোমরা আমাকে মেরে ফেলো।

উঠে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে আর পাগলের মতন মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে হেমকান্তি বলতে লাগলেন, আমাকে তোমরা মেরে ফেলো। আমি আর বাঁচতে চাই না, চোর আর খুনি, আমাকে শাস্তি দাও, মেরে ফেলো।

বোসদা ছুটে এসে হেমকান্তিকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হেম, হেম, অমন করিস না, আবার তোর শরীর খারাপ হবে। তোকে কেউ অ্যাকিউজ করেনি, আমরা শুধু জানতে চাইছি।

তিনি জোর করে হেমকান্তিকে বসিয়ে দিলেন চেয়ারে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন হেমকান্তি।

শান্তা বললেন, জল দাও না, এক গেলাস জল দাও ওঁকে।

সুশোভন চাপা গলায় বললেন, নাটক হচ্ছে, নাটক!

আর কেউ কোনও কথা বললেন না।

একটু পরে জামার হাতায় চোখ মুছে হেমকান্তি ধরা গলায় বললেন, ভোমরা, আমি সত্যিই আর বেঁচে থাকতে চাই না। আমার বাঁচার ইচ্ছে চলে গেছে। এই একটা ব্যর্থ জীবন নিয়ে আমি কী করব? তোমরা আমাকে বিষ জোগাড় করে দাও! কীভাবে মরতে পারি বলো!

গলা খাঁকারি দিয়ে নিরঞ্জনদা বললেন, ওহে হেমকান্তি, এই কথাটাই তুমি মাস দু'-আড়াই আগে আর একজনকে বলেছিলে। বিষ খাওয়ার কথা। সে কনভিনিয়েন্টলি তোমার কথা বিশ্বাস করে ভেবেছিল, আত্মহত্যা করলেই তুমি কলঙ্কমুক্ত হবে। সে তোমাকে ঘুমের ওষুধ না কী যেন বিষ জোগাড় করে দিয়েছিল, তুমি তা খেয়েও ফেলেছিলে।

সবাই অবাক সচকিত হয়ে উঠলেন।

দীপান্বিতা বললেন, ওঁকে কেউ বিষ জোগাড় করে দিয়েছিল? কে?

নিরঞ্জনদা বললেন, তা আর জানার দরকার নেই। আমি জানি, কিন্তু তোমাদের জানাব না। হেম তো আবার বেঁচে উঠেছে, সুতরাং সেটা আর মনে রাখবার দরকার নেই।

অপরাধীর মতন মুখ করে হেমকান্তি বললেন, বেঁচে ওঠাটাই আমার অন্যায় হয়েছে। আরও কেউ কেউ বলেছে সে কথা। কেন বেঁচে ফিরলাম? আর একবার, আর ফিরব না।

সমর বললেন, আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না! বরুণদার খুনের ব্যাপারটা নিয়ে কেন বারবার প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, আর হেমকান্তিকেই বা কেন জড়ানো হচ্ছে। ওই খুনের কেসের ফয়সালা তো হয়েই গেছে। নিরঞ্জন মাহাতো ওই কাজটা করেছিল, সেজন্য সে এখন পুরুলিয়া জেলে লাইফ-টার্ম খাটছে।

পৃথ্বীন্দ্র বললেন, আমিও হেমকে সরাসরি অ্যাকিউজ করছি না, কিন্তু নিরঞ্জন মাহাতোর ব্যাপারে গন্ডগোল আছে। ওর নামে অন্য খুনের চার্জ ছিল ঠিকই, কিন্তু বরুণদাকে ও মারেনি। সে-কথা কোর্টে বলেছে বারবার। নিরঞ্জন মাহাতো যদি খুন করত, তা হলে টাকার থলিটা তো সে-ই নিত। তার কাছে টাকাটা পাওয়া যায়নি। নিরঞ্জন মাহাতো অবশ্য বলেছে যে পুলিশই মেরেছে বরুণদাকে।

সমর জিজ্ঞেস করলেন, পুলিশ কেন মারবে বরুণদাকে? ওঁর নামে সেরকম তো কোনও চার্জ ছিল না। তখন তিনি একটা এন জি ও'র সঙ্গে... বড় জোর অ্যারেস্ট করতে পারত।

বোসদা বললেন, পুলিশ কখন কাকে মারবে, তার কি কোনও যুক্তি আছে? পৃথিবীর সব দেশেই পুলিশ কিংবা আর্মি অকারণে নিরীহ লোকদের গুলি করে মারে। পরে অনেক সময় বলে যে ভুল হয়ে গেছে, অনেক সময় তাও বলে না। লন্ডনের টিউব ট্রেনের ব্লাস্টের পব পুলিশ যে একটা লোককে তাড়া করে মারল, সে তো একজন একেবারে নির্দোষ। কাশ্মীরে একটা শ্রমিক শ্রেণির লোক কাঁধে একটা কুড়ুল নিয়ে যাচ্ছিল, সঙ্গে একটা স্প্রে, আর্মির লোক ভাবল, কাঁধের ওটা একটা এ. কে. ফরটি সেভেন বা ওইরকম কিছু, লোকটাকে চ্যালেঞ্জ না করেই গুলিতে ফুঁড়ে দিল।

সুশোভন বললেন, ওসব বাজে কথা ছাড়ো।

সমর বললেন, আমরা আগে একটা রিপোর্ট পেয়েছিলাম যে বরুণদার ওপর যখন গুলি চালানো হয়, তখন হেমকান্তি ওর পাশেই ছিল। প্রাণ বাঁচাবার জন্য ও দৌড়োয়, ওরও পায়ে গুলি লেগেছিল।

সুশোভন বললেন, ওর পায়ে সেই গুলির দাগ আছে?

হেমকান্তি নিজেই বললেন, না, আমার পায়ে কোনও দাগ নেই।

সুশোভন বললেন, বাঃ! পায়ে গুলি লাগল, তার কোনও দাগ রইল না? হাওয়া হয়ে গেল?

দীপান্বিতা বললেন, পা না হয়ে অন্য জায়গাতেও গুলি লাগতে পারে। ডাক্তারের কাছে...

মেয়েরা তো এরকম অবান্তর কথা বলেই, এরকম একটা ভাব করে সুশোভন বললেন, আঃ, চুপ করো তো!

কাছে এসে তিনি শার্টের বুকপকেট থেকে একটা ছবি বার করলেন। সেটা হেমকান্তির মুখের সামনে ধরে বললেন, এই দেখো, বরুণ ঘোষ দস্তিদার, ভালো করে দেখো, কিছু মনে পড়ে? শেষ সময়ে তুমি ওঁর পাশে ছিলে, ওঁর কাছে যে টাকার থলেটা ছিল, সেটার কথাও তুমি কিছু জানো না? এটা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে?

বোসদা বললেন, শোনো, এরকমভাবে ডাইরেক্টলি তুমি কিছু বলতে পারো না, সুশোভন। হেম অবস্থাপন্ন বাড়ির ছেলে, ওই টাকাটা ওর কাছে এমন কিছু নয়। টাকার লোভে ও কোনও খারাপ কাজ করবে, এটা, এটা, যাঃ, কী বলছ তোমরা? ডোন্ট স্টুপ সো লো।

পৃথ্বীন্দ্র বললেন, এটা তোমার কী রকম যুক্তি হল বোসদা? যারা বড়লোক তাদের আরও টাকার লোভ থাকে না? তারা গরিবের রক্ত শুষে খায় না?

সুশোভন বিদ্রূপ মিশিয়ে আবৃত্তি করলেন, 'এ জগতে হায় সেই বেশি চায়, আছে যার ভূরি ভূরি/ রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।'-চার লাখ চল্লিশ হাজার টাকা খুব বেশি নয়, আবার খুব কমও নয়। আমার মতে অনেক টাকা!

হেমকান্তি আপন মনে বললেন, টাকার থলিটা আমি নিয়েছি?

পৃথ্বীন্দ্র বললেন, আর তো কারুকে সেখানে দেখা যাচ্ছে না।

হেমকান্তি বিস্মিতভাবে বললেন, সে টাকাটা নিয়ে আমি কী করলাম?

পৃথ্বীন্দ্র বললেন, সেটা তো তুমিই ভালো জানো ভাই? খরচ করে ফেলেছ?

হেমকান্তি বললেন, যদি খরচ করে থাকি, আমার বাড়ি থেকে ওই টাকাটা জোগাড় করে আমি বোধহয় এখন ফেরত দিতে পারি। কিন্তু...

সুশোভন বললেন, পাঁচ বছরে ওই টাকার অনেক সুদ হয়।

হেমকান্তি ক্লিষ্টভাবে বললেন, সুদটুদ কত হয়, হিসেব করে বলে দিয়ো, তাও বোধহয়...

বোসদা বললেন, শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই মিলে ওই টাকার জন্য... সেইজন্যই কি আমরা আজ এখানে এসেছি?

হেমকান্তি বললেন, টাকাটা ফেরত দেওয়া বড় কথা নয়, কিন্তু খরচ করা... যখন আমি সুস্থ ছিলাম, মাথা ঠিক ছিল, আদর্শবাদও নাকি ছিল অথচ তখন আমি পাবলিকের কাছ থেকে সংগ্রহ করা টাকা নিজের জন্য খরচ করেছি। তার মানে, আমার বিবেক বলে কিছু ছিল না! এই আমার পরিচয়? এই নিয়ে আমি বেঁচে থাকব?

চেয়ারের হাতলে বাঁ হাতের মুঠি ঠুকতে ঠুকতে তিনি বলতে লাগলেন, কে, নো, নো, এই পরিচয় নিয়ে আমি আর বাঁচতে চাই না!

ষোলো

পুরুলিয়া সার্কিট হাউসে দুটো ঘর নেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি পাওয়া যায়নি। দুটো দু' দিকে।

কেন দুটো ঘর নিতে হল, একটাই তো যথেষ্ট ছিল? চক্ষুলজ্জা? পুরনো আমলের খুব বড় বড় ঘর। প্রতি ঘরে দু'জনের শয্যা।

এখানে ঘর বুক করতে হলে জেলা সমাহর্তার অফিস থেকে অনুমতি নিতে হয়। উপ-জেলাশাসক জয়ীর বিশেষ পরিচিত। তাঁকে ফোন করে একজন পুরুষ সঙ্গীকে নিয়ে পুরুলিয়ায় যাবার কথা বলতে গিয়ে জয়ী বলে ফেলেছিল দুটি ঘর চাই। বলার পরই সে আফশোস করেছে। তার তো এরকম চক্ষুলজ্জার বালাই ছিল না আগে।

সেই পরিচিত ব্যক্তিটির নাম সুলতান আমেদ। তিনি দেখা করতে আসবেন বিকেলবেলা।

এখন বেলা এগারোটা। অপেক্ষাকৃত বড় ঘরটিতে জানলার ধারে একটা চেয়ারে হেমকান্তিকে বসিয়ে জয়ী বলল, এখানে বসে বসে কিছুক্ষণ প্রকৃতি উপভোগ করো। আমি দু'-একটা কাজ সেরে আসছি।

খানিকটা প্রান্তর ও কয়েকটি গাছ ছাড়া আর কিছুই দেখার নেই।

একটুক্ষণ বসে থাকার পর হেমকান্তি একটা ব্যাগ খুললেন। বেশ কয়েকটা বই আনা হয়েছে, বই পড়ার অভ্যেসটা তাঁর ফিরে এসেছে।

মোটা মোটা বই এনেছে জয়ী, সবই ইংরিজি। এখন হেমকান্তির বাংলা পড়তেই ভালো লাগত। কী জানি কতকাল পড়া হয়নি বাংলা বই।

প্রথম যে বইটি তুললেন, সেটা দেখে হাসি পেয়ে গেল হেমকান্তির। Making the Most of Your Brain. স্মৃতিশক্তি উদ্ধারের নানান উপায়। জয়ী এখনও তাঁর চিকিৎসার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মলাটে অনেক ক'টা ছবির মধ্যে একটা ছবি এক যোগিনীর। এই বই পড়ার কোনও উৎসাহ বোধ করলেন না হেমকান্তি। The Evolution of Man, Roots— এইরকম কয়েকটা বই উলটেপালটে রেখে দিলেন হেমকান্তি।

টেবিলের ওপর একটা বই পড়ে আছে। এখানকারই কারও হবে হয়তো। মলাটে লেখা শান্তি সিংহ। টুসু।

টুসু শব্দটি হেমকান্তির চেনা মনে হল।

বইটি মূলত গানের বই। কয়েক পাতা পাঠ করেই হেমকান্তি বুঝলেন, টুসু এই অঞ্চলের নিজস্ব গান। বেশ লাগে পড়তে।

এ বছরে পৌষ পরবে সবাই পরে লীল শাড়ি
আমার শাউড়ি দুনিয়ার-পাপী নাই দিল গো লীল শাড়ি ॥

হেমকান্তি ভাবলেন, আহা রে, মেয়েটিকে কেউ একটা নীল শাড়ি কিনে দিল না। এর পরের একটা গান দেখে তাঁর হাসি পেয়ে গেল।

এক গাড়ি কাঠ দু'গাড়ি কাঠ কাঠে আগুন লাগল
যখন আগুন হুদহুদাবে সতিনকে ঠেলে দিব।

তারপরই হঠাৎ একটা আবিষ্কারের মতন হল। একটা গান দেখে হেমকান্তি গুনগুন করে গেয়ে উঠলেন। এ গানের সুর তিনি জানলেন কী করে?

আমার মনের মাধুরী
সেই বাংলা ভাষা করবি কে চুরি।
আকাশ জুড়ে বৃষ্টি নামে
মেঠো সুরের কোন চুয়া
বাংলা গানের ছড়া কেটে
আষাঢ় মাসে ধান রুয়া

বই না দেখলে এ গানের কথাগুলি তাঁর মনে পড়ত না। কিন্তু সুর মনে পড়ে যাচ্ছে একটু একটু।

জয়ী যখন ফিরে এল, তখনও হেমকান্তি সেই সুর পুরোপুরি পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় নিরত।

জয়ী আর একটা চেয়ারে তাঁর মুখোমুখি বসে পড়ে বলল, শোনো। পুরনো দুটো ভিজিটার্স বুক খুঁজে পাওয়া গেল। পাঁচ বছর আগের এক জুন মাসের তারিখে তোমার আর বরুণ ঘোষ দস্তিদার, দু'জনেরই নাম আছে। অর্থাৎ তোমরা এখানে ছিলে, তা কনফার্মড। কিন্তু দেশে লেফট ফ্রন্ট গবর্নমেন্ট, তোমরা ছিলে উগ্রপন্থী, তোমরা এখানে থাকার রিজার্ভেশন পেলে কী করে?

হেমকান্তি বললেন, খাতায় যখন নাম আছে, তখন কোনওভাবে পেয়েছিলাম নিশ্চয়ই।

জয়ী বলল, এখানে এসেও তোমার বরুণ ঘোষ দস্তিদার সম্পর্কে কিছু মনে পড়ছে না?

হেমকান্তি বললেন, নট ইয়েট।

জয়ী বলল, খুব বেশি দিনের কথা তো নয়। অনেক পুরনো কর্মচারী আছেন, যাঁরা পাঁচ-ছ' বছর আগেও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম পীতাম্বর, তিনি হলফ করে বললেন, তোমাকে চিনতে পেরেছেন। তোমার কথা তাঁর মনে আছে। সেটা সত্যি নাঁও হতে পারে। বেশি স্মার্ট হলে এরকম একটা কিছু বলে দেয়। পাঁচ-ছ' বছর আগে মাত্র একদিন-দু'দিন ছিলে, তোমাকে মনে রাখার কী কারণ থাকতে পারে! যাই হোক, আমি পীতাম্বরকে ডাকছি, দেখো তো, তুমি তাকে চিনতে পারো কি না।

হেমকান্তি দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, একেবারেই সম্ভব নয়।

জয়ী বলল, তবু। আমরা এখান থেকে দুয়ারসিনি যাব। বেশি দূর না। কিন্তু

দু'দিন আগেই ওদিকের এক থানার ও.সি-র জিপ উড়িয়ে দিয়েছে এখানকার বিপ্লবীরা। তারা আমাদের কী চোখে দেখবে কে জানে!

হেমকান্তি বললেন, জয়ী, এখানে এসে আমার স্মৃতির কোনও উপকার হবে কি না জানি না। আমি তো তেমন আশা করতে পারছি না।

জয়ী বলল, তা নাই-ই হোক। বেড়ানো তো হবে। তুমি বলেছিলে, আমরা একসঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজব। আকাশে বেশ ভালোরকম মেঘ জমেছে।

দরজার কাছে একজন ব্যক্তি উঁকি মারতেই জয়ী বলল, এই যে পীতাম্বরদা, আসুন, ভেতরে আসুন।

অনতিদীর্ঘ হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তিটি ভেতরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, এখন চা দেব?

জয়ী বলল, না, আমরা স্টেশনের কাছের দোকানে চা-টা খেয়ে এসেছি। একটু পরে ভাত খেয়ে নেব। ট্রেনে ভালো ঘুম হয়নি, লেট করেছে অনেক। দুপুরে ঘুমোতে হবে।

পীতাম্বর জিজ্ঞেস করলেন, কী খাবেন দুপুরে, মাছ আছে। ডিমের কারি হতে পারে, আজ মাংস হবে না।

জয়ী বলল, মাংসের দরকার নেই। মাছ হলেই চলবে। ডালটা ঘন করবেন। সব বাংলোর ডালই পাতলা ছ্যারছেরে হয়। আর আলুভাজা। আপনি এই মানুষটিকে মনে রেখেছেন বললেন, মনে রাখার কারণ কী? কত মানুষই তো আসছে, যাচ্ছে।

পীতাম্বর বললেন, ইয়ে বাবুটির খুব জ্বর হঁইছিল। জ্বরে হিঁ হিঁ করে কাঁপতেছিলেন।

জ্বর হয়েছিল?

ধুম জ্বর। আমাকে দিয়ে ওষুধ আনা করাইলেন। তাতেও কমে না। তারপর বমি হইল।

এই বাবুটিরই যে জ্বর আর বমি হয়েছিল, তার প্রমাণ কী? অন্য কারও হতে পারে। বেশ কয়েক বছর আগের কথা।

তা হতে পারে। এমনই সুরতের আর এক বাবু, হতে পারে, হতে পারে।

হেমকান্তি বললেন, বেনিফিট অফ ডাউট দাও। এই মানুষটি আমাকে চিনতে পারুন বা না পারুন, তাতে কী লাভ হবে? খাতায় যখন আমার নাম আছে...

জয়ী বলল, কীসে কী লাভ হবে জানি না। আমি সব পাথরই উলটে

দেখতে চাই। তোমার এই জ্বর হওয়ার কথাটা আগে কেউ বলেছে?

না, বলেনি। আমারই যে জ্বর হয়েছিল, তাও তো প্রুভড হল না।

পীতাম্বর বেরিয়ে যাবার পর দরজা বন্ধ করে এসে জয়ী হেমকান্তিকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমার কেন যেন মনে হল, তুমি সত্যিই খুব জ্বরে ভুগেছিলে। ইস কত কষ্ট হয়েছে।

হেমকান্তি জয়ীর শরীরের ঘ্রাণ নিতে নিতে বললেন, আমার মনের ভারটা কিছুতেই যাচ্ছে না। সবসময় একটা গিল্টি ফিলিং। আমি যদি কোনও মেয়েকে বিয়ে করে থাকি।

জয়ী বলল, সেটাও আমরা খোঁজ নেব। তবে, আর কেউ কিছু জানল না, শুধু একটি মহিলা তোমাকে বললেন, তাও তিনি নিজে দেখেননি।

একটু সরে গিয়ে জয়ী আবার বলল, শোনো সিন্দবাদ! আমি কি তোমাকে জোর করে বিয়ে করব নাকি? যতক্ষণ না শিয়োর হওয়া যাচ্ছে তোমার আগেই একটা বিয়ে আছে কি না, আমরা লিভ টুগেদার করব! এবারে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি, তুমি যদি আমার বাবার মুখখানা দেখতে... বিশ্বাসই করতে পারছেন না যে তাঁর চিরশত্রু সৎ ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর নিজের মেয়ে... আমার এমন মজা লেগেছে!

জয়ী বালিকার মতন খিলখিল করে হাসছে। হেমকান্তি তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। হাসির দমকে জয়ীর বুক দুটি দুলছে, তার লালচে ওষ্ঠাধর ভেজা ভেজা।

হেমকান্তি মৃদুকণ্ঠে বললেন, তুমি যখন তাহেরে সফরজাদে, তখন তুমি বড় লাভেবল। তোমাকে আদর করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তুমি যখন জয়ী, তখন, তখন, তোমার দিকে তাকিয়ে আমার মধ্যে একটা দ্বিধার ভাব জাগে। জয়ী, তুমি যে বললে সেদিন, আমি তোমার বাবার আপন ভাই নয়, সেটা কি সত্যি? নাকি আমাকে এক ধরনের সান্ত্বনা দেবার জন্য।

অবশ্যই সত্যি। আমাকে কি মা মিথ্যে কথা বলবেন?

এটা তো তুমি চন্দননগরে ওই বাড়িতে যাবার আগেই জানতে? তুমি আগে কেন, মানে, আমাদের মধ্যে ওই ব্যাপারটা, মানে ফিজিক্যাল ইনটিমেসি, তার আগে কেন বলোনি?

ইচ্ছে করেই বলিনি। আমি রক্তের সম্পর্কে বিশ্বাস করি না। তোমার তো কিছুই মনে নেই, তুমি আমার আপন কাকা, না বিনা সম্পর্কের কাকা, তাতে

কী আসে যায়? আমরা দু'জন নারী আর পুরুষ, দু'জনে দু'জনকে চাই, এটাই তো চূড়ান্ত কথা। সেটাই আমার কাছে খুব থ্রিলিং মনে হয়েছে।

ঠিক তার পরেই বলে দিলে কেন?

সেটা অন্য ব্যাপার। বিষয়-সম্পত্তির প্রশ্ন। তুমি আমার বাবা-জ্যাঠার বৈমাত্রেয় ভাই, এই জন্যই ওঁরা তোমাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চান। তুমি সেটা মেনে নেবে কেন? পুরো সম্পত্তিটাই তোমার মায়ের, ওঁদের মা নন, তোমার নিজের মা। তুমি ওঁদের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেবে। তুমি দয়া করে ওঁদের কিছু কিছু সম্পত্তির ভাগ দেবে!

সম্পত্তি? ব্যাপারটা আমায় মাথাতেই ঢোকে না। আমার তো আর কিছু চাই না, তুমিই তো আমার জীবনটা ঘিরে রেখেছ।

আমি এরকমই থাকব। তোমাকে সম্পত্তি নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। সে সব আমি দেখব। আমি আমার লোভী বাবা আর জ্যাঠাদের একটা শিক্ষা দিতে চাই। অনেক হয়েছে এ সব কথা। এবার আমাকে একটা চুমু দেবে?

তুমি অন্য ঘরে থাকবে?

রাত্তিরে, কিছুতেই না। রাত্তিরে আমি তোমার পাশে শোব। দিনের বেলা লোক দেখানোর জন্য... অবশ্য লোকে জানলেই বা কী আসে যায়!

দুপুরের ঘুমটা হল বেশ অনেকক্ষণ। জয়ীর ঘুম ভাঙল টেলিফোনের ডাকে। তার পরিচিত ব্যক্তিটি খবর পাঠিয়েছেন, জরুরি কাজে আটকে গেছেন বলে তিনি আসতে পারছেন না আজ। কাল সকালে—

বারান্দায় চা খেতে বসল দু'জনে।

সামনে অনেকটা ফাঁকা মাঠ। এখানে বাইরের লোকজন বেশি আসে না। কোনও মন্ত্রী বা সরকারি অফিসাররা থাকলে নিশ্চয়ই তাদের জন্য অনেকে ভিড় জমায়। এখন সার্কিট হাউসটি প্রায় ফাঁকা। সুলতান আহমেদ যে বিকেলে আসতে পারেননি তাতে জয়ী খুশিই হয়েছে।

একটু বাদেই একটি পাতলা, লম্বাটে যুবক, পাজামা ও আধময়লা পাঞ্জাবি পরা, কাঁধে ঝোলা কাপড়ের ব্যাগ, দূর থেকে হেঁটে এসে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, নমস্কার, আমি আপনাদের সঙ্গে বসে এক কাপ চা খেতে পারি?

অনুমতি পাবার আগেই সে একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

জয়ীর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনিই তো সুজয়া লাহিড়ী? জয়ী নামেই সবাই চেনে?

জয়ী বেশ অবাক হয়ে বলল, আপনি আমাকে চিনলেন কী করে?

ছেলেটি বলল, ম্যাজিক জানি। আপনি টাপনির দরকার নেই। আমাকে তুমি বললেই চলবে। আপনার থেকে আমি অন্তত দশ-বারো বছরের ছোট। আপনারা দুয়ারসিনি যাবেন তো? আমি আপনাদের সঙ্গে যাব। নইলে, রাস্তাটাস্তা তেমন নিরাপদ নয়। ওরা যদি আপনাকে গুম করে, তা হলে অনেক টাকা দাবি করতে পারে।

হেমকান্তি মুখখানা কঠোর করে বললেন, মে আই নো, হু আর ইউ?

ছেলেটি বলল, নাম জানতে চান, আমার নাম বিক্রম আচার্য। আমি আপনাকে ভালোই চিনি। আপনি কি আমায় চিনতে পারবেন নাম শুনে?

হেমকান্তি বললেন, বিক্রম আচার্য? এই নাম আমি শুনেছি, খুব রিসেন্টলি, কে বলেছে ঠিক মনে করতে পারছি না। বোসদা? সুশোভন?

বিক্রম বলল, না, ওঁদের কেউ না। আপনার মনে না পড়লেও ক্ষতি নেই। মোট কথা, আমি আপনাদের গাইড। সেল্‌ফ অ্যাপয়েন্টেড।

জয়ীর দিকে ফিরে সে বলল, আমার জন্য চা বললেন না? সঙ্গে একটা ডিমভাজা কিংবা পকোড়া। আমি আপনার কথা শুনেছি, কিন্তু আপনি যে এত সুন্দর, তা বুঝিনি। লারজার দ্যান লাইফ, ইয়েট ভেরি প্রোপোরশনেট। তা ছাড়া আপনি খুব ব্রাইট আর প্রাউড, তা থুতনি দেখলেই বোঝা যায়।

ছেলেটির কথার মধ্যে যে ঔদ্ধত্যের ভাব আছে, তা অগ্রাহ্য করল জয়ী। তারুণ্যের এই চপলতা তার খারাপ লাগে না।

সে স্নিগ্ধভাবে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ। কত টাকা দিতে হবে?

কত টাকা মানে, কীসের টাকা?

এই যে তুমি আমাদের গাইড হবে বললে? তার ফি দিতে হবে না?

আপনি কি ভেবেছেন, টাকার জন্য আমি গায়ে পড়া হয়ে আপনাদের গাইড হতে এসেছি? নো ম্যাম। আমার অন্য উদ্দেশ্য আছে। অফ কোর্স মন্দ উদ্দেশ্য নয়।

জয়ী একজন পরিচারককে ডেকে চা ও ডিমের ওমলেটের অর্ডার দিল।

হেমকান্তি বললেন, তুমি তোমার নামটা বললে শুধু। আর কোনও পরিচয় তো দিলে না।

বিক্রম বলল, আমার পরিচয়... আমি একজন কুমোর, মানে মূর্তি বানাই, তাও শুধু মুন্ডু, পুরো বডি নয়। আর কবিতা লিখি, প্রাইভেট টিউশনি করি,

এখানে না, কলকাতায়, আর বিপ্লবের স্বপ্ন দেখি। শুধু স্বপ্ন নয়, খানিকটা অ্যাক্টিভলিও জড়িত।

তুমি কী করে জানলে আমরা দুয়ারসিনি যাব?

আমি এটাও জানি যে পাঁচ-ছ' বছর আগে যে-স্পটটায় বরুণ ঘোষ দস্তিদার খুন হয়েছিলেন, আপনারা সেটা দেখতে যাচ্ছেন। আমি সঙ্গে না গেলে সে জায়গাটা আপনাদের কে চিনিয়ে দেবে?

জয়ী ভুরু কুঁচকে বিক্রমের দিকে তাকিয়ে রইল।

একগাল হেসে বিক্রম বলল, আপনাদের আর সাসপেন্সে রাখতে চাই না। আমি ঝিল্লির বন্ধু।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হেমকান্তি বললেন, হ্যাঁ, ঝিল্লি তোমার কথা বলেছিল।

জয়ীও বলল, ঝিল্লির বন্ধু, দ্যাট মেকস সেনস। ঝিল্লির কাছ থেকে তুমি আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছ।

বিক্রম বলল, ঝিল্লির কাছ থেকে আপনাদের বাড়ি সম্পর্কে কিছু কিছু খবর আমি জেনেছি, সেটা কিন্তু নিছক আনহেলদি কিউরিয়োসিটি নয়। ঝিল্লি যা জানে না, এমন অনেক কিছুও আমি জানি। বিকজ আই অ্যাম ডুয়িং আ লিটল রিসার্চ, তাতে শ্রীহেমকান্তি লাহিড়ীও ইজ অ্যান এলিমেন্ট। আঃ, কেন যে এত ইংরিজি বলি! এখন থেকে চেষ্টা করব না বলার।

জয়ীর দিকে হাত বাড়িয়ে সে বলল, আপনার একটা সিগারেট পেতে পারি?

জয়ী তার হ্যান্ড ব্যাগ খুলে সিগারেট বার করল।

সিগারেট নিয়েই উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, আমি এখন যাই। কাল ভোর ভোর বেরিয়ে পড়লেই ভালো। আপনারা কি কোনও গাড়ি ঠিক করে রেখেছেন, নাকি আমি গাড়ি ভাড়া করে আনব?

জয়ী বলল, আমরা এখনও কোনও গাড়ি ঠিক করিনি।

বিক্রম বলল, তা হলে আমার পক্ষে গাড়ি আনাই ভালো। রিলায়েবল, মানে বিশ্বাসী, এদিককার সব রাস্তা চেনে। ভাড়ার টাকাটা আপনারা দেবেন। আমি কিন্তু দরাদরি করতে পারব না। আপনাদের পক্ষে তেমন বেশি কিছু হবে না। কাল ঠিক সকাল ছ'টায়। রেডি হয়ে থাকবেন।

জয়ী বলল, এ কী! তুমি চা আর ওমলেট খেতে চাইছেন, আগেই চলে যাচ্ছ যে? ওই যে নিয়ে আসছে।

বিক্রম সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বলল, কেন খেতে চেয়েছিলাম জানেন? আমার সম্পর্কে আপনার মনে একটা খটকা ছিল। কিন্তু আমি জানি, কেউ কিছু খেতে চাইলেই বাঙালি মেয়েরা নরম হয়ে যায়। না খাইয়ে ছাড়ে না। চোর কিংবা খুনিরা কিছু খেতে চায় না।

তুমি খুব চালাক চালাক কথা বলছ, কিন্তু তুমি যে চোর কিংবা খুনি নও, তা আমি তোমাকে দেখেই বুঝেছি। খেয়ে যাও।

বিক্রম ওমলেটটা খেয়ে ফেলল একসঙ্গে। চা শেষ করল তিন চুমুকে। যেন তার খুব তাড়া।

বারান্দা থেকে নেমে গিয়েও সে আবার ফিরে এসে বলল, জায়গাটা এখন বেশ হট, মানে উত্তপ্ত হয়ে আছে। চতুর্দিকে স্পাই। আপনাদের কাছেও আমড়াগাছি করতে আসতে পারে। আপনারা সহজ ব্যবহার করবেন। যদি জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবেন এখান থেকে, বলবেন, ভালো পাহাড়ে কমল চক্রবর্তীর কাছে বেড়াতে যাচ্ছি।

জয়ী বলল, ভালো পাহাড়?

বিক্রম মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল।

আরও এক কাপ চা খেতে খেতে হেমকান্তি বললেন, জানো জয়ী, এখানে একটা গানের বই দেখলাম। তার একটা গান, সুরটা আমার মনে পড়ে গেল। স্থানীয় পল্লিগীতি। সেটার সুর তুলেছি। তার মানে, আমি এই অঞ্চলে বেশ কিছুদিন ছিলাম।

জয়ী বলল, শুনি গানটা।

হেমকান্তি গাইলেন।

আমার মনের মাধুরী
সেই বাংলা ভাষা করবি কে চুরি?
আকাশ জুড়ে বৃষ্টি নামে...

জয়ী বলল, মাধুরী শব্দটা পল্লিগীতির পক্ষে একটু যেন বেশি বেশি। অনেক আধুনিক কবিও এখন ফোক সঙ লেখে। এই পুরুলিয়া জেলাটা বোধহয় একসময় বিহারে চলে যাবার কথা উঠেছিল। তখনই বাংলা ভাষা নিয়ে আন্দোলন হয়। তুমি তো এসব কিছুই জানো না?

হেমকান্তি বললেন, শুধু মনে আছে একটা গানের সুর। একটু গান গাইতে

পারলেই মনটা ভালো লাগে।

আর কিছু গান মনে পড়ল?

না।

তা হলে ওই গানটাই আবার গাও।

হেমকান্তি চুপ করে রইলেন।

সন্ধে হয়ে গেছে, বারান্দাটা অন্ধকার। কিন্তু এ তো আর চন্দননগরের সেই বাড়িটির বারান্দা নয়। এখান দিয়ে যাতায়াত করছে লোকজন। একজন পুট করে সুইচ টিপে একটা আলো জ্বেলে দিয়ে গেল।

জয়ীর বাহু ছুঁয়ে একটু পরে হেমকান্তি বললেন, একটা দিন শেষ হয়ে গেল। অনেকখানি লম্বা রাত। তারপর আবার সকাল হবে। আবার দিন, এইভাবে চলবে দিনের পর দিন। আমি কিছুই করব না, আমার কোনও যোগ্যতা নেই, আমি শুধুই বসে থাকব! জয়ী, তোমার তবু অনেক কাজ আছে। কিন্তু আমার... কী ব্যর্থ এই জীবন!

জয়ী ওঁর সেই হাতটা ছুঁয়ে বলল, মোটেই ব্যর্থ নয়। আমরা দু'জন দেশে দেশে ঘুরব। অনেক দেশ, দেখব অনেক মানুষ। কোথায় থামব জানো? যেদিন, মানে যখন তুমি চাইবে, আমার চাওয়ার সঙ্গে তোমার চাওয়া মিলে যাবে, তখন আমার পেটে একটি সন্তান আসবে। অল্প বয়েসে কী ভুলই করেছি। ধরো, তুমি আমি এই পৃথিবীতেই জন্মেছি, এই মাটিতেই বড় হয়েছি, যা কিছু খেয়েছি, সবই তো এই মাটির রস। তার বদলে কিছু দিয়ে যাব না? দু'জনে মিলিতভাবে অন্তত একটা প্রাণ? আমার খুব ইচ্ছে করে।

হেমকান্তি বললেন, সেও যদি আমার মতন ব্যর্থ হয়? কী করলাম আমি এই জীবনটা নিয়ে?

আবার ওই কথা বলছ? নিশ্চয়ই কিছু ভালো কাজ করেছ। আরও অনেকটা জীবন বাকি আছে। হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমাকে আমি এখন থেকে কী বলে ডাকব? ফুলকাকা কেমন যেন বোকা বোকা শোনাবে। আর সিন্দবাদ, সেও তো প্রতিদিনের জীবনের নয়, সে মাঝে মাঝে ঘুরে-ফিরে আসে। সেইভাবেই তাকে মানায়। তোমার সুবিধে আছে, তুমি আমাকে আগের মতনই জয়ী বলবে।

তুমিও আমার নাম ধরে ডাকো।

তা কি পারব? এত দিনের অভ্যেস, বাধোবাধো লাগবে। তবু, সেটাই বোধহয় ভালো। দেখি তো কেমন শোনায়। হেম, হেম...

জয়ী, ঠিক করে বলো তো, তুমি আমাকে দয়া করছ না তো? আমার জন্য সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে চলে এলে—

তোমার জন্য আসিনি, হেম। এসেছি নিজের জন্য। শোনো, কাল যে ওই ছেলেটির সঙ্গে যাব, ছেলেটি বিশ্বাসযোগ্য তো?

বলল তো ঝিল্লির বন্ধু।

তুমি জানো না, পৃথিবীটা এখন কী সাংঘাতিক অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। মানুষের জীবনের কোনও দামই নেই। দয়া, মায়া, স্নেহ সব লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কত রকম ছুতো, আদর্শ, ধর্ম, বিপ্লব, প্রতিহিংসা, তাতে মরছে শুধু নিরীহ মানুষ। প্রত্যেকদিন!

আমার তো, কী বলব, মরতে আর ভয় করে না।

ওরকম কথা আর বলবে না খবরদার। আমরা বেঁচে থাকব। এইসব হিংস্রতার প্রতিবাদ করে জীবনটাকে নিজস্বভাবে সুন্দর করে নেব।

রাত্রে আর জয়ী অন্য ঘরে গেল না। রাত্রি কেটে গেল মিলনে। মিলন, তবু এ যেন শরীরের যুদ্ধ। হেমকান্তি এর কতদিন আগে কোনও নারীর শরীরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তা মনে নেই। এ যেন নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন ভাবে শরীর চেনা। আর জয়ীর যেন কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। একবার শেষ হতেই সে আবার শুরু করে।

অনেকক্ষণ পর দু'জন দু'জনকে দৃঢ় আলিঙ্গন করে শুয়ে রইল। স্বেদ মাখা শরীরে। লোডশেডিং, পাখা চলছে না, তবু ঘুম হল নিঃসাড়ে।

ভোরবেলা বিক্রম আসার আগেই হেমকান্তিকে নিয়ে তৈরি হয়ে নিল জয়ী।

বিক্রম এল কাঁটায় কাঁটায় ছ'টায়। একটা জিপগাড়ি এনেছে। তার গায়ে গত কালের পোশাক।

সে সামনের সিটে বসে আলাপ করিয়ে দিল। গাড়ি চালাচ্ছেন আমার বন্ধু বিমল মাহাতো। যেমন ভালো গাড়ি চালান, তেমন চমৎকার গান করেন। আপনাদের কাছে কাল পুলিশ এসেছিল?

জয়ী বলল, না।

বিক্রম বলল, আপনাদের তো কিছুটা বয়েস হয়েছে। অল্প বয়েসি ছেলেমেয়ে দেখলে ছাড়ত না। এখানকার পুলিশ তো এখন ভয়ে কাঁপছে। রাত্তিরে পেচ্ছাব করতেও বাইরে বেরোয় না। বাইরে থেকে কেউ এলে

উদোরপিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে তাদের আটক করে। কী, ঠিক বাংলা বলছি তো আজ?

জয়ী বলল, কেন, বাংলা বলবে না কেন? তোমার বাড়ি কোথায়?

বিক্রম বলল, বাড়ি এদিকেই। কিন্তু কলকাতায় পড়তে গেলাম তো, পাছে মফস্‌সলের ছেলে বলে কেউ নাক সিঁটকোয়, তাই ফরফর করে ইংরিজি বলা প্র্যাকটিশ করে নিলাম। কিছুদিন একটা কলেজেও মাস্টারি করেছি। সেখানে তো ইংরিজি না বললে কেউ পাত্তাই দেয় না। বাংলার মাস্টাররাও ইংরিজি বলে।

তোমার কী সাবজেক্ট?

পল সায়েন্স। ফালতু ব্যাপার। সব ভুল থিয়োরি। আপনারা দু'জনেই খুব শিক্ষিত মানুষ, আমি জানি। মানে, তথাকথিত শিক্ষিত। আমি কিন্তু মাঝে মাঝে আলটু-ফালটু বকব।

ফস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে সে বলল, আমরা বান্দোয়ান আর দুয়ারসিনি হয়ে যাব ঝাড়খণ্ডের গালুডির দিকে। দুয়ারসিনিতে একবার থামব। ইচ্ছে করলে সেখানেই রাত কাটাতে পারি। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কটেজ আছে। অথবা চলে যেতে পারি ভালো পাহাড়। সেখানে কবি কমল চক্রবর্তী কত যে গাছ লাগিয়েছেন! দেড়-দু' লাখ তো হবেই। গাছগুলো বড় হচ্ছে এখন। সেখানেও থাকার ব্যবস্থা আছে অতিথিদের। পরদিন আমরা চলে যাব আমলি নদীর ধার দিয়ে, আরও খানিকটা দূরে ডাঙ্গরজোরি গ্রামে।

জয়ী বলল, এসব কী বলছ তুমি? আমরা অত জায়গায় যেতে চাই না। আমরা বান্দোয়ান-দুয়ারসিনি ঘুরে আজই ফিরে যাব।

বিক্রম বলল, মহাশয়া, আমার পাল্লায় পড়েছেন। এখন আমি যেখানে নিয়ে যাব, সেখানেই যেতে হবে। কী বিমলদা, তাই না?

নীল জামা পরা বিমল মাহাতো ঝকঝকে দাঁতে হাসল।

জয়ী বলল, তুমি আমাকে ভয় দেখাতে চাইছ? আমাকে চিনতে তোমার এখনও দেরি আছে।

বিক্রম বলল, আপনাকে চেনার স্পর্ধা আমি করি না। জানি, আপনার একটি ভ্রূভঙ্গিতেই ভূমিকম্প ঘটে যেতে পারে। ইউ আর একসেপশনাল। আমি চিনতে চাইছি হেমকান্তি লাহিড়ীকে। উনি আমার সাবজেক্ট। উনি তো একটাও

কথা বলছেন না! স্যার, আপনার কাছে একটা প্রশ্ন আছে। আপনি বান্দোয়ান যেতে চাইছেন কেন?

হেমকান্তি বললেন, বান্দোয়ান, দুয়ারসিনি নামগুলোতে কেমন যেন ঝংকার আছে। না, সেজন্য নয়। বেড়াতেও নয়। ওখানে এক জায়গায় বরুণদা খুন হয়েছিলেন। আই ওয়াজ সাপোজড টু বি প্রেজেন্ট দেয়ার। অনেকে বলছে, সেখানে গেলে হয়তো আমার সব কথা মনে পড়ে যেতে পারে। আমার ভূমিকা কী ছিল...

বিক্রম তার রোগা কাঁধের দু'দিক ঝাঁকিয়ে বলল, স্টুপিডের মতন কথা। সেই স্পটটা কোথায় ছিল এখন কে বলতে পারবে? আমি যদি একটু দূরে গাড়িটা থামিয়ে বলি, এই সেই জায়গা! একই রকম ঝোপঝাড়। কোনও তফাত নেই। আমি সে-জায়গাটা, একজ্যাক্টলি, মানে ঠিক ঠিক জায়গাটা দেখেছি, কারণ আমি রিসার্চ করছি, কিন্তু সে অঞ্চলটার সঙ্গে এখানকার কোনও তফাত নেই।

জয়ী বলল, তোমার এখন এইসব কথা বলা উচিত নয়। অ্যাকচুয়াল স্পটে গিয়ে দাঁড়ালে অন্য রকম অনুভূতি হতেই পারে।

বিক্রম বলল, নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে নিয়ে যাচ্ছি।

নির্জন রাস্তা, গাড়িঘোড়া নেই, মানুষ নেই। অর্ধস্ফুট সূর্যরশ্মি আছে, বাতাস আছে, মেঘলা আকাশ আছে। গাছগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় সবুজের স্রোত। অতি অকিঞ্চিৎকর দু'-একটা ছিরছিরে নদী, যেন মূর্তিমতী নির্জনতা। পাথরের নুড়িগুলোর ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে নাম-না-জানা সরু সরু পাখি।

দিগন্তে পাহাড়ের রেখা।

এখানকার মানুষ হয়তো সারাদিনে একবারও পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখে না। কিন্তু সমতলের মানুষ পাহাড় দেখলেই অন্তত প্রথম কিছুক্ষণ উদ্‌বেল হয়ে ওঠে।

তা ছাড়া ওই দলমা পাহাড়ের সারি থেকে প্রায়ই নেমে আসে হাতির পাল। এই হাতি সম্পর্কেও সমতলের মানুষের কিছুটা রোমাঞ্চকর ধারণা আছে। যেন এরা চলচ্চিত্রের প্রাণী। কিন্তু এই হাতিরাই যে এইসব অঞ্চলে কী ধ্বংসলীলা চালায়, কিছু কিছু প্রাণও হরণ করে, তা সমতলের মানুষ ঠিক অনুভব করে না। বাস্তবের হাতির পাল সম্পর্কে কোনও রোমাঞ্চ নেই।

একটা নিরিবিলি চায়ের দোকানের সামনে জিপটি আপনিই থেমে গেল।

কাছাকাছি কোনও বসতি নেই, কারা এই দোকানের খদ্দের? কয়েকটা বাঁশের খুঁটি, খড় ও ছেঁড়া তেরপল দিয়ে তৈরি দোকানঘরটি যেন সুকুমার রায়ের বুড়ির বাড়ির মতন নড়বড়ে। দোকানটি চালাচ্ছেনও এক শতকুঞ্চিত মুখের বৃদ্ধা মহিলা।

জিপ থেকে নেমে বিক্রম জয়ীদের বলল, এ দোকানের চা বিশ্ববিখ্যাত। চিনি দিয়ে খাবেন তো?

জয়ী মাথা নাড়ল। যদিও তার মন বলছে, সে যখন এই জিপটির ভাড়া দেবে, তখন এটা কখন কোথায় থামানো হবে. সে ব্যাপারে তার অভিমত নেওয়া বাঞ্ছনীয়। ছেলেটি ওভার স্মার্ট বলে একটু বাড়াবাড়ি করছে।

তবু সে বিরক্তি গোপন করে বলল, হ্যাঁ, চা খেলে ভালোই হয়।

এই প্রথম বিক্রম বেশ বিনীতভাবে বলল, দেখুন, আমি যে ভদ্রতা করে চায়ের দাম দেব, সে ক্ষমতাও আমার আপাতত নেই। আপনাদেরই দিতে হবে।

জয়ী বলল, এ আবার একটা কথা হল, সামান্য চা।

বিক্রম বলল, আমি এক প্যাকেট সিগারেটও নিচ্ছি। দামের সঙ্গে জুড়ে দেবে।

জয়ী এর উত্তর দেবারও প্রয়োজন বোধ করল না।

ধোঁওয়ার গন্ধওয়ালা চা-তে মূল চায়ের কোনও স্বাদই নেই। তবু হেমকান্তি চুমুক দিয়ে বললেন, বাঃ!

আগে বোঝা যায়নি, সেই ঝুপড়ি দোকানের মধ্যেই বসেছিল দু'জন যুবক। তাদের কাঁধে রাইফেল।

তারা বেরিয়ে এসে টপাটপ উঠে পড়ল জিপে।

জয়ীদের হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, আপলোগ কাঁহা যাতে হো?

জয়ী আঙুল তুলে বলল, ওই সামনের দিকে।

একটি যুবক সামনে ঝুঁকে এসে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, কাঁহা?

জয়ী বলল, যে-দিকে দু'চোখ যায়?

বুঝতে না পেরে যুবকটি জিজ্ঞেস করল, কেয়া?

জয়ী বলল, এর বেশি আমি আর কিছুই বলব না। হু আর ইউ?

যুবকটি ধমক দিয়ে বলল, দ্যাটস নান অফ ইয়োর বিজনেস। আনসার মাই কোয়েশ্চেন?

জয়ী তার চোখের দিকে তাকিয়ে আরও ধমকের সুরে বললেন, আই রিফিউজ টু আনসার ইয়োর কোশ্চেন। আমরা যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাব। তোমরা নামো এই গাড়ি থেকে!

বিক্রম হিসি করতে রাস্তায় পাশে নেমে গিয়েছিল, ছুটে এসে যুবক দুটির সঙ্গে উত্তেজিতভাবে কীসব কথাবার্তা শুরু করল।

একটু বাদেই যুবক দুটি নেমে গেল জিপ থেকে।

বিক্রম উঠে পড়ে বলল, দিন কুড়িটা টাকা। বিমলদা, চলো।

তারপর সে বলল, জয়ীদেবী, আপনি ছেলেদের সঙ্গে অমন ধমকে কথা বলছিলেন, ওরা যদি গুলিফুলি চালিয়ে দিত?

জয়ী ঠোঁট উলটে বলল, আই কেয়ার আ ফিগ! যদি মরতেও হয়, তবু র‍্যাশনালিটি আর আত্মসম্মানবোধ হারাব না কিছুতেই।

বিক্রম বলল, এখন ওদের সকলেরই খুব মাথা গরম।

জয়ী এবার ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, এরা বুঝি তোমাদের বিপ্লবী? এই রাস্তা দিয়ে যারা যাবে, তাদেরই আটকাবে? এটা কি মুক্তাঞ্চল হয়ে গেছে নাকি?

বিক্রম বলল, প্রায় তাই। ধরুন, এই রাস্তায় কিছুক্ষণ বোমাবাজি হল। তারপর পুলিশ কি সব গাড়ি থামিয়ে জেরা করবে না? তেমনই, রাস্তায় যদি পুলিশ বেশি ঘোরাঘুরি শুরু করে, তা হলে আমাদের ছেলেরাও সব গাড়ি চেক করতেই পারে!

জয়ী বলল, এটা একটা স্বাধীন দেশ। সামরিক শাসন কিংবা স্বৈরাচারী সরকার নেই। কিছু ফুটোটুটো থাকলেও একটা গণতন্ত্র আছে। তার বিরুদ্ধে বিপ্লব করে তোমরা কোথায় পৌঁছোবে? সমাজতন্ত্রের এক্সপেরিমেন্ট ব্যর্থ হয়ে গেছে। তোমাদের চিনও মুক্ত বাজার নিয়ে মেতে উঠেছে। তোমরা কোথায় যেতে চাও? শুধু তো সাধারণ মানুষ আর পুলিশদের মারছ!

বিক্রম বলল, মহাশয়, অত বড় বড় কথা বলার দরকার নেই। এখানে থানা-পুলিশ, পঞ্চায়েতের পেট মোটা লোকদেরই সাধারণ মানুষ মনে করে গভর্নমেন্ট। আর যারা সত্যিকারের সাধারণ মানুষ, তারা রাইটার্স বিল্ডিংস চেনে না, দিল্লির কথাও কিছু জানে না। নিজেদের সব দুঃখ-দুর্দশা, আর অত্যাচারের জন্য এই পুলিশ-পঞ্চায়েতকেই দায়ী করে। তাই এদের ওপর আঘাত হানাই বিপ্লবের প্রাথমিক পদক্ষেপ। এ ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই।

জয়ী বলল, পুলিশ মারবে, রাস্তায় মাইন পুঁতে নিরীহ মানুষদের মারবে।

তারপর একসময় আর্মি নামবে। তখন তোমরা কে কোথায় থাকবে, তা জানি না। যে-ক'জন বাঁচবে, তাদের বয়েস হবে। এই তোমাদের আগের জেনারেশনের মতন যখন তোমাদের পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বয়েস হবে, তখন তোমরাও বলবে, আমাদের ভুল হয়েছিল। পথটা ঠিক ছিল না। তাই তো? ততদিনে হাতের রক্ত ধুয়ে ফেলতে পারবে?

জয়ীর দাপটের কথার উত্তরে বিক্রম প্রথমে একটু মিনমিন করছিল। হঠাৎ গলার জোর ফিরিয়ে এনে বলল, আমাদের আগের জেনারেশনের কথা বলছেন? ওঁদের তো বুক ভরা ছিল বাষ্প। কোনও প্র্যাকটিকাল সেন্স ছিল না। 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান', মাথায় একটু ঘিলু থাকলে কেউ এ-কথা বলে? দুঃখিত, ওঁদের মাথায় ঘিলু ছিল ঠিকই, অনেকেই খুব ব্রাইট, কিন্তু টোটালি মিস গাইডেড। চিনের প্রচারের ফাঁদে ওঁরা পা দিয়েছিলেন। এখন, দে আর আ হোপলেস জেনারেশন!

জয়ী বলল, তোমরা তো নিজেদের বলো মাওবাদী।

সেটা একটা পন্থা। ব্যক্তি মাওয়ের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।

হেমকান্তি আপন মনে হেসে উঠলেন।

সতেরো

বিক্রম ঠিকই বলেছিল।

জিপটা যেখানে থামল, একটা টিগির সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, এখানে সেখানে ঝোপ, সে স্থানটির আলাদা কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। এখানেই মৃত্যু হয়েছিল বরুণদার। যদি বিক্রমের কথা সত্যি হয়।

হেমকান্তি সেখানে নেমে হাঁটলেন কিছুক্ষণ। কিছুই ভাবান্তর হল না। কোনও আলোড়ন হল না স্মৃতিতে।

একটা পাথরের ওপর বসে সিগারেট টেনে যাচ্ছে বিক্রম।

জয়ীও ঘুরতে ঘুরতে একসময় উঁচু গলায় জিজ্ঞেস করল বিক্রমকে, একটু দূরে দেখছি অনেক গাছের ডাল ভাঙা। তার মানে কী।

বিক্রম বলল, যা ভাবছেন, ঠিক তাই। হাতি এসেছিল। এখনও আশেপাশে থাকতে পারে। হেমকান্তি লাহিড়ী কি কিছু মনে করতে পারলেন?

হেমকান্তি বললেন, নাঃ!

বিক্রম বলল, এখানে আমরা বেশিক্ষণ বসব না। হাতির ভয় আছে, সেটা হালকাভাবে নেওয়া যায় না। এখানে ঠিক ঠিক কী ঘটেছিল, তা আমি বলে দিচ্ছি শুনে নিন। আমি গবেষণা করছি, আমি এখানে অনেকবার এসেছি। এটা আমারই জায়গা, অনেক লোককে জিজ্ঞেস করে একটা ইতিহাস তৈরি করেছি। পুলিশও ততটা জানে না।

হেমকান্তি আর জয়ী ওর কাছাকাছি চলে এল।

বিক্রম বলল, বরুণ ঘোষ দস্তিদারের মার্ডার একটা ক্লোজ চ্যাপ্টার। বিয়ন্ড এনি ডাউট, মানে, কোনও সন্দেহই নেই, তাঁকে মেরেছে নিরঞ্জন মাহাতো। সে ছিল একজন মার্সিনারি, এখন যাদের অনেকে বলে সুপারি কিলার। এক হিসেবে এটাকে ইনসাইড জবও বলা যায়। ওঁদেরই আর একটি ফ্যাকশন, তাদের নেতা অরিন্দম ভেবেছিলেন, তাঁর ভাই সুপর্ণকে যে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে মারে, সেটা বরুণ ঘোষ দস্তিদারের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই। যদিও তার সত্যি-মিথ্যে বিষয়ে কেউ নিশ্চিত নয়। তখন এইরকম পরস্পরের প্রতি উদ্দাম দোষারোপ চলছিল। নিরঞ্জনকে দেওয়া হয় সাত হাজার টাকা মাত্র। নিরঞ্জন প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে ইন ক্যামেরা স্বীকার করেছে। হেমকান্তিবাবু, আপনি ক্লিয়ার।

হেমকান্তি বললেন, আমার কাছে নাকি একটা রিভলভার ছিল?

বিক্রম বলল, তা থাকতে পারে। কিন্তু বরুণদা মারা গেছেন রাইফেলের গুলিতে। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে তাই আছে। আপনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু আপনি তাঁকে বাঁচাবেনই বা কী করে? আপনার তখন সাংঘাতিক জ্বর। এখানকার মশা। ভালো করে দাঁড়াতেই পারছেন না। তা ছাড়া, আপনি কি শুটিংয়ের ট্রেনিং নিয়েছিলেন নাকি? দু'-চারটে গুলিফুলি চালিয়েছিলেন বটে নিরঞ্জনের দিকে। একটাও ওর লাগেনি। বরং আপনারই পাছায় একটা গুলি লেগেছিল।

জয়ী বলল, পায়ে গুলি লাগেনি?

বিক্রম বলল, না। পাছায়। জসিডি শহরের এক ডাক্তার সেই গুলি বার করে দেন।

হেমকান্তি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে বললেন, জসিডি, জসিডি! বিক্রম, প্লিজ বলবে, জসিডিতে আমি আর কী করেছি?

বিক্রম বলল, আর কী করেছি মানে? তিন মাস ছিলেন সেখানে।

হেমকান্তি বললেন, আমি কি, আমি কি, মানে, আমি কি সেখানে ওই ডাক্তারের মেয়েকে বিয়ে করেছিলাম?

বিক্রম ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, বিয়ে করেছিলেন না তাকে সিডিউস করে... তাতে আমি ইন্টারেস্টেড, মানে, আগ্রহী নই। সেটা ইতিহাসের মধ্যে স্থান পাবার যোগ্য নয়।

হেমকান্তি জিজ্ঞেস করলেন, বরুণদার কাছে একটা টাকার থলি ছিল?

বিক্রম বলল, হ্যাঁ, ছিলই তো।

হেমকান্তি বললেন, সে-টাকার থলিটা কে নিল?

আপনি!

আমি?

তা ছাড়া তো আর কারুকে দেখা যাচ্ছে না। নিরঞ্জন নিতে পারেনি, কারণ, আপনি এলোমেলো গুলি চালাচ্ছিলেন। আর পেছন থেকে এসে পড়ল পুলিশ। সে ধরা পড়ে গেল। আপনি ছাড়া টাকার থলিটা নেবার তো আর কেউ নেই!

পুলিশ টাকার থলিটা পায়নি?

না। পুলিশের দলে ছিল সাতজন, একজন ডি এস পি। টাকার থলি সিজ করলে একেবারে চেপে যাওয়া সম্ভব নয়। নিরঞ্জনের বক্তব্যও, বরুণদার কোনও সঙ্গীর ব্যাপারে...

আমি টাকা নিয়েছি? আর কারুকে সে-কথা বলিনি? তার মানে তো চুরি। সে-টাকা নিয়ে আমি কী করলাম?

সেটা আপনাকেই মনে করতে হবে! তবে, আপনি তখন আহত, গুলি লেগেছে, এদিকে খুব জ্বরে শরীর দুর্বল, খুব সম্ভবত আপনি তবুও টাকাটা নিয়ে বুকে হেঁটে হেঁটে একটা ঝোপে ঢুকে পড়ে পুলিশের চোখ এড়িয়েছিলেন। নইলে পুলিশই টাকাটা ঝেঁপে দিত।

হেমকান্তি দু'হাত ঝাঁকিয়ে বিকট চিৎকার করে বলতে লাগলেন, বিক্রম, আমাকে জানতেই হবে। সে টাকাটা নিয়ে আমি কী করলাম? খরচ করেছি ইচ্ছেমতন? আমাদের কষ্টের সঞ্চয় করা টাকা?

বিক্রম তবু শান্তভাবে বলল, আমার রিসার্চে এখানে কিছুটা গ্যাপ আছে। আর আমার বাবা সম্পর্কে কোনও তথ্যই নেই। পুলিশ সব গাপ করে দিয়েছে।

হেমকান্তি, আপনি এক হিসেবে ভাগ্যবান। আপনার স্মৃতি নেই, তাই অনেক তিক্ততাও নেই। কিন্তু আপনি বেঁচে আছেন। বেঁচে থাকাটাই একটা শিল্প। মৃত্যুর মধ্যে কোনও শিল্প নেই। বিচ্ছিরি ধরনের শূন্যতা।

আবার জিপ স্টার্ট দেবার পর বিক্রম বলল, এখন কমলদার ভালো পাহাড়ে যাওয়া যাবে না। ফেরার পথে দেখা যাবে। আগে আমরা ডাঙ্গোরজোরি যাব।

জয়ী বলল, কেন সেখানে আমাকে যেতে বলছ বিক্রম, তা জানতে পারি?

বিক্রম বলল, এটা অনেকটা আমারই গবেষণার প্রয়োজনে বলতে পারেন। সেখানে আমি একজনের সঙ্গে কয়েকবার কথা বলার চেষ্টা করেছি, তিনি কিছুতেই উত্তর দেননি। আমি দেখতে চাই, তিনি আপনাদের সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করেন। আমার একটা হান্চ আছে, হান্চ মানে কী, সন্দেহ কিংবা গুপ্ত ধারণা, দেখি, সেটা মেলে কি না।

জয়ী বলল, বিক্রম, আমরা আজই ফিরতে চাই।

বিক্রম বলল, ফিরবেন, ফিরবেন। কিংবা, আচ্ছা দেখা যাক!

খানিকটা যাওয়ার পর জয়ী জিজ্ঞেস করল, বিক্রম, তোমাদের এই যে বনেজঙ্গলে বিপ্লবী ছেলেমেয়েরা সংগঠিত হচ্ছে, এঁদের নেতা কে? সেরকম তো কারুর নাম শুনতে পাই না।

বিক্রম বলল, ওই তো আপনাদের এক দোষ। টিপিক্যাল বুর্জোয়া বিলাস। সবসময় নেতা খোঁজেন। ওনাদের সময় কয়েক জনের নাম খুব ছড়িয়েছিল। কে কী রকম নেতা ছিলেন জানি না, নামটাই শুনেছি। চারু মজুমদার, জঙ্গল সাঁওতাল, কানু সান্যাল, সুশীতল রায়চৌধুরী, সরোজ দত্ত, তাই না? এঁদের কার কতটা সংগঠন ক্ষমতা ছিল? পরবর্তীদের উদ্‌বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন? সেটাই তো বড় কথা। বুদ্ধ, মানে অরিজিনাল বুদ্ধ, গৌতম বুদ্ধ তাঁর মৃত্যুর আগে কী বলেছিলেন, জানেন? বলুন, জানেন? তা হলে আমি আর রিপিট করব না।

জয়ী বলল, না, ঠিক জানি না।

বিক্রম বলল, গৌতম বুদ্ধ যখন মৃত্যুশয্যায় তখন তাঁর শিষ্য আনন্দ জিজ্ঞেস করলেন, প্রভু, আপনি যখন থাকবেন না, তখন আমরা পথ নির্দেশের জন্য কার কাছে যাব? অতকাল আগে, এই অসাধারণ মানুষটি বললেন, আত্মদীপো ভব, আত্মশরণো ভব, অনন্যো শরণো ভব। অর্থাৎ, নিজেকে প্রদীপ করে তোলো। সেই আলোয় নিজের পথ খুঁজে নাও। অন্যের শরণ নিয়ো না।

বুঝলেন তো। বুদ্ধ কোনও গুরু কিংবা নেতার শরণ নিতে বললেন না, ঈশ্বরের তো প্রশ্নই ছিল না। শুধু বললেন, নিজেকে প্রদীপ করে তোলো, সেই আলোয় নিজের পথ খুঁজে নাও! আমরা নিজেদের সেই প্রদীপ করে তোলার সাধনাই করে যাচ্ছি।

হেমকান্তি বললেন, শ্লোকটা আমাকে লিখে দিয়ো তো! আমি মুখস্থ করব।

ডাঙ্গোরজোরি একটি ছোট সাঁওতালি গ্রাম। মুরগি আর শুয়োর রয়েছে বাড়িতে বাড়িতে। এমনকী রাস্তাতেও তারা ঘুরে বেড়ায়। রাস্তা? শুকনো নদীর খাতের সঙ্গে কোনও তফাত নেই। নানা আকারে পাথর ছড়ানো, মাঝে মাঝে বিরাট বিরাট গর্ত। অন্য গাড়ির তো প্রশ্নই নেই, জিপটাও মাঝে মাঝে এমন হেলে যাচ্ছে যে ভয় হয়, যে-কোনও মুহূর্তে উলটে যাবে। হেমকান্তি আর জয়ী শক্ত করে ধরে আছেন ওপরের লোহার রড।

সেই গ্রাম শেষ হয়ে গেল, তবু জিপটা থামল না।

একবার একটা বড় পাথরে ধাক্কা লেগে গাড়িটার স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল।

জয়ী বলল, এ কোথায় আমাদের নিয়ে চলেছ বিক্রম?

বিক্রম বলল, যে-দিকে দু'চোখ যায় বলেছিলেন না? দেখুন দেখুন, ভালো করে দেখুন! এই হচ্ছে উন্নয়নশীল পশ্চিম বাংলার গ্রাম। এখানে চাষবাসও হয় না।

জয়ী বলল, এ-রাস্তায় গাড়ি চলে বলে তো মনে হয় না!

বিক্রম বলল, এখানে কে আসবে যে গাড়ির রাস্তা তৈরি থাকবে? কেউ আসে না। আদিবাসীদের গ্রাম বলে এখানকার কথা কেউ মনেও রাখে না। আপনাদেব আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদ না কী যে আছে না? তারাও আসে না! তারা যায় ঝাড়গ্রাম। খবরের কাগজ-পড়া লোকে ভাবে ঝাড়গ্রামটাও বুঝি একটা গ্রাম।

জয়ী বলল, যথেষ্ট দেখা হয়েছে, এবার ফেরো।

বিক্রম বলল, আর একটুখানি। ভয় নেই, বিমলদা দারুণ গাড়ি চালায়।

বিমল কয়েকবার স্টার্ট দেবার চেষ্টা করে বলল, নামতে হবে।

বিক্রম বলল, সবাই নামুন, গাড়িটা একটু ঠেলে দিন।

নামার পর হেমকান্তি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন চতুর্দিকে। পাহাড় ও রুক্ষ প্রকৃতির এরকম ছবি ক্যালেন্ডারের পাতায় থাকে। সেই ছবিতে মানুষের ক্ষুধা ও বেঁচে থাকার লড়াইয়ের কোনও চিহ্ন ফোটে না।

আগের রাত্তিরে বেশ বৃষ্টি হয়েছে, পাথরের ফাঁকে ফাঁকে জমে আছে কাদা। জয়ী শাড়ি গুটিয়ে নিল।

তারপর সে বলল, বিক্রম, তোমাকে আর হাত লাগাতে হবে না। এই তো ল্যাকপেকে চেহারা! আমরা দু'জনেই পারব!

বিক্রম বলল, আমার এই রোগা চেহারাতেই কত শক্তি, তা জানেন না। রাজ্য জয় করতে পারি। নিন, ঠেলুন!

জিপটাকে প্রথমে খানিকটা পিছিয়ে এনে তারপর আবার সামনে ঠেলে পার করানো হল একটা খাদ। জিপটা আবার সশব্দ হলেও ওরা হেঁটেই গেল খানিকটা।

তারপর রাস্তাটা খানিকটা ভদ্রগোছের আকৃতি পেল। পাথরই ভেঙে ভেঙে টুকরো করে ভরাট করা হয়েছে গর্ত। বোঝা যায়, স্থানীয় প্রচেষ্টা। একটা গোরুর গাড়ি আসছে উলটো দিক থেকে।

একটু পরে হঠাৎই দেখা গেল একটা কাঠের গেট। এই 'গেট'-এর বাংলা ঠিক 'দরজা' নয়। দু'দিকে শালকাঠের দণ্ডের ওপর চৌকো একটা মাচা। দরজার পাল্লা নেই। সেই মাচায় একটা টিনের বোর্ডে লেখা : বিদ্যারম্ভ মঠ। অধ্যক্ষ স্বামী নিবিড়ানন্দ।

বিক্রম বলল, এখানে একটা সিগারেট টেনে নিই। ভেতরে বোধহয় ধূমপান করতে দেবে না।

জয়ী বিস্মিতভাবে বলল, আমরা এই মঠে যাব কেন? আমাদের কোনও আগ্রহ নেই।

বিক্রম তির্যকভাবে বলল, আপনি কি ভেবেছেন, আমারই ঠাকুর-দেবতায় মতি আছে? বললাম না, আমি এসেছি রিসার্চের কাজে। কথা বলতে হবে, ওই স্বামী নিবিড়ানন্দের সঙ্গে। উনি আসলে নিগূঢ়ানন্দ, কিছুতেই কথা বলতে চান না। আমাকে পাত্তাই দেননি। দেখা যাক, আপনাদের মতন ভদ্দরলোক এলে কী করেন।

কাঁচা মাটির সরু রাস্তা। দু'পাশে বেগুন ও ঢ্যাঁড়শের চারা, কিছু কিছু ফলেছে, কিছু চারায় সদ্য ফুল ধরেছে। ফুল থাকলেও একে বাগান বলা যাবে না। তরকারির খেত।

পথের শেষে কয়েকটা খড়ের চালার ঘর। দূর থেকে দেখা যায়, উঁচু বেদির ওপর একটা মনুষ্যাকার মূর্তি, সেটি যে শ্রীরামকৃষ্ণের তা বুঝতে বেশ কষ্ট হয়।

দশ-এগারোটি শিশুর মাঝখানে চাটাই পেতে বসে আছেন একজন স্থূলকায় মানুষ, মুখ ভরতি দাড়ি-গোঁফ, মাথায় নারীদের মতন লম্বা চুল। চোখে চশমা। অঙ্গে গেরুয়া।

প্রথমে আগন্তুকদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। ধীর স্বরে কী যেন পড়াতে লাগলেন বাচ্চাদের। খুব সম্ভবত বাংলা নয়, সাঁওতালি ভাষায়।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর জয়ী ফিসফিস করে বলল, আমাদের এখানে আসা উচিত হয়নি। ওঁকে ডিসটার্ব করা হচ্ছে।

বিক্রম চোখের ইঙ্গিত করে বলল, দেখুন না কী হয়।

আরও সাত-আট মিনিট পড়ালেন সেই সন্ন্যাসী। তারপর একটি বাচ্চার পিঠে চাপড় মেরে বললেন, যাঃ! এবার গিয়ে গাছে ওঠ!

বাচ্চারা কলস্বরে ছুটে চলে যাবার পর তিনি বেশ কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন এই তিনজনের দিকে।

তারপর বেশ স্বাভাবিক গলাতেই জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, হেম, কেমন আছিস?

হেমকান্তি হকচকিয়ে গিয়ে তাকালেন জয়ীর দিকে।

সন্ন্যাসীর ওই প্রশ্নের সবাই হতচকিত! প্রথমে মনে হয়, ওঁর অলৌকিক ক্ষমতা আছে, আগন্তুকদের দেখেই তাঁদের পরিচয় জানার ক্ষমতা।

সন্ন্যাসী একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, একটু ধর তো। হাঁটুতে ব্যথা, উঠতে কষ্ট হয়। তোরা আমার সন্ধান পেলি কী করে?

জয়ী জিজ্ঞেস করল, আপনি এঁকে চেনেন?

সন্ন্যাসী বললেন, চিনব না কেন? ও আমাকে চেনে না? এত দূর এসেছে।

জয়ী বলল, উনি ঠিক সুস্থ নন। মানে মানসিকভাবে। অতীতের অনেক কিছুই ভুলে গেছেন, মানুষও চিনতে পারেন না। হেম, তুমি কি এঁকে চিনতে পেরেছ?

হেমকান্তি কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, না।

সন্ন্যাসী বললেন, আমাকে এখন চেনা শক্ত, এত গোঁফ-দাড়ি-চুল, চেহারাটাও আগের চেয়ে অনেক ভারী হয়ে গেছে। চলো, ভেতরে যাই। ঘরে বসে কথা বলব। তোমাকেও আমি চিনি, তুমি হেমের ভাইঝি।

তারপর বিক্রমের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই ছেলেটি? তোমাকে বাপু বাইরে বসে অপেক্ষা করতে হবে। আমি এঁদের সঙ্গে কথা বলব, তখন তো তোমার থাকা চলবে না।

বিক্রম বলল, আমি এঁদের সঙ্গেই থাকব।

জয়ী বলল, ওর নাম বিক্রম। আমাদের সঙ্গে করে এনেছে। খুব ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার।

সন্ন্যাসী বললেন, ওই জঙ্গলের ছেলেদের কেউ নাকি?

বিক্রম বলল, আপনি কি জঙ্গলের ছেলেদের ভয় পান?

সন্ন্যাসী হেসে বললেন, আমার আবার ভয় কী? ল্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। নাঃ, জঙ্গলের ছেলেদের সঙ্গে আমার বেশ ভাব আছে।

জয়ী বলল, ও একটা রিসার্চের কাজ করছে। এখানকার আন্দোলনের একটা পিরিয়াড নিয়ে। সেইজন্যই আপনার সঙ্গেও কথা বলতে চায়।

বিক্রম বলল, আমার বাবার নাম কার্তিক আচার্য। আপনি কি তাঁকে চিনতেন?

সন্ন্যাসী বললেন, কার্তিক আচার্য, হ্যাঁ, চিনতাম, নিশ্চয়ই চিনতাম।

বিক্রম দারুণ উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, চিনতেন? তাঁর শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল জানেন?

সন্ন্যাসী দু'দিকে মাথা নেড়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, নাঃ! জানি না। সে তো অনেক দিন আগের কথা, তুমি তখন খুবই ছোট, তাই না?

হাঁটতে হাঁটতে একটা ঘরের দিকে এগিয়ে তিনি আবার বললেন, তুমি কার্তিকের ছেলে, এসো আমার সঙ্গে।

শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তিকে প্রণাম করে তিনি ঢুকে গেলেন ঘরের মধ্যে।

কঞ্চির বেড়া দেওয়া মাটির ঘর, ওপরে খড়ের ছাউনি। ভেতরে একটি মাত্র খাটিয়া ছাড়া কোনও আসবাব নেই।

সন্ন্যাসী একটা মাদুর বিছিয়ে দিয়ে বললেন, তোমাদের এর ওপরেই বসতে হবে। আমার একটু উঁচু জায়গা হলে সুবিধে হয়। সবাই মিলে খাটিয়ায় বসলে বোধহয় এটা টিকবে না। অনেক দিন দড়ি পালটানো হয়নি।

তিনজন মাদুরেই বসল।

হেমকান্তি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? তোমার নাম কী?

সন্ন্যাসী কোনও উত্তর না দিয়ে একটু ঠোঁট ফাঁক করে হাসলেন।

বিক্রম বলল, দাঁড়ান, দাঁড়ান। সন্ন্যাসীদের পূর্বনাম বলতে নেই। তাই না। আমি একটা নাম উচ্চারণ করব, সেটাই আমার গেস, মানে অনুমান। আপনি শুধু হ্যাঁ কিংবা না বলতে পারবেন?

সন্ন্যাসী সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

বিক্রম গুলি ছোড়ার মতন বলল, অরিজিৎ সেনগুপ্ত!

সন্ন্যাসী একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ঠিক ধরেছ!

বিক্রম যেন উল্লাস চেপে রাখতে পারছে না। জ্বলজ্বলে মুখে জয়ীর দিকে চেয়ে বলল, দেখলেন, দেখলেন, ঠিক ধরেছি কি না! মিসিং লিংক। এবার সব মিলে যাচ্ছে। আপনার কাছ থেকে আসল ঘটনাটা জানতে হবে।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করলেন, আসল ঘটনা আবার কী?

হেমকান্তি স্পষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করলেন, অরিজিৎ, তুমি কি জানো, আমি বরুণ ঘোষ দস্তিদারকে খুন করেছি কি না?

সন্ন্যাসী কপাল কুঁচকে বললেন, এরকম উদ্ভট কথা কে তোর মাথায় ঢোকাল? বরুণদাকে খুন করেছে এক ভাড়াটে খুনি। কী যেন তার নাম?

বিক্রম বলল, নিরঞ্জন মাহাতো।

সন্ন্যাসী বললেন, হ্যাঁ, ঠিক। সন্তোষ মাহাতো ছিলেন এখানকার এক শ্রদ্ধেয় নেতা। সন্তোষদার বাড়িতে আমি কয়েকবার আশ্রয় নিয়েছি। সেই সন্তোষদার ছোট ভাইটা নষ্ট হয়ে যায়, ডাকাতি-খুন করে বেড়াত।

বিক্রম বলল, এটাও আমি ঠিকই জানতাম।

হেমকান্তি বললেন, বরুণদার কাছে একটা টাকার থলি ছিল। সেটা কে নিল? আমি?

সন্ন্যাসী বললেন, হ্যাঁ, তুই-ই তো নিয়েছিলি।

হেম জয়ীর দিকে তাকিয়ে আর্ত গলায় বললেন, জয়ী, জয়ী, এটা সত্যি? আমি!

বিক্রম বলল, সেই টাকার থলিটাই এখন একটা বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে।

সন্ন্যাসী বললেন, তার আগে জানা দরকার, বরুণদার কাছে সেই টাকাটা ছিল কেন? এখনকার এই জঙ্গলের ছেলেরা জানে না। ওদেরও আগে, সাত-আট বছর আগে, আমাদের দল ভেঙে যাবার পর, আমরা কয়েকজন আর বাড়ি ফিরে যাইনি। শেষ পর্যন্ত বরুণদার সঙ্গে ছিলাম হেম আর আমি। নির্দিষ্ট কোনও প্রোগ্রামে ছিলাম না। আমরা ছিলাম উদ্‌ভ্রান্ত। বরুণদাই ছিলেন সবচেয়ে কনফিউজড। নানান জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে এই অঞ্চলে গরিব মানুষ, আদিবাসীদের মধ্যে সংগঠনের কাজ করছিলাম। অন্য অনেকে সংসারী

হয়েছে, কিন্তু আমি, হেম আর বরুণদা গ্রামের মানুষদের সঙ্গে থাকতাম। তখনই পুলিশের নজর পড়ে আমাদের ওপর। নানা রকম চার্জ দিতে থাকে। একটা খুনের ঘটনার পর পুলিশ আমাকে অ্যারেস্ট করে। যদিও সেটা মোটেই রাজনৈতিক খুন ছিল না। আমিও জড়িত ছিলাম না।

হেমকান্তি জিজ্ঞেস করলেন, আমার নামেও কোনও চার্জ ছিল?

সন্ন্যাসী বললেন, না। এখানে ছিল না। তুই তো আগে একবার জেল খেটে এসেছিস। এখানে তুই আর বরুণদা তখনও ক্লিয়ার ছিলি। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, বরুণদা ওই টাকার থলেটা যক্ষের ধনের মতন আগলে রাখতেন। গ্রামে ঘোরবার সময় কতবার বলেছি, বরুণদা, এটা তো আমাদের টাকা নয়, পাবলিক মানি, এখানকার কাজের জন্য দরকার, তবু বরুণদা কিছুতেই দিতেন না। অদ্ভুত সাইকোলজি। ওই টাকাটা থাকার ওপরেই যেন ওঁর নেতৃত্ব নির্ভর করছে। সবসময় ভয় পেতেন, আমাদেরই পুরনো সহকর্মী কেউ টাকাটা ছিনিয়ে নেবে। একমাত্র বিশ্বাস করতেন হেমকান্তিকে। আমাকেও বিশ্বাস করতেন না।

বিক্রম জিজ্ঞেস করল, শেষ পর্যন্ত টাকাটার কী হল?

সন্ন্যাসী বললেন, বরুণদা তো গুলি খেয়ে বেঘোরে প্রাণ হারালেন। হেমকান্তি কোনওক্রমে টাকার থলিটা নিয়ে পালাল। বেচারি খুবই অসুস্থ ছিল তখন, তার ওপর গুলি লেগেছিল, ও-ও মরে যেতে পারত। আমি তখন পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে বনে বনে ঘুরছি। হঠাৎ হেমকান্তিকে খুঁজে পেলাম।

হেমকান্তি ব্যস্ত হয়ে বললেন, টাকাটা নিয়ে আমি কী করলাম, অরিজিৎ? নিজের চিকিৎসার জন্য খরচ করেছি?

সন্ন্যাসী বললেন, তা যদি করতিস, সেটা কোনও অন্যায় হত না। কিন্তু তখনও আমরা ধরা পড়ার ভয়ে... ঠিক করলাম, দু'জনে দু'দিকে পালাব। সেটাই সুবিধের। একসঙ্গে থাকলে ধরা পড়ার চান্স বেশি। হেম অসুস্থ বলে টাকার থলিটা আমাকে রাখতে দিয়ে যায়। আর আমাদের দেখা হয়নি।

টাকার থলিটা তোর কাছে?

হ্যাঁ। ছিল তো বটেই...

তুই টাকাটা নিয়ে কী করলি?

খরচ করে ফেলেছি। অত টাকা কক্ষনও নিজের কাছে রাখতে নেই। টাকার গন্ধে পর্যন্ত স্বভাব খারাপ হয়ে যায়। ওই যে বাইরে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের

দেখলি, সব টাকা ওদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছি। ও তো ওদেরই টাকা, তাই না?

বিক্রম বলল, পৃথিবীর সব টাকাই খেটে খাওয়া মানুষের টাকা।

হেমকান্তি আর জয়ী চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।

বিক্রম বলল, আমি জানি, হেমকান্তির কিন্তু পুরনো সহকর্মী এখনও এ টাকার ব্যাপারটা নিয়ে খুব চিন্তিত। বাট হোয়াই? ও টাকা তো হারিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক!

হেমকান্তি বললেন, তবু, ও টাকা যদি কেউ নিজের জন্য খরচ করে, আর সেটা গোপন করে যায়, সেটা তো খুবই খারাপ ব্যাপার!

সন্ন্যাসী বললেন, টাকাটা নিয়ে আমি কী করেছি জানিস। একদিন এই গ্রামের লোকদের ডেকে প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে দিয়ে বলেছিলাম, নে, এসব তোদেরই টাকা। মহুল নয়, হাঁড়িয়া নয়, চাষের জন্য সার কিনবি কিংবা বাচ্চাদের জন্য ভেঁপু কিনবি, সে তোদের ব্যাপার, আমি শূন্য হাতে কাজ শুরু করতে চাই।

তারই মধ্যে কীসের যেন শব্দ হল বাইরে। কয়েকবার।

জয়ী চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, ওটা কী?

সন্ন্যাসী বললেন, তক্ষক।

জয়ী ভয়ের চোটে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, সাপ?

বিক্রম বলল, তক্ষক ঠিক সাপ নয়। এক ধরনের গিরগিটি। তবে, এখানে নিশ্চয়ই অন্য সাপ আছে।

সন্ন্যাসী সহাস্যে বললেন, তা আছে। এই বর্ষাকালে সাবধানে থাকতে হয়। সাপ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে, মাটির মেঝে তো, ঘরের চাল থেকেও সাপ ঝোলে। তবে এ পর্যন্ত কিছু তো হয়নি।

বিক্রম বলল, হাতির সঙ্গে যুঝেছি আমরা, সাপ নিয়ে ঘর করি।

জয়ী বলল, ওরে বাবা, সাপের কথা শুনলেই আমার গা শিরশির করে। দেখলে বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাব।

বিক্রম বলল, আমি তো সাপ ধরতেও পারি।

জয়ী বলল, প্লিজ, প্লিজ, অন্য কথা বলো।

কিছুক্ষণ পর জয়ী বলল, আর একটা কথা খুব জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে, যদি কিছু মনে না করেন।

সন্ন্যাসী বললেন, বলো না, যা মনে আসে বলো।

আপনি তো কমিউনিস্ট ছিলেন, এখন সন্ন্যাসী হয়েছেন। আগেও কি আপনার মধ্যে এরকম ধর্মের বিশ্বাস ছিল?

না, জয়া।

আমার নাম জয়ী।

হ্যাঁ, জয়ী, জয়ী। তোমাদের বাড়িতে আমি হেমের সঙ্গে গিয়ে কড়াইশুঁটির কচুরি খেয়েছিলাম মনে আছে। তখন আমি কট্টর নাস্তিক ছিলাম। আর ধর্ম তো জনগণের আফিম। তারপর পুলিশের ভয়ে যখন পালাচ্ছিলাম, তখন দেখলাম, গায়ে খানিকটা গেরুয়া থাকলে অনেক সুবিধে হয়। গ্রামের মানুষ এখনও সাধু-সন্ন্যাসীদের ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। নিজেরা আধপেটা খেয়ে থাকলেও সাধুদের কিছু খেতে দেয়। সেই থেকে শুরু। তবে, একটা সত্যি কথা বলি। প্রথমে গায়ে গেরুয়া চড়িয়ে ভেক ধরেছিলাম। এখন কিন্তু পুরোপুরি ঠিক তা নয়। ধর্মের ওপর বিশ্বাস না হলেও একটা কিছু অতীন্দ্রিয় শক্তির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা জেগেছে। আমি রোজই কিছুক্ষণ ধ্যান করি। মনে বেশ শক্তি পাই।

বিক্রম জিজ্ঞেস করল, আপনি এখানে কতদিন আছেন?

সন্ন্যাসী বললেন, বছর চারেক হবে। প্রথমে ছোট্ট একটা আখড়া খুলে বসলাম। তারপর আস্তে আস্তে এই ইস্কুল। বই পড়েটড়ে আমি ওদের কিছু কিছু চিকিৎসাও করি। বেশ আছি, জানিস হেম! মজে গেছি। আর আমি কোথাও যাব না।

হেমকান্তি বললেন, অরিজিৎ, আমি তোর এখানে থেকে যেতে পারি?

সন্ন্যাসী বললেন, অবশ্যই পারিস। কতদিন?

হেমকান্তি বললেন, তা জানি না। যতদিন ভালো লাগে।

সন্ন্যাসী বললেন, সেটাই ঠিক। কোনওরকম বাধ্যবাধকতা নেই। আমার মতন তোকে জড়িয়ে মড়িয়ে যেতে হবে না। যতদিন মন টিকবে থেকে যেতে পারিস!

হেমকান্তি জয়ীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, জয়ী, আমি যদি এখানে থেকে যাই? যদি কিছু কাজ করতে পারি। যদি বেঁচে থাকাটা সার্থক করা যায়।

জয়ী বলল, থাকো না। আমি কিন্তু থাকতে পারব না। আমার বড্ড সাপের ভয়। বাথরুমেরও ঝঞ্ঝাট আছে। কিন্তু বাইরে যখন বাচ্চাগুলো

পড়ছিল, কী ভালো লাগছিল দেখতে। এত সরল মুখ, খুব ইচ্ছে করছিল আদর করতে।

সন্ন্যাসী বললেন, আমিও তো শহুরে মানুষ, আমারও একসময় খুব সাপের ভয় ছিল। এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। তুমি শীতকালে এসো এখানে বেড়াতে। তখন ওসব উপদ্রব থাকে না। প্রকৃতি অনেক সুন্দর হয়। আমরাও তো জীবন থেকে শহরকে বাদ দিতে পারি না। তুমি শহরের সন্দেশ নিয়ে আসবে আমাদের জন্য।

জয়ী মুখ নিচু করে রইল। আপন মনে বলল, ছোট্ট ছোট্ট মুখগুলো, এত ইচ্ছে করছিল বুকে জড়িয়ে ধরতে।

আশ্রমের মধ্যে ধূমপান নিষেধ।

কিন্তু যাদের এই নেশা প্রবল, তারা বেশিক্ষণ মস্তিষ্কে ধোঁয়া না দিলে উসখুস করতে শুরু করে, অন্যের কথায় মনঃসযোগ করতে পারে না।

বিক্রম এক ফাঁকে উঠে চলে গেছে, এই গ্রামে তার একটি চেনা ছেলে আছে, তার সঙ্গে দেখা করে আসবে। রাত্রে অবশ্য থাকতে হবে এই আশ্রমেই। অন্ধকারের মধ্যে জিপ চালিয়ে এই রাস্তায় ফেরার কোনও প্রশ্নই ওঠে না, অনেক রকম বিপদের আশঙ্কা।

রাত্তিরে তো কিছু খেতে হবে, সন্ন্যাসীই রান্না করবেন। সন্ন্যাসী পুরোপুরি নিরামিষাশী নন, মাংস বর্জন করেছেন, তবে, মাঝে মাঝে গ্রামের মানুষ তাঁকে কিছু মাছ দিয়ে যায়, ডিমও পাওয়া যায়। কিন্তু আজ সেসব কিছুই নেই। রয়েছে কিছু আলু আর পেঁয়াজ আর চাল। সন্ন্যাসী ডিমের খোঁজে বেরুতে চাইছিলেন, জয়ী আর হেমকান্তি প্রায় জোর করেই তাঁকে আটকালেন। আর কিছু দরকার নেই, আলু-পেঁয়াজের তরকারি আর ভাতই যথেষ্ট, তরকারিটা খানিকটা ঝোল ঝোল করলেই হবে।

জয়ীই রান্নায় বসতে চাইছিল, সন্ন্যাসী রাজি হলেন না। হেসে বললেন, একজন মেয়েকেই সবসময় রান্নার ভার নিতে হবে, এটা একটা কুসংস্কার। আমি নিজেই তো রোজ খানা পাকাই। তোমরা আজ আমার অতিথি।

কয়েকখানা ইট সাজিয়ে একটা নড়বড়ে উনুন। শুকনো ডাল আর পাতা দিয়ে ধরাতে যেতেই গনগনে ধোঁয়ায় সবার মুখ ঢেকে গেল। নিভে গেল দু'-তিনবার, তারপর শিখা দেখা দিল কোনওক্রমে।

বারান্দার মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে জয়ী আলুগুলো কুটে আর পেঁয়াজ

ছাড়িয়ে দিতে লাগল, হেমকান্তি এক পাশে বসে রইলেন নিঃশব্দে। একসময় তাঁকে জয়ী জিজ্ঞেস করল, তুমি যখন এদিককার বনে-জঙ্গলে থাকতে, তুমিও তখন রান্না করতে শিখেছিলে?

হেমকান্তি কিন্তু উত্তর দেবার আগেই সন্ন্যাসী হেসে বললেন, আমাদের হেম পিস্তল চালাতে শিখেছিল, কিন্তু রান্না...একবার ওকে শুধু ভাতের ফ্যান গালতে বলা হয়েছিল, ও কী করল জানো? হাঁড়িটাই ভেঙে ফেলল, সব ভাত ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। তারপর থেকে আর...

জয়ী আবার জিজ্ঞেস করল, উনি কোনও মানুষকে মেরেছেন?

সন্ন্যাসী বললেন, ওসব বিষয়ে আমরা আলোচনা করব না। জয়ী, ওই অতীতকে আমরা একেবারে কবর দিয়েছি। তবু, তোমার যখন কৌতূহল হচ্ছে, আমি একটা সত্যি কথা বলছি, আমার জানা মতে, হেম কখনও ওই কাজ করেনি, ওর মানসিকতাই ওরকম ছিল না, অবশ্য, অন্য কোথাও কিছু করেছে কি না... তবে একবার জঙ্গলের মধ্যে রাত্তিরবেলা একটা কোনও প্রাণী আমাদের কাছাকাছি ঘুরঘুর করছিল, শেয়াল নয়, নেকড়ে হতে পারে, সেই জঙ্গলে লেপার্ডও ছিল, হেম দু'বার গুলি চালিয়ে সেটাকে তাড়ায়।

ভাতের হাঁড়িটা এতই ছোট যে চারজনের ভাত একসঙ্গে হবে না। দু'বার চাপাতে হবে। মাঝে মাঝে নিভে আসছে উনুন, তলায় হাওয়া দিতে হচ্ছে। সন্ন্যাসী বললেন, হেম, তোরা এই আঁচের কাছে বসে থাকবি কেন? বরং একটু বাইরে থেকে ঘুরে আয়। বেশ হাওয়া দিচ্ছে।

জয়ী সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে শাড়ির আঁচলে হাত মুছে হেমকান্তিকে বলল, চলো।

দু'জনে আস্তে আস্তে হেঁটে এসে গেটের বাইরে দাঁড়াল।

জ্যোৎস্না নেই, আকাশ অদৃশ্য। কিছুই দেখা যায় না। জয়ীর বড় ব্যাগে একটা টর্চ আছে, কিন্তু সেই ব্যাগ জিপ গাড়িতে, বিক্রম গাড়িটা নিয়ে চলে গেছে।

একটু একটু চোখ সয়ে গেলে দেখা গেল, কাছাকাছি রয়েছে কয়েকটা বড় বড় পাথর। এক পাথরে বসে জয়ী হাত ব্যাগ খুলে বার করলে সিগারেটের প্যাকেট। হেমকান্তিকে জিজ্ঞেস করলে, তুমি একটা নেবে?

হেমকান্তি বললেন, নাঃ! আর খাব না।

নিজে ধরিয়ে নিঃশব্দে কয়েকটা টান দিয়ে জয়ী বলল, তুমিই প্রথম

আমাকে... তুমি এখানেই থেকে যাবে? পারবে? তোমার কষ্ট হবে না?

হেমকান্তি বললেন, কষ্ট! অরিজিৎ যদি পারে, আমি কেন পারব না?

জয়ী বলল, আমি সে কষ্টের কথা বলছি না। তুমি কেন থাকতে চাইছ?

হেমকান্তি বললেন, অরিজিৎকে দেখার পর, অনেক কিছু জানার পর, মনটা তোলপাড় করছে। মনে হচ্ছে, তা হলে আমার জীবনটা একেবারে অর্থহীন হয়ে যায়নি। এইসব থেকে নতুন করে আবার শুরু করতে পারি। অন্তত কিছুদিন তো দেখা যাক!

জয়ী ফাঁকা ফাঁকা গলায় বলল, তা হলে আমি কী করব? আমার যে কষ্ট হবে।

হেমকান্তি উতলা হয়ে উঠে বললেন, জয়ী, জয়ী, আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। তবে কি, তবে কি, আমিও ফিরে যাব তোমার সঙ্গে? হ্যাঁ, তাই যাব—

জয়ী বলল, না, না, আমি স্বার্থপরের মতন তোমাকে তোমার ভালোলাগা থেকে... দোষ তো আমারই।। আমিও যদি তোমার সঙ্গে থেকে যেতে পারতাম! কোনও পিছুটান আমি গ্রাহ্য করি না। কিন্তু আমার এমনই শহুরে অভ্যেস, কোনওদিন তো গ্রামে থাকিনি, আমার বাথরুমের বাতিক, সাপের ভয়টাও আনরিজনেবল, কাদার মধ্যে হাঁটতে গা ঘিনঘিন করে, যদি আমি জোর করে থাকার চেষ্টা করি, জানি, সর্বক্ষণ অসহ্য মনে হবে। শুধু ভালোবাসা দিয়ে কি জীবনের সব অভ্যেস পালটে ফেলা যায়? হয়তো খুব অল্প বয়েস হলে...

জয়ী হঠাৎ থেমে গেল। সে কি কাঁদছে?

তার বাহু ছুঁয়ে হেমকান্তি অসহায়ের মতন বললেন, আমি কী করব বলো তো? আমিও যে তোমাকে চাই।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে জয়ী বলল, তুমি এখানেই থাকবে। মনে করো এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট, আমাদের দু'জনেরই। দেখা যাক না। হয়তো একদিন আমি মাঠের মধ্যে দিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে চলে আসব তোমার কাছে। কিংবা তুমি একদিন হঠাৎ করে গিয়ে দোতলার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ডাকবে, জয়ী, জয়ী!

হেমকান্তি বললেন, জয়ী, জয়ী!

জয়ী বলল, এখন বৃষ্টি নামলে বেশ হত। তা হলে আমরা কাছের জঙ্গলে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতাম। সে রকম যে কথা ছিল।

সে তার মাথাটা হেলিয়ে দিল হেমকান্তির বুকে।

আঠারো

ভোর হয়নি। তবু ঘুম ভেঙে গেল হেমকান্তির।

মাদুরের ওপরেই তাঁর পাশে শুয়ে আছে জয়ী আর বিক্রম। ওদের মুখ ঘুমে মাখামাখি। খাটিয়ার ওপর সন্ন্যাসী। তিনি জয়ীকেই সে জায়গা ছেড়ে দেবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করেছিলেন, জয়ী কর্ণপাত করেনি।

আরও দুটি ঘর আছে। তাতে প্রচুর জিনিসপত্র ডাঁই করা। মনুষ্যবাসের উপযুক্ত অবস্থায় নেই। একটা ঘর আজ হেমকান্তির জন্য সাফসুতরো করতে হবে।

কেন যেন আর শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করল না হেমকান্তির।

উঠে বসে রইলেন একটুক্ষণ। এদিকে পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে জয়ী। খুব আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে তার শরীরের রেখা। সেদিকেই চেয়ে রইলেন একদৃষ্টিতে।

তারপর অন্যদের না জাগিয়ে তিনি নিঃশব্দে চলে এলেন বাইরে।

অন্ধকার ভাঙছে একটু একটু করে। জাগছে আকাশ।

হেমকান্তির মন থেকে উড়ে গেছে মেঘ।

খুব মিহিন বৃষ্টি পড়ছে। শরীরে এর স্পর্শে আরাম লাগে। এই বৃষ্টির শব্দ নেই, কোথাও কোনও শব্দ নেই। ইচ্ছে করলে মনে করা যেতে পারে যে এই পৃথিবীতে হেমকান্তিই এখন একমাত্র জাগ্রত মানুষ।

কোনটা কোন দিক, তা হেমকান্তি জানেন না। একটু পরেই তিনি দেখলেন, সামনের পাহাড়ের আড়ালে দেখা যাচ্ছে রক্তিম আভা।

সূর্য এত নীচে, যেন এইসময় সূর্যের সঙ্গে বসুমতীর কিছু কথা কানাকানি হয়। সমস্ত চরাচর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে বাতাস। রাত্রি চলে যাচ্ছে অন্য দেশে।

হেমকান্তি মনে মনে বললেন, আমি তোমাকে ভালোবাসি। ভালোবাসি।

তার পরেই জোরে জোরে উচ্চারণ করলেন, আত্মদীপো ভব, আত্মশরণো ভব, অনন্যো শরণো ভব।

তাঁর দু'চোখে বিপুল বিস্ময়।
